অনন্যা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

ভারতীয় সংগীত জগতের
অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ
হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়কে
পরম শ্রদ্ধায়—

সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য এক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি আবির্ভূত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দু'-একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির কালানুক্রমিক একটি গ্রন্থ-তালিকা নিচে দেওয়া হল। শিশুসাহিত্য ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি এই তালিকায় দেওয়া হল না। সেই সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় যুক্ত হল তাঁর স্বাক্ষর।

শৈলপুরী কুমায়ুন
কলাভূমি কলিঙ্গ
অগ্নিকন্যা
অনেক বসন্ত দুটি মন
ভোরের রাগিণী
ডাক্তার জনসনের ডায়েরী
রোদ বৃষ্টি ভালবাসা
কন্যা কাশ্মীর
বসন্ত বিলাপ
হিরণ্যগড়ের বধূ
আঁধার পেরিয়ে
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে
রিসেপশনিস্ট
ফরেস্ট বাংলো
নির্জনে খেলা
মোহিণী
মন-অরণ্য

কালের কল্লোল
পরমা
আর্য-অনার্য
আপন ঘর
সাইক্লোন
মহাকালের বন্দর
ত্রিবেণী
মরু-মৃগয়া
বনপর্ব
মেঘ-ময়ূরী
নির্জন নির্ঝর
কালের রাখাল
জয়িতা
অনুরাগিণী
অমৃত নিকেতন
শ্রেষ্ঠগল্প

ক্রমানুসারে উপন্যাসসমূহ

কমল হীরেঃ

॥ ১ ॥

হোটেল ফিডালগোর ব্যাঙ্কোয়েট হল তখন আলোর স্নিগ্ধ প্রবাহে স্বপ্নময়; যথাস্থানে বসান ফ্লাওয়ার বোকেগুলো ডেলিগেটদের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল।

জানালার পর্দা গলে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছিল এক এক ঝলক হাওয়া। তাতে শীতের কামড় ছিল না, শুধু ছড়িয়ে পড়ছিল মিষ্টি মধুর একটা রোমাঞ্চ। আরবসাগরের তীরে গড়ে ওঠা শহর জনপদে এ সময় শীত থাকে না। ক্রীসমাস উৎসব সবে শেষে হয়েছে। চার্চ, পথঘাট এখনও আলোর মালায় সাজানো। গোয়ার রাজধানী পানাজী তিরিশে ডিসেম্বরেও উৎসব-নগরী।

কারুকাজ করা হেভি স্ক্রীনখানা সরিয়ে ঠিক পৌনে নটায় হলে এসে ঢুকল শীলা আধারকার। সঙ্গে সঙ্গে সারা ব্যাঙ্কোয়েট হলে ছড়িয়ে পড়ল একটা চাঞ্চল্য।

মূল সভাপতি ডক্টর রায় নিজের ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে প্রফেসার আধারকারের দিকে মৃদু হেসে তাকালেন। শীলা আধারকার কাছে এগিয়ে এসে মাথাটা ঈষৎ নিচু করে বলল, আমি কি ঠিক সময়ে আসিনি স্যার।

হেসে বললেন ডক্টর রায়, ঠিক সময় মানে, এমন সেকেণ্ডের কাঁটা ধরে চলতে বোধহয় ইংরেজদেরও কদাচিৎ দেখা যায়।

কথাগুলো উনি একটু জোরেই বলে উঠলেন, তাই সারা হলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

শীলা আধারকারও সে হাসিতে যোগ দিল। তার জন্যে নির্দিষ্ট আঠারো নম্বর চেয়ারটির দিকে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল সে।

পিঙ্ক ফুলওয়ালা সাদা সিফনের শাড়ির ওপর হাল্কা ইয়লো কার্ডিগানখানা বেশ মানিয়েছে। আলোর তরঙ্গে সাদা একখানা প্রমোদ তরণী যেন এইমাত্র ভেসে এল হলুদ একটুকরো পাল তুলে। একত্রিশটি বসন্তে পৌঁছেও শীলা আধারকার যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্যে পুষ্পিতা। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শান্ত এক ধরনের শ্রী মিশে আধারকারকে সকলের চোখে করে তুলেছে আকর্ষণীয়া।

আঠারো নম্বরে এসে বসল শীলা আধারকার। ডান দিকে মডার্ণ হিস্ট্রি গ্রুপের হেলপার সুমিত সরকার। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র, সেখানেই বছর দশেক অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসির বিনিময় করল। শ্যামবর্ণ সুমিত। বেশ লক্ষ্যণীয় দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। প্রাণবন্ত। সারাক্ষণ যেন পরোপকারে প্রস্তুত।

এ কদিন হিস্ট্রি কংগ্রেসের বিভিন্ন গ্রুপ ডিসকাসানের ফাঁকে ফাঁকে টি-ব্রেক অথবা টিফিন, লাঞ্চে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। এর আগের তিনটি বছরের ভেতর দু'বছর দেখা হয়েছিল কিন্তু সৌজন্যমূলক চেনা পরিচয় আলাপ পর্যন্ত গড়ায়নি। গত বছর হিস্ট্রি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেয়নি আধারকার। সে ছিল আমেরিকায় তার স্বামী ডক্টর বিজয় আধারকারের সঙ্গে।

বিয়ের অব্যবহিত পরেই বম্বের সোফিয়া কলেজ থেকে দু'বছরের স্টাডি লিভ নিয়ে স্বামীর কর্মস্থানে গিয়েছিল সে। একটি বছর যেতে না যেতেই ফিরে এসে জয়েন করেছে কলেজে।

শীলা আধারকার আট বছর বয়সে তার বাবাকে হারায়। স্কুল মিস্ট্রেস মা-ই তাকে একদিকে শিক্ষাদীক্ষা, অন্যদিকে সংগীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন।

বিজয় আধারকারের সঙ্গে হঠাৎ শীলার বিয়েটাও যেন কেমন রহস্যময়।

মেয়ের বয়েস যত বাড়ছে, মা ততই অস্থির হয়ে উঠছিলেন। একটি সুপাত্রের হাতে পড়ুক তাঁর সর্বগুণান্বিতা মেয়ে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু এমন মেয়ের পাত্র যথার্থই দুর্লভ হয়ে ওঠে। মেয়ের কিন্তু তাতে বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না। সে উনত্রিশটি বসন্তের ভেতরেই তার পি-এইচ-ডি ডিগ্রি অর্জন করল। আর সংগীতে সে তখন যথেষ্ট নাম করে নিয়েছে। বেতার আর দূরদর্শনের সে নিয়মিত বি-হাই শিল্পী।

শীলা আধারকারের জীবনের এমন উজ্জ্বল মুহূর্তে ডক্টর আধারকারের হঠাৎ বোম্বেতে আবির্ভাব। তিনি এসেছিলেন নিজের দেশ থেকে একটি সঙ্গিনী নির্বাচন করে নিয়ে যেতে। আমেরিকায় ক্যানসার রিসার্চের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তাঁর অবদান বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে তাঁর অনভিজ্ঞতা ভাবিয়ে তুলেছিল বন্ধুদের। তাঁদের পীড়াপীড়িতেই শেষ পর্যন্ত মধ্য যৌবনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন আধারকার।

উভয়পক্ষের পরিচিত কোন ব্যক্তির যোগাযোগের ফলে দুটি ভিন্নমুখী প্রতিভার সংযোগ ঘটল সংসারধর্মের ক্ষেত্রে। শীলা আধারকার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল তার নতুন সংসার রচনা করতে।

কিন্তু একটি বছর মাত্র। আমেরিকা থেকে ফিরে এল আধারকার। আরও বেশী করে ডুব দিল তার এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি রিসার্চের কাজে। কয়েকটি মূল্যবান পেপার বিশিষ্ট কাগজে ছাপা হল। এদিকে প্রখ্যাত ওস্তাদের তালিমে এগিয়ে চলল নিরলস কণ্ঠসাধনার কাজ।

জীবনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতা ছিল শীলা আধারকারের কিন্তু উচ্ছলতা ছিল না। তাই বন্ধুর সংখ্যা ছিল তার বড় সীমিত। শীলা আধারকার সম্বন্ধে বহু-জনের কৌতূহল থাকলেও কৌতূহল চরিতার্থ হবার সহজ কোন পথ ছিল না। তাই তাকে ঘিরে গড়ে উঠছিল অনেক কল্পিত কাহিনী।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর ডক্টর আধারকারের সঙ্গে তার সেপারেশানের ব্যাপারটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে কানাকানি আর গুঞ্জনের অন্ত ছিল না। কিন্তু ডিভোর্সের প্রকৃত কারণটা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল কৌতূহলীদের কাছে।

গোয়া হিস্ট্রি কংগ্রেসে বোম্বে গ্রুপের কাছ থেকেই সুমিত সরকার শুনেছিল শীলা আধারকারের সংসার জীবনের দুর্যোগের কথা। আর পাঁচজন শ্রোতার মাঝখানে এসে পড়ে হঠাৎই তার কানে গিয়েছিল কথাটা। কিন্তু তাকে নিয়ে সরস আলোচনা চালাবার মত প্রবৃত্তি কিংবা সময় কোনটাই তার ছিল না। শীলা আধারকারকে সে অত্যন্ত সংযত স্বভাবের আর সম্ভ্রান্ত আচরণের মেয়ে বলেই জেনে এসেছে। তার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তাই প্রথমে সে খানিকটা বিচলিতই হয়েছিল। পরক্ষণেই সে ও ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে লেগে গিয়েছিল নিজের কাজে।

কালকের ট্রিপেই কি আপনি সাইট সিইংএ বেরুচ্ছেন?—ঘাড় কাৎ করে সহজ ভঙ্গীতে সুমিত সরকারকে প্রশ্ন করল শীলা আধারকার।

সুমিত বলল, এখন ক্রীসমাসে ট্যুরিস্ট মরশুম চলছে, বাস পাওয়াই দায়। শুনেছি দুখানা বাস যোগাড় হয়েছে। এতগুলি ডেলিগেট আর তাদের ফ্যামিলি। জায়গা পাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠবে।

শীলা আধারকার বলল, আপনার যদি অসুবিধে না থাকে চলে আসতে পারেন আমার গাড়ীতে। একটা প্রাইভেট কারের সঙ্গে কথা বলেছি। ছেলেটি ভোরবেলাতেই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াবে বলেছে।

না না অসুবিধে থাকবে কেন, কাজের শেষে এখন তো বেড়াবারই পালা। আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ।.

শীলা আধারকার গাড়ীতে সুমিতাকে সঙ্গী হিসেবে নেবার প্রস্তাব করেই কিন্তু সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। যদি তার আমন্ত্রণ যে কোন কারণেই হোক সুমিত সরকার গ্রহণ না করে তাহলে নিজের মনেই ফিরে এসে আঘাত দেবে নিজের প্রস্তাবটা। এখন সুমিতের সহজ উত্তরে সে শুধু স্বস্তিবোধই করল না সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার সঙ্গে বেরুলে আপনার কিন্তু বেশ খানিকটা অসুবিধে হবে প্রফেসার সরকার।

কি রকম?

এই যেমন ধরুন, গান সম্বন্ধে কিছুটা ক্ষ্যাপামি আছে আমার আমি বাঁধা রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ হঠাৎ কোন গাঁয়েগঞ্জে লোকসংগীতের খোঁজে ঢুকে পড়তে পারি। আর সোজা কথা বলতে কি এই উদ্দেশ্যেই বাসের সীট ছেড়ে প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করেছি।

এ তো উত্তম প্রস্তাব। বেড়ানোর ব্যাপারে সব সময় নির্দিষ্ট রাজপথ ধরে চলতে আমারও আপত্তি।

আরও একটি ছোট্ট কারণে আমি সঙ্গী খুঁজছিলাম।

কারণটা শোনার জন্য হেসে তাকাল সুমিত সরকার।

শীলার মুখে সংকোচের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, একা একা গাড়ীতে অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে পুরোপুরি সাহস পাচ্ছিলাম না।

॥ ২ ॥

অফ হোয়াইট রঙের পদ্মিনী ভোরের নরম রোদ সর্বাঙ্গে মেখে হোটেল ফিডালগোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সুমিত সরকার আর শীলা আধারকার ঢুকে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

মাণ্ডভী নদীর তীর ধরে প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলল গাড়ী। নদীর জল ছুঁয়ে ভেসে আসছিল ভোরের গন্ধ। বাঁহাতে নেহ্‌রু ব্রীজের ওপর উঠে গেল গাড়ী। শঙ্খধ্বনির মত একটি হর্ণ বেজে ওঠা মাত্র মাণ্ডভী নদীর বুকে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য ছবি। শত শত যাযাবর হাঁস জল ছেড়ে আকাশের বুকে ওড়ার জন্য পাখা মেলে দিয়েছে। শুভ্র বুক আর ডানায় লেগে আছে ভোরের সোনার নরম মিষ্টি রঙ।

অবাক হয়ে দুজনেই সেদিকে চেয়েছিল। শীলা আধারকার বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল। তার ডানদিকে বসে একই সঙ্গে দুটো ছবি দেখছিল স্নমিত সরকার। জলের হাঁসগুলোর উড়ন্ত লীলা আর ডাঙার রাজহংসীর অপূর্ব প্রোফাইল। শীলা আধারকারের হংসগ্রীবায়ও তখন খেলা করছিল ভোরের একফালি রোদ।

ওরা ব্রীজ পেরিয়ে নর্থ গোয়ার রাস্তায় এসে পড়ল। বাঁ দিকে পাহাড়ী বন: শীত ঋতুতেও শ্যামল। দশ বার জন গোয়ানিজ মেয়ে সাদা চোলি আর হাঁটু অব্দি ঢাকা লুঙ্গির মত সাদা শাড়ি জড়িয়ে বনের দিকে চলেছে। ওদের হাতে কাটারি জাতীয় একধরনের অস্ত্র। বনের ভেতর হয়ত ডালাপালা কাটার কিছু কাজ চলবে।

নারকেল গাছের সারি। সবুজ পাতার ঝালর থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে সকালের ঝলমলে রোদ। অদূরে বনে ঢাকা পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ধবধবে একটি চার্চ। নীল আকাশ আর শ্যামল সমারোহের ভেতর রোদে ডুবা সাদা গীর্জাটি ঈশ্বরের প্রিয় একটি আবাসগৃহ বলে মনে হচ্ছে।

অপূর্ব! শীলা আধারকার চার্চটির দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল।

স্নমিত সরকার বলল, ছবিতে ধরে রাখার মত।

গাড়ী থামিয়ে দুজনেই নেমে পড়ল। দুটো নারকেল গাছের ফাঁকে ওরা কম্পোজ করে নিল গীর্জার ছবিখানা। শীলা আধারকার প্রথমে ক্লিক করল তার পেনটাক্সে দুশো টেলি লাগিয়ে। স্নমিত সরকার তার নিকোম্যাটে টেলি ছাড়াই তুলল।

শীলা আধারকার বলল, আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে।

স্নমিতের চোখে জিজ্ঞাসা, কি রকম?

মাণ্ডভী নদীর ওপর উড়ন্ত হাঁসের ছবি নেওয়া হল না।

হেসে বলল স্নমিত, নিরাশ হবার কি আছে! এখনও হাতে রয়েছে তিনটে দিন। মাণ্ডভী ঘুরে ফিরে আসবে। যাযাবর হাঁসগুলোও এখন সহজে মাণ্ডভী ছাড়ছে না।

গাড়ী চলেছে। নারকেল বাগানের ভেতর লাল টালির বাড়ীঘর। চারদিকে শুরু হয়ে গেছে প্রভাতী কর্মব্যস্ততা। গৃহস্থের উঠোন ঘেঁষে গাড়ী চলেছে। নানা রঙে চিত্রিত একটি তুলসীমঞ্চ উঠোনের মাঝখানে।

শীলা বলল, গোয়াতে খৃষ্টান আর হিন্দুর সহাবস্থান বেশ মজার ব্যাপার।

স্নমিত বলল, যেমন?

এই ধরুন বিয়ে হল চার্চে, বউ নিয়ে ঘরে ফিরে হোমের আগুন জেলে সপ্তপদীটা সেরে নিলে।

সত্যি!

ঠিক এতটা হয়ত এখন আর নেই তবে কয়েক জেনারেশান আগে এই রীতি এখানকার প্রায় সব জায়গায় চালু ছিল বলে শুনেছি।

সুমিত বলল, এরকম একটা কারণ কি আমরা অনুমান করতে পারি—অস্ত্র উঁচিয়ে অথবা অর্থ ছড়িয়ে যাদের হিন্দু থেকে খৃষ্টান করা হয়েছিল তারা আসলে মনেপ্রাণে হিন্দুই থেকে গিয়েছিল।

শীলা সোচ্ছ্বাসে বলল, ঠিক অনুমান করেছেন আপনি। গোয়ার ইতিহাসও তাই বলে। সামান্য দু'একখানা পোশাকের লোভে অথবা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে চার্চে একাসনে বসতে পাবে বলে বহু মানুষ খৃষ্টান হত। তারা চার্চের প্রার্থনায় যোগ দিত, আবার প্রতিবেশী হিন্দুদের হাতে মন্দিরে পুজোর উপচার পাঠাত সংসারের মঙ্গল কামনা করে।

সুমিত কৌতুক করে বলল, এ যে সেই ধরনের কথা হল—খৃষ্টান হয়েছি বলে কি জাত ধর্মটাও খুইয়ে বসব।

মৃদু হেসে শীলা বলল, ঠিক তাই।

ছোট্ট এক টুকরো বাজার পড়তেই শীলা গাড়ী থামাল।

আসুন, এখানেই সকালের চা-পর্বটা সেরে নিই।

একটু থেমে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল, আপনিও নেমে আসুন, চা আর খাবারটাবার কিছু খেয়ে নিন!

আনুমানিক বছর পঁচিশেক বয়েস হবে ছেলেটির। শীলার ডাকে গাড়ী লক করে সে নেমে এল।

তিন প্লেট খাবার অর্ডার দিয়ে আনাল শীলা। সঙ্গে তিনটে চা।

খাবার শেষে সুমিত আগেভাগে বেসিনে মুখ ধুয়ে কাউণ্টারে পয়সা দিতে যাচ্ছিল, শীলা পেছন থেকে বলে উঠল, প্লীজ, ওটা আমাকে দিতে দিন। আপনি আজ আমার অতিথি।

এ কথার পর আগ বাড়িয়ে দিতে গেলেই ভদ্রতার সীমা ভাঙতে হয়, তাই সুমিত মুখে হাসি মেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দর কাজকরা মানিব্যাগের থেকে ততোধিক সুন্দর আঙুলে করকরে কটি নোট আর কয়েন বের করে কাউণ্টারে দাম চুকিয়ে দিলে শীলা।

ড্রাইভার আগেভাগেই গাড়ীতে গিয়ে বসেছিল। শীলা আর সুমিত উঠে বসল। গাড়ী চলল আরওয়ালেম প্রপাতের দিকে।

চুপচাপ বসে থাকার পাত্র নয় সুমিত, তবু চুপচাপই বসেছিল সে। শীলা এইটুকু জার্নির ভেতরেই সুমিতের আনন্দ উচ্ছল স্বভাবের পরিচয় পেয়েছিল। তাই সুমিতকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল, কি হল আপনার, একেবারে চুপচাপ যে?

সুমিত সস্মিত মুখে সামনের দিকে চোখ রেখে বলল, অতিথির মত আচরণ করবার চেষ্টা করছি।

সুমিতের কথা বলার ভঙ্গীতে শীলা আধারকার একমুখ হেসে বলল, আজ নিশ্চয়ই আপনি আমার অতিথি, কিন্তু কাল সাউথ গোয়া ট্যুরে আমি হব আপনার অতিথি, রাজি তো?

সুমিত সরকার বলল, তাহলে বরং আমরা কেউ কারো অতিথি নয়, আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু। আজ আপনি সবকিছু খরচ করবেন, কালকের খরচখরচা আমার।

শীলা আধারকার বলল, বেশ, তাই হবে কিন্তু…।

আবার কিন্তু কিসের?

মানে খরচ করতে গিয়ে এ দুদিনের গাড়ীভাড়ার আদ্দেকটা আবার দিয়ে দেবেন না যেন। ওটা একেবারে আমার নিজস্ব, কারণ প্রাইভেট কারে করে ঘোরার পরিকল্পনাটা আমার। আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি সঙ্গটুকু দেবার জন্য।

বেশ তাই হবে, আপনার সঙ্গে কথা বাড়াব না।

গাড়ী চলেছে। দুদিকে ক্ষেত। শীতের ফসলক্ষেতে নেমে পড়েছে মেয়েরা। তারা কোমর ভেঙে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে দুটো হাতে মা ধরিত্রীর সম্পদ সংগ্রহ করছে। এখানে মেয়েদের আঁটসাট শাড়িতে রঙের বাহার। চারদিকে প্রাণের ধারা নদীর প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। বেশ খানিক পথ পেরিয়ে আসার পর ছোট্ট মালভূমির মত একটি প্রান্তর পড়ল। রোদ চড়ছে। এদিকে গাছপালার সংখ্যা কম। বাড়ীঘরের হদিস মিলছে না।

শীলা তার ব্যাগ হাতড়ে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছিল।

সুমিত বলল, কি রত্ন হারালেন?

জলের দুটো বোতল ভরে রেখেছিলাম, বেমালুম ভুলে গেছি আনতে।

এখন তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয় ?

পেলে আর কি করব বলুন।

আরে আরে ঐ যে একখানা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত দাঁড়িয়ে। ওখানে জলের সন্ধানে যাই চলুন।

গাড়ী থামিয়ে দুজনে নামল। পথ থেকে খানিকটা ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে বাড়ীর সামনে আসা গেল।

দু'একটা গাছ বাড়ীর এদিক-ওদিকে দাঁড়িয়ে। শীতে রিক্তপত্র। বাড়ীটি আয়তনে বেশ বড়, কিন্তু পরিত্যক্ত। লাল টালির ছাদে কালোর ছোপ পড়েছে। মাঝে মাঝে জীর্ণ পাঁজরের ফুটো দিয়ে গলে ঝরে পড়ে গেছে রক্তরাঙা টালি। সামনে এক চিলতে বারান্দা বেরিয়ে। ছাদের দুই প্রান্তের জোড়মুখে চমৎকার কাঠের জাফ্‌রির কাজ। প্রায় অক্ষত তবে বহুকাল রোদে পুড়ে বর্ষায় ভিজে তার বর্ণ, জৌলুস, সবই হারিয়ে বসে আছে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। না, দরজার পাল্লা নেই। রুক্ষ ফাঁকা প্রান্তরের বুকে এ যেন একটা হণ্টেড হাউস।

ওরা দুজনে খোলা দরজা দিয়ে কার যেন অদৃশ্য আকর্ষণে পরিত্যক্ত ঘরখানার ভেতর ঢুকে গেল। মোট ন'খানা কক্ষযুক্ত বাড়ী। কোন ঘরেই কোন আসবাবপত্র ছিল না। গৃহের মালিক অস্থাবর সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। যে উদ্দেশ্যে অনেক সমারোহে একদিন গৃহপ্রবেশ হয়েছিল, সে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের সমাপ্তি ঘটে গেছে অনিবার্য কোন কারণে। অন্দরের একখানা ঘরে তিনটি জানালায় তিন টুকরো পর্দা আব্রু রক্ষার চেষ্টা করছিল। রোদে, হাওয়ায় জীর্ণ ছিন্ন পর্দাগুলো তখনও বুকের বেতাল ধুকপুকুনির মত মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

পাশের একখানা ঘর থেকে শীলার গলা শোনা গেল, এখানে জল নেই, একটা খালি কুঁজো পড়ে আছে।

ঘরের ভেতরের উঠোনে ফুটো টালির ছাদ চুইয়ে যে রোদ্দুরটুকু এসে পড়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছিল সুমিত। শীলার গলার 'জল নেই' শব্দটা এক ধরনের শুষ্ক হাহাকারের মত শোনাল।

সুমিত সরকারের কেন যেন মনে হল, এ বাড়ীখানার শুরু থেকে সমাপ্তির ইতিহাসের সঙ্গে শীলা আধারকারের জীবনের কোথায় যেন একটা মিল আছে। সে শুধু শুনেছে, শীলা আধারকারের সঙ্গে তার স্বামীর একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। এর বেশী সে কিছু জানে না। একটি সুন্দর সমৃদ্ধ

গৃহ হঠাৎ পরিত্যক্ত হলে যেমন একধরনের অব্যক্ত শূন্যতার সৃষ্টি হয়, শীলা আধারকারের জীবনটাও কি তাই নয়। বিধাতাপুরুষ শীলা আধারকারকে গড়বার সময় একটু বেশী রকমের পক্ষপাতিত্বই দেখিয়েছিলেন। দেহসুষমা থেকে হৃদয়রঞ্জনী গুণাবলীর সমন্বয়ে শীলা আধারকার হয়ে উঠেছিল স্বজাতীয়াদের ঈর্ষার কারণ আর পুরুষ সমাজের উদ্দীপনা আর প্রেরণার উৎস। সেই অনন্যা নারীর সংসারজীবনে হঠাৎ যদি নেমে আসে ভাঙন তাহলে সেটা ভাগ্যবিধাতার কি ধরনের কৌতুক তা বুঝে ওঠা সত্যিই শক্ত। এই মুহূর্তে সুমিত সরকারের মনে হল, সে শীলা আধারকারের দুঃখ-দিনের সবচেয়ে নিকটের বন্ধু। সে জানে, অত্যন্ত সংযত স্বভাবের মেয়ে শীলা তার গভীর দুঃখের দিনেও কারু সহানুভূতি চাইবে না, তবু মনে মনে বন্ধুর দুঃখে দুঃখবোধ করার মধ্যে একধরনের তৃপ্তি খুঁজে পেল সুমিত সরকার।

ঘরের ভেতর থেকে শূন্য কুঁজোখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল শীলা আধারকার। মুখে একধরনের হাসি লেগে আছে। হাসি আর কান্নার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যে হাসি, একটুখানি হাওয়ার দোলায় যাকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারে, এমন হাসি হেসে সুমিত সরকারের সামনে এসে দাঁড়াল শীলা আধারকার। সুমিত ভাবল, দুঃখকে অপহরণ করে কেমন অক্লেশে হাসতে পারে শীলা।

দেখুন, কেমন সুন্দর কাজ-করা একটা কুঁজো।

সুমিত কি ভেবে যেন বলল, পাত্র আছে পানীয় নেই। এমন সুন্দর একটা পাত্র, ভরা থাকবে সুধায়, তা নয় আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে শূন্য।

শীলা আধারকার সুমিত সরকারের এই অর্থবহ কথাটির তাৎপর্যটুকু ধরতে পারল না। আর ধরা সম্ভবও ছিল না। দুজনের ভাবনার নদী তখন ভিন্ন দুটি খাতে বইছিল।

ওরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ী লক্ষ্য করে চলতে লাগল রাস্তার দিকে। শীলা কিন্তু হাতের কুঁজোটি ছাড়েনি।

সুমিত বলল, জলের জন্য এসে লাভ হল জলপাত্র।

শীলা বলল, কুঁজোর নক্সাটা বড় ভাল লেগে গেল, তাই ছাড়তে পারলাম না।

প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রীর পুরাবস্তু সংগ্রহ আর কি।

হাসি ছড়িয়ে শীলা বলল, যেমন খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে বস্তুটি একেবারে পুরাতন না হলেও মডার্ণ হিস্ট্রি গ্রুপে পড়ে না। পোর্সিলেনের

জিনিস, ময়লায় ওর কৌলিন্যটা চাপা পড়ে গেছে। আর এর নক্সাটিও ভারতীয় নয়। আমার মনে হয় গোয়াবাসী কোন পর্তুগীজের আউট হাউস ছিল এটা। বস্তুটি হয়ত লিসবন থেকে আনা।

সুমিত সরকার কৌতূহলী হয়ে কুঁজোটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

আপনার অনুমানের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে। ময়লা দেখে আমি কুঁজোটাকে মাটির তৈরী বলে ভেবেছিলাম।

শীলা আধারকার বলল, তাহলে বলুন, এ যাত্রায় আমি একেবারে ঠকে যাইনি।

ঠকবেন কেন, আপনি ছাই উড়িয়ে সোনা না পেলেও তার চেয়ে কম মূল্যবান জিনিস পাননি।

ওরা গাড়ীতে এসে বসল। 'গিরি' গ্রাম পেছনে ফেলে ওরা একসময় উঠে এল লাল ছোট ছোট টিলায় ছাওয়া 'মূলগাঁও'তে। দূরে দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস। পথের দুদিকে কাজুবাদামের গাছ। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েক ঘর দরিদ্র মানুষের খড়ে ছাওয়া বাসস্থান। এরা হয়ত কোন সম্পন্ন মানুষের বাদাম বাগানের তদারকির কাজে নিযুক্ত।

এর কিছু পরেই এল বর্ধিষ্ণু গ্রাম সংখালি। সবুজ নারিকেল বাগানের ভেতর সম্পন্ন মানুষের গৃহস্থালীর চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেল। একটা জলস্রোত গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে চলে গেছে। ছোট ছোট কটি ছেলেমেয়ে ঐ স্রোতের ভেতর পা ডুবিয়ে পারাপার করছে। কৌতুকে এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

গাড়ী এসে ঢুকল রুদ্রেশ্বর মন্দিরের সীমানায়। গম্বুজওয়ালা মন্দির। সামনে গোয়াবাসীদের নিজস্ব ধারায় নানা বর্ণে চিত্রিত তুলসীমঞ্চ।

তুলসীমঞ্চের পাশ দিয়ে ওরা উঠে এল একটা অনতিউচ্চ টিলার ওপর। সামনের পাহাড় থেকে গড়িয়ে নীচে ঝরে পড়ছে গেরুয়া রঙের একটা জলধারা। ঐ জলপ্রপাতের পাশেই জংলী গাছের ঝোপ। জলের কণাগুলো ছিটকে পড়ছে সেইসব গাছের পাতায়। সূর্যের আলো পড়ে জলকণাগুলোতে ধরেছে রামধনুর রঙ।

সুমিত সরকার টিলার গা বেয়ে একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সে প্রপাতের ছবি নেবে। রামধনুর রঙ কচি সবুজ পাতায় খেলা করছে, তার মেজাজই আলাদা।

এদিকে টিলার অন্য পিঠের নির্জনে চলে এলো শীলা আধারকার। সে একটা পাথরের চাঁইএর ওপর বসল। মাথার ওপর একটা গাছ ডালে পাতায় ছত্রছায়া রচনা করেছে। নীচের দিকে ক্যামেরা তাক করে মন্দিরের একটা ছবি তুলল। এমন সময় টিলার খানিক ওপর থেকে একটি তরুণী মেয়ের হাসি জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল।

শীলা পেছন ফিরে ওপরের দিকে তাকাল। একটা সদ্যবিবাহিত দম্পতি বলেই মনে হল। নিবিড় হয়ে বসে ছেলেটি কথা বলে যাচ্ছিল আর মেয়েটি মাঝে মাঝে ছড়াচ্ছিল হাসির মুক্তো। একটা কচি সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছ তাদের মাথার ওপর। হাল্‌কা ভায়োলেট রঙের ফুল ফুটেছে। পরিবেশটি মধুচন্দ্রিমা যাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বড় মনোরম। ওরা হয়ত বোম্বে থেকেই এসেছে।

হঠাৎ বোম্বের কথা মনে পড়ল কেন তার! বোম্বের কথা মনে পড়াব সঙ্গে সঙ্গেই কেন আর একটা দৃশ্যপট ফুটে উঠল চোখের সামনে।

মুখোমুখি বসে আছেন ডাক্তার আধারকার। মা হবু জামাই আর মেয়েকে নিভৃত আলাপের সুযোগ করে দিয়ে অন্দরে গেছেন জলযোগের ব্যবস্থায়।

আধারকার সুদর্শন বলিষ্ঠ পুরুষ। মুখে প্রসন্নতা, চোখে গভীরতা। সামনের কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে।

প্রথম কথা বললেন আধারকার, আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জেনেছেন তা জানি না তবে আমার নিজের মুখে কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করছি।

শীলা তাকিয়ে রইল আধারকারের দিকে।

এই মে-তে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে আমার। আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন বিয়ের বয়েস অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমি। তবু বিয়ে করতে চাইছি তার সামান্য একটা কারণও আছে। ক্যানসারের ওপর যে রিসার্চ করছি সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। দিনরাত্রির অনেকগুলো ঘণ্টা আমার ল্যাবরেটারিতে কেটে যায়। বাড়ী ফিরেও নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। মনে করেছি বাড়ীতে কাজ চালানোর মত একটা ল্যাবরেটারি তৈরী করে নেব। আর সেই সঙ্গে থাকবে আমার আশেপাশে এমন একজন কেউ, যিনি শুধু আমার সংসারের ভার নেবেন না, আমার সবকাজে থাকবে তাঁর অফুরন্ত প্রেরণা।

শীলা বলল, আমি কিন্তু আপনার সাবজেক্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

না না অভিজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার কথা উঠছে না। আর আমার রিসার্চের সহকারিণীকেও আমি চাইছি না। কাজের মাঝের অবসরটুকু যিনি ভরিয়ে দেবেন তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে তেমনি একজন সঙ্গিনী পেতে চাই আমি।

ডক্টর আধারকারের কথাগুলো ভাল লাগল শীলার। সে বলল, আপনি যে বস্তু নিয়ে রিসার্চ করছেন, এখনও তা মানুষের কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

হাসলেন ডক্টর আধারকার। বড় নির্মল সে হাসি। বললেন, ভালবাসা দিয়ে সব ভয়কেই জয় করা যায়। আমি ঐ ভয়ঙ্করের প্রেমে পড়ে গেছি বলতে পারেন।

কেন জানি না সেই মুহূর্তে শীলার বড় ভাল লেগে গেল মানুষটিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পরেও একটি পরিচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল শীলার বাড়ীতে। সুসজ্জিত মণ্ডপের তলায় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তপদীও হয়েছিল। শীলার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সজ্জিত বাসরে ডক্টর আধারকারের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল।

ডক্টর আধারকার, মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না?

শীলা, কষ্ট হবে জেনেও তো আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একটু থেমে শীলা আবার বলেছিল, আমার মা বিয়ের পর তাঁর বাবাকে ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন কিন্তু সংসার হাতে পেয়ে তাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠলেন।

ডক্টর আধারকার, এটাই মেয়েদের ধর্ম।

শীলা, মৃদু হেসে, হয়তো তাই।

হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেলেন ডক্টর আধারকার, আমাদের বয়েসের অসমতাকে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে তো শীলা?

আপনি তো আমার কাছে কিছু গোপন করেননি। আমি সবকিছু জেনে শুনেই তো এ বিয়েতে আমার মত দিয়েছি।

তোমার চাকরী?

দু'বছরের স্টাডি লিভ নিয়েছি। চাকরী রাখা না রাখা আমার ইচ্ছের ওপর।

কিছুক্ষণ আগে তোমার বান্ধবীদের অনুরোধে তুমি গান গাইলে। তোমার গলা যে এত মিষ্টি তা জানতাম না।

শীলা সেদিন ডক্টর আধারকারকে বোধকরি আরও মিষ্টি একটি হাসি উপহার দিয়েছিল।

এরপর শীলা কথা বলেছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, রাত শেষ হয়ে এলো, আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন। কাল আবার ন'টায় সায়েন্স সেমিনারে আপনাকে যেতে হবে। সারাদিন তো ঠাসা প্রোগ্রাম। সেই ডিনার শেষ করে ফিরবেন।

তুমিও তো সে ডিনারে আমার সঙ্গী।

হ্যাঁ, আমাকেও তো ওঁরা স্পেশাল ইনভিটেশান কার্ড দিয়ে গেছেন।

তাই বলছিলাম, তুমিই বরং বিশ্রাম নাও।

আর আপনি ?

দিনরাত জেগে ল্যাবরেটারিতে কাজ করার অভ্যেস আমার। ক্লান্তিকে অনেকখানি জয় করে ফেলেছি।

না না তা হয় না। আপনি জেগে থাকবেন আর আমি ঘুমোব, তা কি হয় !

আচ্ছা বেশ, এসো দুজনে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তারপর পরশু তো ভোরবেলাই অজন্তা পাড়ি দিতে হবে।

শীলা প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে ফুলের রাশি বিছানা থেকে সরিয়ে ডক্টর আধারকারের বিশ্রামের আয়োজন করে দিয়েছিল। ডক্টর আধারকার শুয়ে পড়লে লাইট অফ করে তাঁর পাশটিতে সেও স্থান করে নিয়েছিল সলজ্জ সংকোচে। সেদিন তার মনে হয়েছিল, জীবনে দুজন না হলে সম্পূর্ণ হওয়া যায় না। শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, বিশ্বাসে, নির্ভরতায় একটি নারী আর একটি পুরুষের সম্মেলন।

একখানা গাড়ী নিয়ে ওরা বেরিয়ে গিয়েছিল অজন্তা আর ইলোরায়। ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর শিল্পের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এসব জায়গায়। প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে শীলা ইলোরা আর অজন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল সেদিন আর অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রের কৌতূহল নিয়ে সেসব কথা শুনছিলেন ডক্টর আধারকার।

অজন্তার গুহাচিত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে ডক্টর আধারকার বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই চিত্রাবলীর ক্ষয়-রোধ করা অসম্ভব নয়। শুধু অজন্তা বলে নয়, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে রক্ষা করতে বিশ্বের সমস্ত বিশেষজ্ঞ মানুষদের সম্মিলিত হওয়া দরকার।

ফেরার পথে বলেছিলেন, শীলা, আমি বিজ্ঞানী, বাস্তব জগত ও জীবন নিয়ে আমার কাজ। দেবদেবীর তথাকথিত মহিমা সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। বিশেষ কোন ধর্মমত সম্বন্ধেও আমার আগ্রহ কম। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি। মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্প ভাস্কর্যগুলি ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চার্চ, মসজিদ, চৈত্য, গুম্ফা, মন্দির সবজায়গাতেই মানুষের শিল্পরুচি বিশেষ মহিমায় রূপ লাভ করেছে।

শীলা বলেছিল, তোমার কথাগুলির ভেতর অনেক সত্য রয়েছে।

ডক্টর আধারকার প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলেছিলেন, তুমি এমনভাবে মন্দির আর গুহাচিত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করছিলে যাতে অতীত আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

অজন্তা চিত্রাবলীর একটা কালেকশান আমার কাছে রয়েছে। ছবিগুলোর সঙ্গে আগে থেকেই আমার পরিচয়।

জান শীলা, আমার এই দেশটাকে পুরোপুরি জানার আগেই প্রবাসী হয়ে গেলাম।

সেদিন একটা বিষণ্ণতার সুর বেজেছিল ডক্টর আধারকারের কথায়। শীলার স্পর্শকাতর মনে সে সুর প্রতিধ্বনি তুলেছিল। সে সান্ত্বনার ছলে বলেছিল, আমাদের এই স্বল্পকালের জীবনে কতটুকুই বা পাওয়া যায় বল। তবু যতটুকু পাই তার জন্যেই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সৃষ্টিকর্তার কাছে।

উদ্ভাসিত মুখে আধারকার বলেছিলেন, নিশ্চয়।

শীলা ঐ কথার প্রসঙ্গ ধরে বলেছিল, আমাদের দেশের মন্দিরে মন্দিরে কত ভাস্কর অপূর্ব সব মূর্তি রচনা করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁদের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবু সেই অপূর্ণতার ভেতরেও তাঁরা অনেক কিছু পেয়ে গেছেন।

ডক্টর আধারকার প্রসঙ্গটাকে একটু ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি শুধু প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রীই নও একটা দার্শনিক মনের অধিকারীও।

ফেরার পথে খাণ্ডালার কাছে যখন ভোরের নীলাভ আলো মসলিনের মত কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের মাথায় ফুটে উঠেছিল তখন ডক্টর আধারকার শীলার মুখখানা সেদিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দেখ, ভোরের প্রকৃতি কেমন সলজ্জ বধূটির মত কুয়াশার ওড়নায় মুখখানা ঢেকে রেখেছে।

শীলা মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে বলেছিল, আমি যদি ইতিহাসের ছাত্রী হয়েও দার্শনিক হই তাহলে তুমি বিজ্ঞানী হয়েও কবি।

শীলার হাতখানা চেপে ধরে ডক্টর আধারকার বলেছিলেন, এটা সঙ্গগুণে বলতে পার। তোমার স্পর্শেই আমার কবিত্ব লাভ হল শীলা।

আর একখানা হাত স্বামীর হাতের সঙ্গে মিলিয়ে তরুণী উষার মত সেদিন প্রকৃতির আরশিতে নিজেকে দেখেছিল শীলা আধারকার।

এর পর তাদের বোম্বেতে অবস্থিতির কারণ ছিল সংক্ষিপ্ত। এক রাত্রির অন্ধকার আকাশের বুক চিরে উড়ল গগনবিহারী বিহঙ্গ। নীচে এয়ার-পোর্টের আলোগুলো দীপাবলীর দীপের মত জ্বলতে জ্বলতে একসময় জোনাকির ঝিকমিকি তুলে নিভে গেল। অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রগুলি শীলা আধারকারকে তাদের আলোকিত ইশারা দিয়ে নিয়ে চলল সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের দিকে।

প্রফেসার আধারকার…। বায়ুতরঙ্গে যেন বহুদূর থেকে ডাকটা ভেসে আসছিল। ক্রমে সে ডাক শীলা আধারকারের স্মৃতির নিভৃত দরজাটাকে ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। শীলা সচেতন হয়ে উত্তর দিল, এই যে আমি।

সুমিত টিলাটা বেষ্টন করে শীলার পাশে এসে দাঁড়াল।

আপনাকে না দেখতে পেয়ে কতক্ষণ ডাক হাঁক করলাম। তাতেও যখন সাড়া পেলাম না তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

শীলা হেসে বলল, হারিয়ে যায়নি দেখে আশ্বস্ত হলেন তো।

তা বলতে পারেন।

এখন তাহলে নেমে যাই চলুন।

দুজনে পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে নেমে এল রাস্তার ওপর। শীলা পিছন ফিরে দেখল, দম্পতিটি রামধনুর খেলা দেখছে।

এবার গাড়ী ছুটল মাইম লেকের দিকে। পথে পড়ল দত্তাত্রেয় মন্দির। স্থানটি বট অশত্থ ও অন্যান্য শ্যামল বৃক্ষে ছায়াচ্ছন্ন। পথের ওপরেই একটি সুসজ্জিত তোরণ। তার ভেতর দিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নেমে এল ওরা। সামনেই মন্দির। নাটমণ্ডপে তখন জনসমাগম। খবরে জানা গেল, কাল পূর্ণিমা। ডিসেম্বরের পূর্ণিমা তিথিতে দত্তাত্রেয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উৎসব। পুরোহিত ওদের বললেন, থেকে যান, কাল

উৎসব দেখে ফিরবেন। ওরা আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল কিন্তু সময়াভাবে থাকা যে সম্ভব নয় তাও সবিনয়ে জানাতে ভুলল না।

সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ অনুষ্ঠানভূমির ওপর শোভা পাচ্ছে। যজ্ঞভূমিতে হোমকুণ্ড স্থাপিত হয়েছে। আগামী কাল সকাল নয় ঘটিকা থেকে দ্বিপ্রহর দুই ঘটিকা পর্যন্ত চলবে যজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম। পঁচিশ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অংশ গ্রহণ করবেন স্তোত্র পাঠ ও হোমের ক্রিয়াকর্মাদিতে। সন্ধ্যায় আলোর মালা ও আতস বাজিতে স্থানটিকে মনে হবে ইন্দ্রলোক। সহস্র সহস্র পুণ্যার্থীর সমাগমে সাকৃখেলি গ্রামের এই শতবর্ষের পুরাতন ত্রি-মূর্তির মন্দিরটি হয়ে উঠবে মহাপুণ্যভূমি।

পুরোহিতকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই তিনি দেবতার আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ ওদের হাতে দিয়ে বললেন, মঙ্গল হোক আপনাদের। শুভ হোক সংসারযাত্রা!

শীলা আধারকার ফিরে আসতে আসতে মনে মনে পুরোহিতমশায়ের আশীর্বাদের কৌতুকটি উপভোগ করছিল। নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মানুষটি তাদের দেব-ভক্ত কোন দম্পতি ভেবে বসে আছেন।

সুমিতের মুখে কোন কথা ছিল না। রাস্তার ওপর গাড়ীতে উঠে আসার সময়টুকু সে এলোমেলো কতকগুলো চিন্তার ভেতর ডুবেছিল।

গাড়ী আবার ছুটল মাইম লেকের পথে। সুমিতকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকতে দেখে শীলা বলল, কি এত ভাবছেন?

সুমিতের গোপন মনের খবর যেন জানাজানি হয়ে গেছে এমনি একটা ভাব নিয়ে সে চমকে তাকাল শীলার মুখের দিকে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, ভাবনার পাখিগুলো সারাক্ষণ উড়ে ফিরছে, ওদের যে কোন একটির ওড়ার ছন্দ, গলার স্বর নিয়ে মনে মনে গবেষণায় মেতে উঠলে ক্ষতি কি।

কপট গাম্ভীর্য মুখে টেনে এনে শীলা বলল, এ বিষয়ে আপনার উপযুক্ত গাইড হতে পারবেন পক্ষীতত্ত্ববিদ ডক্টর সালেম আলি সাহেব।

প্রথমে প্রাণখুলে হেসে উঠল সুমিত সরকার। সঙ্গে সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিল শীলা আধারকার। পাশে সবুজ পাতায় ছাওয়া একটা গাছের ডালে বসেছিল কতকগুলো রঙিন পাখি। তারা ওদের হাসির তরঙ্গে পাখা ভাসিয়ে বনান্তরালে উড়ে চলে গেল।

চারদিকে পাহাড়। বনের সবুজ ঢেকে দিয়েছে পাহাড়ের রুক্ষ শরীর। শীতেও সবুজের শ্যামল সমারোহ। গাড়ী এসে থামল মাইম লেকের ধারে।

শীলা চারদিকে চেয়ে বলল, একেবারে ছবি। প্রকৃতির গাছপালা, মানুষের সাজান বাগান, সব মিলে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে আঁকা একটা চোখ জুড়োনো ল্যাণ্ডস্কেপ।

সুমিত ড্রাইভারকে বলল, এখানে আমরা বেশ কিছু সময় কাটাতে চাই। আপনি বরং কাছে পিঠে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিন।

সুমিত ড্রাইভারের হাতে লাঞ্চের টাকা দিতে যাচ্ছিল, সে অমনি বলল, খাবার আমার সঙ্গেই আছে, টাকার দরকার হবে না। কিন্তু সাহেব, আপনাদের লাঞ্চের কি ব্যবস্থা করেছেন?

শীলা বলল, কাছে পিঠে কোন হোটেল নেই?

না মেমসাব, এ তল্লাটে কোন হোটেল নেই। তবে লেকের ঐ প্রান্তে যে ডাক-বাংলোটা গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে, ওখানে খাবার পাওয়া যেতে পারে।

শীলা বলল, যদি ওখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকে তাহলে আপনি আপনার লাঞ্চ সেরে নিয়ে আমাদের জন্য দুটো অর্ডার বুক করে আসুন। ততক্ষণ আমরা লেকটা একটু ঘুরে দেখি।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে জানাল, মেমসাহেবের কথা মত কাজ হবে।

ওরা সুন্দর সাজান গাছপালা আর অজস্র মরসুমী ফুলের কেয়ারী পেরিয়ে লেকের কাছে নেমে এল। একটা বাঁধান চাতাল রেলিং দিয়ে ঘেরা, তার ওপর ফুলে ছাওয়া লতানে গাছের চন্দ্রাতপ। চাতাল থেকে কয়েক ধাপ লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে লেকের জল অব্দি। সাদা রঙ করা কয়েকটা নৌকো বাঁধা আছে সেখানে।

সিঁড়ি বেয়ে নৌকোতে নেমে দাঁড়াল সুমিত। শীলা চাতালের রেলিং ধরে ঝুঁকে সুমিতের কাণ্ড দেখছিল। তার মুখে মিষ্টি একটা হাসি। সুমিত নৌকোতে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করে বলল, প্লীজ নড়বেন না। হাসি, কান্না যা মুখে লেগে আছে, দয়া করে তা যেন মুছে ফেলবেন না।

শীলা আধারকারের মুখের হাসি আরও খানিক বিস্তৃত হল। সুমিতের ক্যামেরা সেই মুহূর্তে ক্লিক্ করল।

এবার সুমিত রো করার ভঙ্গীতে দাঁড় ধরে বসা মাত্র শীলা তার ক্যামেরায় সে ছবি ধরে রাখল।

সুমিত অমনি বলে উঠল, আমি কিন্তু নৌকো চালাতে জানি। এলাহাবাদের ত্রিবেণীতে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে আমি কতদিন নিজে নৌকো করে ঘুরে বেড়িয়েছি।

শীলা ঝুঁকে বলল, পরীক্ষা দিতে পারবেন ?

এখুনি প্রস্তুত। নাবিক হিসেবে আপনি আমার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন।

সুমিতের কথা শুনে কি ভেবে একটু হাসল শীলা। পরক্ষণেই নেমে গিয়ে বসল নৌকোতে। সুমিত শেকল খুলে নৌকো ভাসিয়ে দাঁড় টেনে চলল। গভীর জলে দাঁড়ের ঘায়ে চারদিকে হীরে মতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আকাশে তখন জ্বলছে মধ্যাহ্নের সূর্য। লেকের মাঝামাঝি এসে সুমিত হঠাৎ দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ডান কাঁধখানা চেপে ধরে কাতরাতে লাগল।

শীলার গলায় উদ্বেগ, কি হল ?

মুখে কষ্টের ছাপ, সুমিত বলল, ডান হাতখানাতে ক্র্যাম্প ধরল হঠাৎ।

শীলা এগিয়ে গেল সুমিতের কাছে। অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে নিশ্চয় ?

তা হচ্ছে। আপনি বরং দাঁড়টা টেনে বাংলোর দিকে যাবার চেষ্টা করুন। নৌকোটা এদিক ওদিক ঘুরছে।

আমি একেবারে আনাড়ী।

কাতরাতে কাতরাতে সুমিত বলল, আমি যেমন করে টানছিলাম, আপনি তেমনি চেষ্টা করে দেখুন, ঠিক পারবেন। অসহ্য যন্ত্রণা, আমি হাত নাড়তে পারছি না।

অগত্যা আনাড়ীর হাতে দাঁড় উঠল। নৌকো নড়ল, কিন্তু সে ডাক-বাংলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল।

শীলা আধারকারের অসহায় গলা শোনা গেল, এ যে পাহাড় আর জংগলের দিকে চলে যাচ্ছে।

সুমিত বলল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ওদিকে কোন বসতি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আর এখান থেকে এই দুপুরবেলা চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।

শীলা আধারকার অনেক জোরে, অনেক কসরৎ করে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে বাংলোর ঘাটে ভেড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। অবাধ্য নৌকোটা এক বিদুষী যুবতীর সব প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাকে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলে।

সুমিত উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা নেড়ে বলল, এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন, আপনার শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেছে।

শীলা দাঁড় ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে সুমিতের মুখের দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সুমিত এখন পাকা হাতে দাঁড়ের ঘায়ে জল তোলপাড় করে নৌকোটাকে নিয়ে চলল বাংলোর দিকে।

শীলা বলল, আপনার হাতের ব্যথা?

আর ব্যথা। এখুনি ঐ জংগলে নৌকো ভিড়িয়ে দিতেন আপনি। বাঘ ভালুকের খপ্পরে পড়ে জানটা যেত। হাতের ব্যথার চেয়ে প্রাণটা রক্ষা করা অনেক জরুরী।

শীলা আনুনাসিক স্বরে অনুযোগ জানিয়ে বলল, হাতের ব্যথা আপনার মিথ্যে অভিনয়।

মিথ্যে হোক আর সত্য হোক আপনার পরীক্ষা হয়ে গেল।

কি রকম?

মাথায় মাথায় পাশ নম্বর পেয়ে উৎরে গেলেন।

সে আবার কি?

আপনার পরিশ্রম আছে, বিপদে সংগ্রামের চেষ্টা আছে, তাই পাশ নম্বর। আর আসল বিষয়টার ওপর বিন্দুমাত্র দখল নেই তাই ফুল মার্কসের সেভেণ্টি পারসেণ্ট বরবাদ।

শীলা তখনও আনুনাসিক, আপনি দারুণ একখানা কৌতুক করলেন যা হোক।

আমি দেখছিলাম, সংসারের হাল আপনি কতখানি ধরতে পারেন।

যা হোক সেখানে আপনার হাতে অন্তত পাশমার্কটাও তো পেয়েছি।

তা পেয়েছেন। আর চেষ্টা যখন আছে তখন সিদ্ধিও একদিন অবশ্যম্ভাবী।

নৌকো ডাকবাংলোর ঘাটে এসে ভিড়ল। নামতে নামতে শীলা বলল, বেশ একখানা মজা হল আজ, মনে থাকবে অনেকদিন।

সুমিত বলল, আপনি যে কোন কিছুকে ফেস করতে ভয় পান না, এ সত্যটা আমার মনে থাকবে সারা জীবন।

ওরা উঠে দেখল, বাংলোর লনে গাড়ীর চালকটি দাঁড়িয়ে আছে। সে বাংলো থেকেই ওদের নৌকোতে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ছুটো মিলের ব্যবস্থা ছিল। লেকের হাওয়া আর নৌকো চালানোর পরিশ্রম মিলে চনচনে খিদে পেয়ে গিয়েছিল।

খেতে বসে খুব সাপ্‌টে খাচ্ছিল সুমিত। খাবার ব্যাপারে বন্ধু মহলে তার কিছু নামডাক আছে। শীলা সুমিতের খাবার রকম সকম লক্ষ্য করে নিজেই বোল থেকে তার ডিশে বেশী বেশী পরিবেশন করতে লাগল। প্রথমটা সুমিত বুঝতে পারেনি, পরে একসময় সে ডিশ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কি হল? বেশ তো খাচ্ছিলেন।

সুমিত তেমনি চুপ, কথা বলে না।

শীলা এবার বলল, সারা লেকের জল দাঁড়ের ঘায়ে তোলপাড় করে এলেন, ব্রহ্মাণ্ড গিলে খাবার কথা, এরই ভেতর হাত গুটিয়ে নিলেন!

আর আপনি? নিজে না খেয়ে আস্ত একটি রাক্ষসকে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন:

কে বলল খাইনি! তাহলে এতগুলো খাবার কি উধাও হয়ে গেল?

সুমিত চুপচাপ কিছু সময় শীলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, নাঃ আপনার আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। বাইরে থেকে আপনাকে যত আধুনিকাই মনে হোক না কেন, আপনি মনে মনে সেই সীতা সাবিত্রীর যুগেই হাঁটছেন। পুরুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ আপনাদের রক্তে।

হেসে বলল শীলা আধারকার, হয়ত তাই। আর তাছাড়া আমি তো প্রাচীন ইতিহাসেরই লোক।

সুমিত বলল, অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন, এখন দয়া করে আমাকে একটু পরিবেশনের সুযোগ দিন।

কোপ্তার বাটিটা সুমিত উপুড় করে দিতে যাচ্ছিল শীলা আধারকারের প্লেটে, শীলা সময়মত বাঁ হাতখানা বাটিতে ঠেকিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, আমাকেই ভাগটা করতে দিন। আদ্দেকের কানাকড়িও আপনাকে বেশী দেব না।

খাওয়া শেষ হলে ওরা সামনে রাখা গাড়ীতেই বেরিয়ে যেতে মনস্থ করল কিন্তু সমস্যা হল নৌকোটা নিয়ে। যথাস্থানে তাকে রেখে আসার দায়িত্ব আছে। একে তো কাউকে না বলেই এনেছে, তার ওপর অস্থানে ফেলে রেখে যেতে বিবেকে বাধল। অগত্যা সব মনোবাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আবার নামতে হল জলে।

সুমিত বলল, এবার আপনি একখানা দাঁড় ধরুন, আমি অন্যটা। দুজনে একতাল মিলিয়ে দাঁড় টানব, অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি নয়। দেখুন না, ওপারে পৌঁছানোর আগেই আপনার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

সোৎসাহে শীলা একদিকের দাঁড় অধিকার করে বসল।

ওপারে লেকের সংলগ্ন রাস্তায় গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ওরা নৌকো যথাস্থানে বেঁধে রেখে গাড়ীতে গিয়ে বসল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। উত্তেজনা তখনও শীলা আধারকারের সারা মন জুড়ে। সে বন্ধু সুমিত সরকারের নির্দেশমত তালে তালে দাঁড় টেনে এসেছে, প্রায় কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি।

এখন গাড়ী ছুটেছে আরব সাগরের তীর লক্ষ্য করে। সূর্যাস্তের আগে বিখ্যাত কটি সী-বীচ ঘুরে দেখতে হবে।

শীলাই প্রথম কথা বলল, যে কোন বিষয়ে শিখে নিতে বেশ এক ধরনের আনন্দ আর উত্তেজনা আছে।

যেমন ? আমি বলতে চাইছি, কি প্রসঙ্গে আপনার এ ভাবনাটা এলো।

এই ধরুন না, আজ আপনার কাছ থেকে নৌকো চালানোর কৌশলটা শিখে নিলাম। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে নতুন কিছু শিখতে পেরে।

খুব স্বাভাবিক। যে মাঝি ত্রিবেণীতে আমাকে নৌকো চালাতে শিখিয়েছিল সে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, নৌকো চালাতে আর পারে না। আমি প্রায়ই মানুষটার কাছে যাই, গল্প করি। এখনও ওর কথার নব্বই ভাগ জলের স্রোত আর নৌকোকে কেন্দ্র করে।

শীলা বলল, আপনি এখনও মানুষটিকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রশংসনীয়।

না না, নিন্দা প্রশংসার ব্যাপার নয়। যে মানুষটির কাছে কোন কিছু শিখেছি সে আমার গুরু। তাকে সঙ্গ দিলে নিজেরই আনন্দ।

আপনিও তাহলে এদিক থেকে আমার গুরু।

গম্ভীর গলায় সুমিত বলল, কি করে বলি বলুন এখনও গুরুদক্ষিণা পাইনি।

ও এই কথা, কি চাই বলুন ?

বিশেষ কোন চাহিদা নেই, শিষ্যার যা অভিরুচি।

তাহলে যে কদিন গোয়া দর্শন হবে সে কদিন গুরুর গুরুভোজনের দায়িত্ব বহন করবে শিষ্যা।

তথাস্তু। যথা লাভ।

দূরে পাহাড়ের আভাস। মাঝে চলেছে ক্ষেতের কাজ। মসৃণ পীচের রাস্তা। গাড়ী চলেছে ঝড় তুলে। শীলার চূর্ণ চুলের রাশি মাঝে মাঝে কপালে

আর মুখে ঝাপটা খেয়ে পড়ছে। দু'হাতের আঙুল বুলিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে শীলা। সুমিতের চোখ আটকে যাচ্ছে সেই একটুকরো দৃশ্যে।

সুমিত ভাবছে, দেহে মনে এমন পরিপূর্ণ একটা সৃষ্টি কি করে বিকল হয়ে যায়! শিক্ষা, সংস্কৃতি, চরিত্রের ভারসাম্য, সহজ সপ্রতিভ ব্যবহার, সব কটি গুণই যার সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত, সে কি করে ব্যর্থ হয়ে যায় একটা সুখের নীড় রচনা করতে। কেন শীলার স্বামী এমন একটি তুলনাহীনা নারীকে বেঁধে রাখতে পারলেন না! যে কোন প্রতিভাধর পুরুষের একান্ত কাম্য হতে পারে যে নারী, সে আজ পরিত্যক্তা। এ যেন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা।

সুমিতের মনে হয়, শীলা যদি তার জীবনের বন্ধ ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টে যেত তাহলে মানুষের জীবনের অনেক অকথিত আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যেত তার ভেতর। কিন্তু এ নারী স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া। যার কাছে সখ্য কখনও সংযমের সীমা লঙ্ঘন করে না। যার পুষ্পিত বসন্ত-শোভা দূর থেকে দেখে তারিফ করতে হয়, কাছে গিয়ে স্পর্শ করার অধিকার পাওয়া যায় না। বনভূমির অন্তরালে আরও কিছু শোভা, সৌরভ থেকে যায়, যা তার একান্ত নিজস্ব।

ভাগাতর বাঁচের কাছে এসে গাড়ীটা থেমে গেল। সামনে দিগন্ত ছোঁয়া নীল কালির সমুদ্র। পাহাড়ের খণ্ড খণ্ড চাঁই সাগরের জলে স্নান করছে কয়েকটি নারকেল গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে হীরের ঝলক। সূর্যকিরণের সঙ্গে সাগরতরঙ্গের লেনদেন। স্থানটি নির্জন। দু'চারটি দর্শনার্থী পুরুষ মহিলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

গাড়ী থেকে নেমে নরম বালিতে পা ডুবিয়ে শীলা আধারকার ভারী খুশী হয়ে উঠল। সে বসে পড়ে মুঠো ভরে বালি কুড়োতে লাগল।

পেছন থেকে সুমিত বলল, কি কুড়োচ্ছেন?

স্বর্ণরেণু। সোনার ধুলো।

বলতে বলতেই উঠে পড়ে ত্রস্ত পায়ে নীচের একটা বোল্ডারের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। মাথার ওপর দুলছে নারকেল গাছের আন্দোলিত পাতার ঝালর।

সুমিত জলের ঝিলমিল, নারকেল গাছ, বোল্ডারের ওপরে দাঁড়ান এক নারীকে ক্যামেরায় বন্দী করে নিল।

ছবি তোলা শেষ করে ক্যামেরাখানা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখামাত্র শীলা ওপর থেকে চোখ তুলে সুমিতের দিকে চেয়ে বলল, কি, ক্যামেরা বের করছেন না যে? এই ছোট্ট স্পটটা ভাল লাগছে না বুঝি?

সাবজেক্ট আমার ঠিক হয়ে আছে। শুধু আপনার একটুখানি সাহায্যের প্রয়োজন।

বলুন।

ঐ বোল্ডারের ওপর আপনি বসুন। চেয়ে থাকুন ডানদিকের সমুদ্র লক্ষ্য করে। আমি আপনার মুখের ডান দিককার প্রোফাইলটা ক্যামেরায় ধরতে চাই। আর আপনার ঐ বালুরঙের ওড়নাখানা শাড়ির প্রান্তের মত ছড়িয়ে দিন পায়ের তলায়।

অসংকোচে তেমনি করে বসল শীলা আধারকার। গায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো শালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরে এসেছে সে। শ্যাম্পু করা ঘন চুল হাওয়ায় দোল খাচ্ছে কাঁধের ওপর।

সুমিত ছবি তুলল। ক্যামেরা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বলল, এ ছবিখানা যদি মনের মত হয় তাহলে নোবল প্রাইজ পাওয়া কোন কবির কয়েক ছত্র কবিতা তুলে আপনাকে প্রেজেণ্ট করব।

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুটি প্রশ্নের উত্তর চাই।

বলুন।

প্রথম প্রশ্ন, কোন কবির কবিতা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কবিতার সেই ছত্রগুলি কি?

এই তো মুশকিলে ফেললেন, পুরো সারপ্রাইজটা মাটি।

আমার কাছে যে মুহূর্তে নতুন কিছু আসে, সেটাই সারপ্রাইজ। আপনার মুখে কবি আর কবিতার নাম শুনলে সেই সারপ্রাইজ আসবে।

সুমিত বলল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

শীলা গভীর শ্রদ্ধায় বলল, ভাষান্তরে তাঁর বহু রচনা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমে ইংরাজীতে তর্জমা করে বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়ে মূল বাংলায় কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাল সুমিত।

> 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
> বসিয়াছিলে উপল উপকূলে,
> শিথিল পীতবাস
> মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।
> নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে

চিকন সোনা লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।'

আপনি এমন দরাজ সুরেলা গলায় আবৃত্তি করতে পারেন তা জানতাম না।

সুমিত হেসে বলল, এটা আপনার কাছে অতিরিক্ত সারপ্রাইজ, তাই না?

হেসে মাথা নাড়ল শীলা। বলল, গলায় সুরের কাজ থাকলে উপভোগের ক্ষেত্রে ভাষা যে কোন বাধাই নয়, তার প্রমাণ পেলাম।

সুমিত বলল, আস্তাবল তৈরী, সাজপোশাক আর চাবুকও এসে গেছে, এখন কেবল অশ্বের আগমনের প্রতীক্ষা।

তার মানে?

উন্নতির ব্যবস্থা পাকা, সেটা আবার গৃহীতার জানাও হয়ে গেছে, এখন ফটোখানা ভালয় ভালয় উৎরোলে বাঁচি।

শীলা বলল, এত কষ্ট করে বসলাম, সামনে নীল সমুদ্রের দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম, সব কি বিফলে যাবে ভেবেছেন? কখনও না।

আপনার লাক আর আমার হাতযশ।

একটা দুর্গ শরীরে প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে অদূরে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শীলা বলল, ঐ দেখুন, ছাপোরা ফোর্ট। কান পাতুন, হয়ত শুনতে পাবেন কামানের গর্জন।

আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

শীলা বলল, অতীতের দরজায় কান পাতলে শোনা যাবে বইকি।

এবার ওরা এল আঞ্জুনা বীচে। ভাঙা ভাঙা নীচু পাথর ছড়ান অঞ্চল। মাঝে মাঝে নারকেল গাছের সারি। গাছের জটলার ভেতরে ছোট ছোট কুটির পাতায় ছাওয়া। নীচে বালু বিছানো সী-বীচ। এইসব কুটিরে হিপি হিপিনীরা মনের সুখে নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটায়। হোম থেকে সামান্য যেটুকু অর্থ আসে তাতে ওদের দিন চলে যায়। বছরের পর বছর ওরা এমনি করে কাটিয়ে যাচ্ছে ওদের দিনরাত্রি সমুদ্রতীরের এই স্বর্গরাজ্যে। তাই গোয়ার আঞ্জুনা বীচের নাম হয়েছে হিপিদের স্বর্গলোক।

ওরা বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, ছেলেপুলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, সমুদ্রে রাত নেই, দিন নেই স্নান করে পরমানন্দে। গান শোনে, আরব সাগর থেকে ভেসে আসা হাওয়ার সঙ্গে নারকেল পাতার ঘর্ষণে যে মর্মর ধ্বনি ওঠে, সেই গান। নিজেরা গীটার বাজায়। জ্যোৎস্না রাত্রে

চাঁদের আলো যখন নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে বালুর জমিনে রহস্যময় আঁকিবুঁকি তৈরী করে তখন ওরা তারই ওপর বসে গীটারে তোলে সাগরতরঙ্গের সুর।

ওদের পুরুষ আর নারী নিরাবরণ থাকতেই ভালবাসে। দিনে যে সব ভ্রমণার্থী আঞ্জুনা বীচে এসে দাঁড়ায় তারা অবাক হয়ে দেখে সমুদ্র-স্নান সেরে হয়ত একটি নারী, হয়ত বা একটি পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্নদেহে উঠে এল। তারপর দীর্ঘ বালুর জমিনে চরণ-চিহ্ন এঁকে চলে গেল নারকেল কুঞ্জের অভ্যন্তরে তাদের নির্দিষ্ট আস্তানার অভিমুখে। ওদের দেখলে মনে হবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার আগে গার্ডেন অব ইডেনে অসঙ্কোচে ঘুরে ফিরছে সম্পূর্ণ নিরাবরণ আদম আর ইভ।

শীলা আর সুমিত বসেছিল একটা উঁচু পাথরের চাঁইএর ওপর। হিপি মেয়েপুরুষেরা চলাফেরা করছে। ওরা তাকিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। কেউ কেউ ঢেউ ভেঙে স্নানের খেলায় মেতেছে। কারু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সুমিত উঠে দাঁড়াল। শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, যাবেন নাকি তীর ধরে খানিকটা এগিয়ে?

শীলা সারাদেহে আলস্যের ঢেউ তুলে বলল, একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনি বরং ঘুরে আসুন, আমি এখানেই আছি।

সুমিত অগত্যা একাই সমুদ্রতীর ধরে বাঁদিকে এগিয়ে গেল।

সুমিত চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে শীলা আধারকার। একটি প্রাণচঞ্চল যুবক ডক্টর সুমিত সরকার। বড় সুন্দর স্বাভাবিক আচরণে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। শীলার ভাল লাগে এমনি অসংকোচ ব্যবহার।

অনেক অনেকখানি দূরে সুমিত চলে গেল। আকার ছোট হতে হতে একটা বালির টিবির আড়ালে সুমিত অদৃশ্য হয়ে গেল। শীলা চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই চোখের ওপর ফুটে উঠল আর একখানা ছবি। ঠিক সুমিত যেখানে অদৃশ্য হল সেখানে থেকেই বেরিয়ে এল আর একটা আকার। এত দূর থেকে নারী কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ছবিখানা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পুরুষ না রমণী? সংশয়ও ঘুচল। একটি নগ্ন নারী এগিয়ে আসছে। সোনালী চুলের প্রপাত নেমেছে পিঠ আর দুটি কাঁধ ছুঁয়ে। আরও কাছে আসতে দেখা গেল নারীর বুক জুড়ে রয়েছে একটি শিশু। রমণীর মুখে মাতৃত্বের অপার আনন্দ-ছবি। শীলার মনে হল, এতক্ষণ আঞ্জুনা বীচের যে নগ্নতা তার চোখকে পীড়িত করছিল, এই একটুকরো ছবি

তার সব গ্লানি মুছে দিল। চিরদিনের ম্যাডোনা তার অপার স্নেহসিক্ত দৃষ্টি নিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। এই তো নারীর পরিপূর্ণতা। সে জননী হয়ে পূর্ণ করেছে তার নারীসত্তাকে। সেই মুহূর্তে একটা ব্যথার তরঙ্গ মনের অতল থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার দেহের কোষে কোষে। এ ব্যথা অসহ্য কিন্তু বড় আনন্দের। শীলা আধারকার দু'চোখ বুজে সেই বেদনভরা আনন্দের আস্বাদন করতে লাগল।

এবার ওদের গাড়ী চলল আগুয়াদা কোর্টের দিকে। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক দুর্গ। এখন প্রবেশমুখে 'প্রবেশ-নিষেধ'এর নোটিশ টাঙান।

গাড়ী থেকে নেমে গেট পেরিয়ে ডানদিকে অফিস ঘর। লাইট হাউসে ওঠার জন্য এখানে টিকিট কেটে নিতে হয়।

শীলা টিকিট কেটে নিয়ে একখানা টিকিট সুমিতের হাতে দিয়ে বলল, আপনি আগে ওপরে উঠে যান। বাতিঘরের ঘোরানো বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আপনি একখানা হাত আরব সাগরের দিকে প্রসারিত করে রাখবেন।

আর আপনি নীচে দাঁড়িয়ে মনের খুশীতে আমার ছবি তুলবেন, এই তো? কিন্তু আরব সাগরের দিকে হাতখানা প্রসারিত করে দেবার অর্থ?

প্লিজ প্রফেসার সরকার, আমাকে এখন আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আপনি দয়া করে ওপরে গিয়ে আমার সামান্য ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করুন।

তথাস্তু।

সুমিত ঢুকে গেল লাইট হাউসের ভেতরে। লোহার খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাতিঘর সংলগ্ন ছাদে। এ সময় অন্য কোন দর্শনার্থীর ভীড় ছিল না। সে নীচে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত নাড়ল। শীলা ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে তাক করে আছে। এবার সুমিত বাধ্য ছেলের মত এগিয়ে গেল সামনে। দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ তটরেখার ক্ষীণ আভাস। ডান হাতখানা সেদিকে প্রসারিত করে উদাত্ত কণ্ঠে সুমিত কালিদাসের সেই বহু প্রচলিত শ্লোকটির আবৃত্তি করতে লাগল। এমনি নির্জন পরিবেশে, সমুদ্রের দূর তটরেখায় নারকেল কুঞ্জের সবুজ হাতছানি দেখে কবি কালিদাস সম্ভবত তাঁর বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেছিলেন।

'দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।'

কতক্ষণ আপন মনে এমনি হাতখানা সমুদ্রতটরেখার দিকে প্রসারিত করে আবৃত্তি করছিল সুমিত। সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল শীলা।

সুমিত কিন্তু হাতও নামাল না, মুখও ফেরাল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

শীলা সহাস্যে বলল, কি হল, এখনও হাত তুলে যে?

যাঁর আজ্ঞায় শিরোধার্য করে হাত উঠিয়েছি, তিনি আজ্ঞা না দিলে সে হাত নামাই কোন সাহসে।

শীলা নিজেই হাসতে হাসতে সুমিতের হাতখানা ধরে নামিয়ে দিয়ে বলল, সংস্কৃত আবৃত্তিও আপনার অসাধারণ। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, স্বরক্ষেপণের ক্ষমতা, সব দিক থেকে অনন্য।

সুমিত বলল, এইসব প্রশংসাবাক্য শোনাবেন বলেই কি আমাকে ওপরে সমুদ্রের দিকে দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে দাঁড়াতে বলেছিলেন?

না, সুমিতবাবু, তার চেয়েও কিছু বেশী।

কি রকম?

আপনি এই লাইট হাউসের মত এক আলোর দিশারী। আপনার ছাত্রছাত্রীদের সামনে আপনি আলোকিত বাহুটি প্রসারিত করে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

আপনার উপভোগ্য ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ।

ওরা দুজনে লাইট হাউসের ওপর থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটি মনোরম মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। সবুজ গাছগুলি ঢালু বেয়ে সমতলের দিকে নেমে গেছে। নীচ থেকে ঘুরে ঘুরে গাড়ী আসছে ফোর্টের দিকে। দূরে কালানগুটে বীচের আভাস। হাঁসুলির মত নীল সমুদ্র বাতিঘরটিকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়ছে। দূরে ডোনাপলার আভাস। ঐ তো নদী জোয়ারী তার জল উজাড় করে দিচ্ছে সাগরে।

নীচে বাঁদিকে ফোর্টের একাংশ জেলখানায় রূপান্তরিত। ডানদিকে পাঁচতারকার হোটেলে 'তাজ আগুয়াদা'। হোটেলের নীচে স্নানার্থীদের জন্য তাজের নিজস্ব ছোট্ট সী-বীচ।

ঘড়ি দেখে শীলা বলল, সূর্যাস্তের বড় বেশী দেরী নেই। আমরা সৈকতের রানী কালানগুটেতে গিয়ে অস্তসূর্যকে নমস্কার জানাব।

ওরা লাইট হাউস থেকে নেমে এল। এবার গাড়ী চলল কালানগুটে বীচের দিকে। সবুজ নারকেল বীথি পেরিয়ে গাড়ী দাঁড়াল অজস্র

দোকানপাটের একদিকে। নানারকম পুরাতন দ্রব্যাদির পশরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছে ব্যবসায়ীরা। এর ভেতর আকর্ষণীয়, বিরাট বিরাট চাদরের ওপর সুদৃশ্য প্রিণ্ট আর এপ্লিকের কাজ।

সুমিত আর শীলার সে সব দেখার সময় ছিল না। তারা ভীড় ঠেলে নেমে গেল প্রশস্ত সোনালী বালুর জমিনে।

নানা পোশাকের নারী পুরুষ ভীড় জমিয়েছে সমুদ্রতীরে। বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রূপের আনন্দ মেলা। ছোট শিশুরা অল্প ভেজা বালি নিয়ে ঘর তৈরী করছে মহা উৎসাহে। মা বাবা একটু দূরে বসে পরিতৃপ্তির চোখে লক্ষ্য করছেন তাদের ক্রিয়াকর্ম। তারা ভাঙছে, গড়ছে, দৌড়চ্ছে। একটু তফাতে একটা বালুর টিবির ওপর বসে দার্শনিকের দৃষ্টিতে একটি মানুষ চেয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে।

হৈ হৈ করতে করতে একদল মেয়ে বাজারের পথ থেকে নেমে আসছে সমুদ্রতীরে। হাতে ধরা পাতায় ঠোঙাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নিজেরা উড়ে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের জলের দিকে। সম্ভবত ঐ ঠোঙাতে তারা চানা জাতীয় কিছু খাচ্ছিল। এখন ওরা ঢেউ-এর সঙ্গে খেলা করতে করতে পোশাকের প্রান্তগুলো ভেজাচ্ছে। কোন স্কুল থেকে মনে হয় বেড়াতে এসেছে ছাত্রীর দল। মিসট্রেসরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শাসনের ভঙ্গীতে কি যেন বলছেন। তাঁদের কথার সামান্য টুকরোও ওদের কান পর্যন্ত পৌছচ্ছে না। মাঝপথে হাওয়া আর সমুদ্রের ডাক কথাগুলোকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে কোথায় যেন নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত হচ্ছে। রক্তগোলক থেকে বিচ্ছুরিত আভায় ভরে গেছে চরাচর।

সুমিত বলল, এবার আমার পালা। দয়া করে সমুদ্রের জলে অঞ্জলি ভরে সূর্যকে ডানদিকে রেখে দাঁড়ান।

শীলা বাক্যব্যয় না করে বাধ্য মেয়ের মত তাই করল। সুমিত চমৎকার একটি সিল্যুয়েট ছবি তার ক্যামেরায় বন্দী করে রাখল।

শীলা তেমনি তর্পণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুমিত এগিয়ে গেল তার দিকে। বলল, ছবি কখন তোলা হয়ে গেছে, এখনও স্থির হয়ে কি ভাবছেন?

শীলা তখন যেন অন্য কোন মানবী। গভীর গলায় বলল, ভাবছি, একটি নারী, উদ্বেলিত সমুদ্র, অশান্ত সূর্যাস্ত।

গাড়ী যখন পানাজীতে এসে পৌছল তখন কিশোরী সন্ধ্যা তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মাণ্ডবীর কূলে সন্ধ্যার রমণীয় আলোকসজ্জা।

গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল শীলা। যুবক ছেলেটি বলল, আপনারা সোঁরাও আইল্যাণ্ডে নাচগানের আসরে গিয়েছিলেন কি?

শীলা মাথা নেড়ে জানাল, তাদের ওখানে যাওয়া হয়নি।

আপনারা তো কালকের দিনটা মাত্র গোয়াতে আছেন। টিকিট পেলে এখুনি মোটর বোটে চলে যান। দেখেশুনে আনন্দ পাবেন।

শীলা বলল, আমাদের নতুন হোটেল খুঁজে রুম বুক করতে হবে। যা ভীড়, পাব কিনা জানি না। এখন আবার গান শুনতে গেলে ফিরে এসে মাণ্ডবীর তীরে রাত কাটাতে হবে।

যুবকটি বলল, সে ভার আমাকে দিন। নটায় বোট আপনাদের নিয়ে ফিরে আসবে। আমি ঐ সামনের গ্লাস হাউসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। ঐখান থেকেই মোটর বোট সোঁরাও আইল্যাণ্ডে যাওয়া আসা করে। চলুন আমার সঙ্গে, টিকিট পাওয়া যায় কিনা দেখি।

যুবকটি ওদের প্রায় কোন কথা বলার সুযোগ দিল না। সুমিত আর শীলা গ্লাস হাউসের দিকে যেতে যেতে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

দুটো টিকিট পাওয়া গেল। বোট এখুনি ছেড়ে যাবে।

শীলা ড্রাইভার ছেলেটিকে বলল, তোমার টাকাটা নাও।

ও ফিরে এসে দেবেন, সময় নেই, উঠে যান।

শীলা বলল, আমাদের জন্য দু'খানা সিঙ্গল রুমের ব্যবস্থা রেখ ভাই।

যুবকটি মাথা নাড়ল। ওরা মোটর বোটে ঢুকে বসল।

মাণ্ডবী নদীর বুকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। মোটর বোট নেহ্‌রু ব্রীজের তলা দিয়ে পেরিয়ে এল। নেহ্‌রু ব্রীজকে একটা আলোর তৈরী সেতু বলে মনে হচ্ছে।

জলের বুকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। এত উজ্জল রূপোর কুচিসারা দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার উজাড় করেও একে কেনা যাবে না। শীলা আর সুমিত

পাশাপাশি বসে জলের বুকে এই আলোর খেলা দেখছিল। তাদের মুখে কথা ছিল না। ঝিরঝিরে হাওয়া সারা দিনের ক্লান্তি মুছে দিয়ে যাচ্ছিল। এপার ওপার দুপারেই ছায়াছায়া ঝোপ যেন জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে মাণ্ডবীর বুকে চতুর্দশী চাঁদের রূপোলী তীরের খেলা। ঐ তো দূরে একটা পাহাড় অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাহাড়ে, নদীতে, ছায়াময় বনে মায়াময় হয়ে উঠেছে তন্বী রাত্রি।

সুমিত শীলার হাতে নাড়া দিয়ে বলল, বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখুন, কি অপূর্ব একখানা চার্চ।

শীলা সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরাল। মুখের থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ।

নদী মাণ্ডবীর বুকে জেগে উঠেছে একখণ্ড ডাঙা। কালো আলখাল্লা পরা সবুজ বৃক্ষগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় স্নান করছে। সামনে ধবধবে সাদা গীর্জা, চূড়াটি গগন স্পর্শ করেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় চার্চের আলোকসজ্জা। মনে হচ্ছে হলুদ গাঁদাফুলের মালায় সাজান হয়েছে সারা গীর্জাটি। সেই গীর্জা তার আলোকসজ্জা নিয়ে প্রতিবিম্ব দেখছে জলের আর্শিতে।

বোট পেছনে জলের ঘূর্ণি তুলে চার্চ পেরিয়ে এল। অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে গেল গাঁদার মালা।

চার্চ মুছে যেতেই সুমিত বলল, কেমন একটি ছবি দেখালাম বলুন ?

ভোলার নয়।

অতশত বুঝি না, আপনি অন্য যে কোন একখানা ছবি দেখালেই চলবে।

সঙ্গে সঙ্গে শীলা সুমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি দৃশ্যের দিকে।

জনৈকা পৃথুলা ভদ্রমহিলা সম্ভবত তার শীর্ণ স্বামীকে শালের খুঁটি ভেবে হেলান দিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন।

সুমিত বলল, সন্দেহ নেই, দৃশ্যটি পরম উপভোগ্য। মনে হয় মোহময়ী প্রকৃতির প্রভাবে মূর্ছিতা।

আট কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বোট এসে স্পর্শ করল সোরাঁও আইল্যাণ্ডের মাটি। ছোট সমতল জায়গায় একটি আসর পাতা। তার পেছনে শত খানিক চেয়ার। দর্শকদের বসার আসন। অবশেষে সোরাঁও আইল্যাণ্ডের জ্যোৎস্না ধোয়া নারকেল বীথি।

শীলা সুমিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ওমা, এরা কোথায় ছিল, আমাদের সঙ্গে একই বোটে এল বুঝি!

সুস্মিত বলল, তাইতো দেখছি। বোটের সামনে যে একটুকরো ঘর, ওটার মধ্যেই ছিল, আমরা দেখতে পাইনি।

পাঁচটি মেয়ে বোটের ছাদে পা ঝুলিয়ে বসেছে। সাদা ব্লাউজ আর লাল ফুলওয়ালা ফ্রকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। সারা আসরের চারদিকে ঘিরে আলো। দুটি ছেলে ঐ মেয়েদের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে গীটার। তারা সাদার ওপর লালের আঁকিবুকি কাটা জামা পরেছে। প্যান্ট নিকষ কালো। পেছনে মাণ্ডবী নদী। তার ও-প্রান্তে কুয়াশার মসলিনে ঢাকা রাতের পাহাড়।

আসরের একপ্রান্তে বোট ঘেঁষে বসেছে বাদকের দল। ঢাপ, ডাব্‌লি, স্প্যানিশ গীটার, ঝাঁজ, তাসা আর স্যামেল নিয়ে বসেছে সবাই। মাঝে সম্ভবত পরিচালক বসে। তার হাতে একটি বীণা। পর্তুগীজ আর ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণে তৈরী আসর। প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে পরিচালক ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

প্রথমে 'দেখানি' নাচ সুরু হল। গোয়ায় বড় পরিচিত ও প্রিয় নাচ এটি। পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের সঙ্গে কোঙ্কনী সংস্কৃতি ও নৃত্যের অপূর্ব মিশ্রণ। নাচের ভঙ্গী আর মুদ্রায় কত্থক আর ভারতনাট্যমের সুস্পষ্ট প্রভাব।

বোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চার পাঁচটি মেয়ে। হলুদ, সবুজ, লাল কাঞ্জিভরমে সেজেছে। কিন্তু উগ্রতা নেই সাজসজ্জায়। আঠারো বিশ বছরের চারপাঁচটি তরুণী। মুখভরা সহজ মিষ্টি হাসি। বাঁ হাতে চিত্রিত মাটির পাত্র। তার ভেতরে প্রজ্জ্বলিত মাটির প্রদীপ।

ওরা বোট থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঐকতানে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর বেজে উঠল। বোটের ছাদে যে মেয়েগুলি বসেছিল তারা হাততালি দিয়ে গান গাইতে লাগল।

'হান্ড সায়ারা
পাইলতাদি ভাইতা'—

নাচছে মেয়েগুলি। চমৎকার আরতির মুদ্রা। তারই ভেতর পূজারিণীর অভিব্যক্তি। কখনো বা ভারতনাট্যমের নয়ন আর মুখ বিভঙ্গ। আবার কখনও কত্থকের পদচারণা।

নাচটি শেষ হলে এক ধরনের আরতির আবেশ ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। নর্তকীর দল পূজার পরিবেশটি রচনা করে আবার বোটের মধ্যে ফিরে

গেল। এ সময় ঝাঁজ (ঝাঁঝর), স্যামেল (খঞ্জনীর মত), আর ঢোলকি বাজছিল। ধীরে ধীরে সে শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

এরপর এল ফুগ্‌ডি নর্তকীরা। গণেশ চতুর্থী উৎসবের নাচ এটি। ভগবানের কাছে বর্ষার প্রার্থনা। কিন্তু ওরা যে গান দিয়ে শুরু করল তাতে বর্ষার প্রার্থনা ছিল না, ছিল প্রভাতে তুলসীকে সেবা করার কথা।

সূর্য উঠেছে, তুমি এখনো ঘুমিয়ে! -তুলসীর সেবা কর। জল ঢাল, কুমকুম লাগাও।

'উগাওয়ালা সূর্যদেব
আজুনি বন্দু কাইয়ো করি।
তুলসী বেহনি সেবা করু।'

সাদা পাটোলা পরেছে চারটি মেয়ে, সঙ্গে লাল ব্লাউজ। তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে। একটি বৃত্ত রচনা করে নাচছে তারা।

এবার মেষপালিকারা ফুগ্‌ডি নাচ কেমন করে নাচে তাই দেখান হল। ওরা পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে হাতে হাত বেঁধে নাচল। এ সময় কোন বাজনা বাজল না। মেয়েগুলি এগিয়ে পিছিয়ে নাচল, আর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক ধরনের বন্য পাহাড়ী সুর।

এবার শুরু হল ফোক্ সঙ্। এক ছেলে গালে আঙুল ঠেকিয়ে গানটি গাইলে। বিচ্ছেদের গান, বিরহের গান।

গানটির টাইটেল হল : 'কাজি যা যা যা যা।'

'সাইউ দিজেন্দু
কি ভো আলি
ই ভলতু যা।
মইস নাউ ভলতৌ
পুরকে পুরকে সেরা।'

মেয়েটি ছেলেটিকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যাবার সময় বলে গেছে, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। কতদিন গেল, তবু সে তো ফিরে এল না। আমি জানি না, কথা দিয়ে কেন সে এল না।

সারা সন্ধ্যার আকাশকে ভারাক্রান্ত করে চিরবিরহের সেই সুর ছড়িয়ে পড়ল,—'সে তো এল না, সে তো এল না। যারে সঁপিলাম প্রাণ মন দেহ'।

স্মিত চকিতে একবার তাকাল শীলার দিকে। শীলা তখন ঘাড় গুঁজে কোঙ্কনী ভাষার কথাগুলো নোট করে চলেছে।

সুমিত ভাবল, শীলা যে উদ্দেশ্যে কনডাকটেড ট্যুর এড়িয়েছিল তার অনেকখানিই এখানে এসে সফল হল। শীলার ভেতর এমন এক ধরনের সচেতনতা আছে যা জগত আর জীবনের কোন রসকেই বৃথা যেতে দেয় না।

অনেকগুলি নাচ গানের ভেতর দিয়ে গোয়ানিজ কালচারের পরিচয় রাখলেন উদ্যোক্তারা। এবার তাঁরা পরিবেশন করলেন তাঁদের শেষ নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানটি।

এটি 'ডেকনী' নাচ। বিয়ের উৎসবে গানসহ এই নাচের বিশেষ চলন আছে গোয়ানিজ সমাজে।

দুটি মেয়ে থালার ওপর প্রদীপ নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল। সমস্ত আসরটা তারা প্রদক্ষিণ করতে লাগল তালে তালে পদবিভঙ্গে। ডানহাতে উত্তোলিত মাঙ্গলিক ডালা, বাঁ হাতখানা লীলাভরে দুলিয়ে চলেছে। কোন একটি গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে যেন চলেছে ওরা। হ্যাঁ, ওরা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই চলেছে। মাণ্ডবী নদীর ওপারে ওদের প্রিয় সখির বাড়ী। আজ তার বিয়ে। সেখানে নাচের নিমন্ত্রণ আছে ওদের।

সহসা ঐক্যতানে গুরুগুরু ধ্বনি শোনা গেল। তার যন্ত্রে বায়ুর শন শন শব্দ। ঝড় এল মাণ্ডবীর কূলে। মেয়েদের চলার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে থেমে গেল। ওরা বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ তুলে প্রকৃতির রুদ্ররূপ একবার দেখে নিল।

মাঝি মাঝি, ও ভাই মাঝি, কোথায় তুমি?

'আউ সাইবা পোল্টরি ওয়েত্তা
মাথাওয়াইট দাকোই'।

আমরা নদীর ওপারে যেতে চাই, পথ দেখাও।

হঠাৎ আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল এক যুবক মাঝি। তার হাতে একটি ছোট্ট হাল। সে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল:

'ওইলা ওইলা ডংরা
উদগ ওয়াউতা—'

দুটো পাহাড়ের মাঝখানে নদী। দেখছ না কি তীব্রবেগে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এ আথালপাথাল নদী পার করব কেমন করে।

হাল নেড়ে নেড়ে নাচের ভঙ্গীতে মাঝি বলতে লাগল, না না না না, আমি নাও ভাসাব না।

মেয়ে দুটো তখন নাচের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল, 'গে গে গে পাইবা।' তোমাকে আমরা নিশ্চয় কিছু দেব, খুশী করেই দেব।

মাঝি তবুও মাথা নেড়ে বলল, 'মাকানাকা গো'। চাই না আমি কিছুই চাই না গো।

মেয়েগুলিও নাছোড়। তারা কানের ঝুমকো, হাতের কাঁকন খুলে দিতে চাইল। যে করেই হোক আজ রাতে তাদের বিয়ের আসরে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু মাঝির সেই এক গোঁ, সোনা দানা যাই দাও, যেতে আমি পারব না।

শেষে হতাশ হয়ে মেয়ে দুটি বসে পড়ল মাটিতে। কিছু পরে ওরা নিজেদের ভেতর কিছু একটা পরামর্শ করে উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বলল, ও ভাই মাঝি, বিয়ে হয়েছে তোমার?

মাঝি মাথা নেড়ে জানাল, না।

দ্বিতীয় মেয়েটি অমনি বলল, কথা দিচ্ছি মাঝি ভাই, তোমার বিয়েয় দিনে আকাশ ভেঙে পড়লেও আমরা দুজনে ঠিক তোমার বাসরে নাচতে যাব।

এই কথাটি তরুণ মাঝিটিকে উতলা করে দিলে। সে আনন্দে হালটি ধরে জুড়ে দিল নাচ। তুফান যতই উঠুক, পার তোমাদের করবই।

এরপর তিনজনেরই শুরু হল নাচ। দুটি মেয়ে হাতে মাঙ্গলিক থালি নিয়ে বসে বসে দেহ দোলাচ্ছে, আর মাঝি হাল ধরে টলোমলো তুফানের মাঝে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাবার ভঙ্গীতে নাচছে।

এমনি করে নাচতে নাচতে তারা মাণ্ডবী নদীর দিকে যেতে লাগল। শেষে একসময় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল বোটের মধ্যে।

দর্শকদের করতালিধ্বনি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সোরাঁও আইল্যাণ্ডের অরণ্য পাহাড় আর মাণ্ডবীর জলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এবার উঠে দাঁড়ালেন বীণা হাতে সেই পরিচালক। বললেন, দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ যদি কোন কিছু অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তাহলে গোয়াবাসী হিসেবে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করব।

দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে না দেখে শীলা বলল, কিছু একটা করতে হয় আমাদের, না হলে মান থাকে না।

সুমিত বলল, আমি একটা গান গাইতে পারি। শচীন দেব বর্মণের গান।

ও এস, ডি, বর্মণের গাইবেন! দারুন জমবে।

আর আপনি? আপনি গান গাইবেন তো?

না, আপনি গান, আমি নাচব কথক।

তাল মান লয় বোল, কে বলবে, কে বাজাবে ?

ওরা যেমন পারে বাজাক, আমি ঐ মেয়েদের কাছ থেকে ঘুঙুর চেয়ে নিয়ে নাচব।

উঠে দাঁড়াল সুমিত। এগিয়ে গেল আসরের মাঝখানে। ইংরেজিতে প্রথমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল আর, ডি, বর্মণের সেই বিখ্যাত গান, 'পদ্মার ঢেউ রে……'

আশ্চর্য সুরেলা গলায় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুমিত গাইল পদ্মার গান। শীলার মনে হল, সামনের ঐ মাণ্ডবী নদী গগন প্রমত্তা পদ্মায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

সকলের করতালিধ্বনি আর অনুরোধে সুমিত হেমন্তের গাওয়া কালজয়ী সেই রানার গানটি পরিবেশন করল।

উদ্যোক্তারা সুমিতকে ছাড়ল না। গানের শেষে তাকে আপ্যায়নের জন্যে ধরে নিয়ে গেল বোটের মধ্যে।

সুমিত বলল, দর্শকদের ভেতর আমার বান্ধবী শীলা আধারকার রয়েছেন। তিনি উঁচুদরের নাচিয়ে আর গাইয়ে। তাঁকে নাচের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারেন।

অমনি উদ্যোক্তারা মহা উৎসাহে ঘোষণা করল শীলা আধারকারের নাম। কথক পরিবেশন করবেন শীলা আধারকার।

সুমিত উদ্যোক্তাদের নূপুরের কথা বলতেই একটি নর্তকী মেয়ে বোটের ভেতর থেকে নূপুর নিয়ে আসরে ছুটল। শীলা ততক্ষণে আসরে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি গিয়ে শীলার পায়ের কাছে বসে নূপুর পরাতে লেগে গেল। শীলা বাধা দিতে গেল, সে নিজেই পরে নেবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে শীলার পায়ে নূপুর পরিয়ে ছাড়ল।

শীলা 'বেহালা', 'তাসা' আর 'মাদলমে'র বাদকদের বলে এল, আমি মুখে বোল বলব আর পায়ে কাজ তুলব। আপনারা সেই মত বাজাবেন। আমি কিন্তু উঁচুদরের কোন শিল্পী নই, আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন।

আসরে এসে বোলের সঙ্গে সঙ্গে পা আর চোখের কাজ শুরু করল শীলা।

যাদুর ছোঁয়ার মুহূর্তে জমে উঠল আসর। বোটের ছাদে গোয়ানিজ শিল্পীদের সঙ্গে বসে মোহময়ী নর্তকী শীলা আধারকারকে দেখছিল সুমিত। এ অন্য আর এক শীলা। সারাদিন একই গাড়ীতে যে মেয়েটির পাশে বসে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, তার সঙ্গে এ মেয়েটির আদপেই যেন কোন মিল নেই।

অভিনয়ে, লীলা বিভঙ্গে, পদচারণায় শীলা দর্শকচিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল কতক্ষণ। তার ঠাট, সেলামী, আমদ, তোড়া টুকরা, পরশ, ভাব, গৎভাব, লয়কারী আসতে লাগল পর্যায়ক্রমে। প্রতি পর্যায়ে এক একটি করে পাপড়ি মেলে শীলা যখন নিজেকে কুঁড়ি থেকে পুষ্পে বিকশিত করছিল, তখন ভাবছিল, সে বসে আছে কোন বাদশাজাদার সাজান নৃত্য বাসরে। অতিথির আসনে বসে সে দেখছে, বেহেস্তের কোন হুরীর নৃত্যলীলা। নর্তকী যখন সাগরের তরঙ্গের মত নৃত্যছন্দে খুশীর হীরে মতি ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে তখন পুলক রোমাঞ্চে কেঁপে উঠছে দর্শকের চিত্ত। আবার যখন সে পিছিয়ে যাচ্ছে তখন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হাহাকার করে উঠছে সমস্ত হৃদয়।

এবার কামালী পরণে চক্রাধারে ঘুরতে লাগল শীলা আধারকার। তেহাই-এর শেষে প্রথম আবর্তনে সমে এসে প্রথম ধা পড়ল, দ্বিতীয় আবর্তনে দ্বিতীয় ধা এবং সবশেষের আবর্তনটি সমে আসা মাত্রেই পড়ল শেষ ধা।

শীলা সেলামী দিতে দিতে পিছিয়ে গেল দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে।

দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতে লাগল। মনে হল, হাজার পায়রা পাখায় শব্দ তুলে ভেসে গেল জ্যোৎস্নার মায়াভরা আকাশে।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না সুমিতের চোখে। সারাদিনের খুঁটিনাটি ছবিগুলো চলচ্চিত্রের মত ভেসে যাচ্ছিল চোখের ওপর দিয়ে। গোয়ার নদী, বন, পাহাড়, সাগর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, কিন্তু আশ্চর্য সেই সব প্রাকৃতিক সম্পদের ভেতরে কোহিনূরের মত জ্বল জ্বল করছিল একটি নক্ষত্র। যার হাসির দ্যুতি, কমনীয়তা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু সে থাকে ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে।

পাশের ঘরে কি শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে? না সে তারই মত বিছানায় শুয়ে সারাদিনের পথযাত্রার স্বপ্ন দেখছে? শীলার সুখময় স্মৃতির কোন কোণ থেকেই কি একটিবারের জন্যেও সুমিত বেরিয়ে আসছে না? হয়ত বা সব স্মৃতির বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছে শীলা আধারকার।

হঠাৎ সুমিতের মনে হল, যদি ডিভোর্সই হয়ে থাকে তাহলে আধারকার তার পূর্ব পদবীতে ফিরে যেতে পারে, অথবা বহাল রাখতে পারে তার পূর্ব স্বামীর পদবীটি, অথবা…। এই অথবার কাছে এসে আটকে গেল সুমিতের

ভাবনা। কিছু পরে স্থির হয়ে ভাবল, শীলার মত রূপে গুণে এমন আকর্ষণীয়া একটি নারী যে কোন প্রতিষ্ঠাবান পুরুষের কাম্য হতে পারে। তখন শীলা গ্রহণ করবে তার নতুন স্বামীর পদবী।

হঠাৎ সুমিত যেন নিজের ভেতর খানিকটা সাহস ফিরে পেল। সে ভাবল, শীলা সরকার নাম হলে শীলার কানে শুনতে কি খুব খারাপ লাগবে? হয়তো, হয়তো নয়। কে এর উত্তর দেবে। যে শুয়ে আছে একটি দেওয়ালের ওপারে সে কি উঠে এসে উত্তর দিয়ে যাবে এই প্রশ্নের।

সুমিত কল্পনায় দেখল, তার সামনে একটি পুষ্পিত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষের ডালে একটি পাখি। সে নিরন্তর তার বসন্ত-বেদনার ডাক পাঠিয়ে চলেছে। আমি একা, আমি একা, আমি একা। আমার একাকীত্বকে ভেঙে দিতে তুমি কি আসবে না?

॥ ৪ ॥

যে তরুণী একদিন এখানে তার প্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষা করে বসেছিল সে আর কোনদিনও ফিরে আসবে না এখানে। সাগরের নীল জল তাকে ঢেউ-এর দোলায় দোলাতে দোলাতে নিয়ে গেছে অতল জলের তলে। সেখানে নুড়ি পাথর আর বালির বিছানায় সে শুয়ে আছে। সমুদ্র-শৈবাল সেই কেশবতী কন্যার কেশ নিয়ে হাল্কা নাচের খেলায় মেতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের হাওয়ায় ভেসে আসে তার দীর্ঘশ্বাস। টিলার ওপরে বসে যে সব মানুষ আর মানুষী মার্মাগাঁও উপসাগরের ঢেউকে নীচে আছড়ে পড়তে দেখে তারা সেই ভাঙা ভাঙা শব্দে শুনতে পায় একটি ডাক—ডোনা পাওলা, ডোনা পাওলা।

টিলার ওপর বসে ইংরাজীতে তার ডায়েরীর পাতায় এই কটি কথা লিখেছিল সুমিত। একটি তরুণীর ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসকে বুকে ধরে পানাজীর সাত কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী টিলা 'ডোনা পাওলা'।

শীলা বলল, ডায়েরীর পাতায় কি লিখছেন এমন তদ্গত হয়ে। হিসেবপত্র নাকি?

সুমিত বলল, হিসেবই কষছি, তবে জীবনের পাতায় যোগবিয়োগের হিসেব।

শীলা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল উপসাগরের নীল জল আর সাদা ফেনার দিকে চেয়ে। সে এখন সুমিতের বেঞ্চের পাশে এসে দাঁড়াল।

চলমান জীবনের হিসেব নাকি?

সুমিত বলল, না, ঠিক চলমান জীবনের হিসেব নয়, আমি কষছি 'ভোনা পাওলা'র জীবনের অঙ্ক।

উৎসুক হল শীলা আধারকারের আঁখি-পাখি। তবে শিষ্টাচারের সীমা পেরিয়ে সে সুমিতের ডায়েরীখানা চাইতে পারল না।

সুমিত শীলার মনোভাব বুঝতে পেরে ডায়েরিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পাগলের প্রলাপ। অঙ্কে ফেল করা ছেলের আইনস্টাইন হবার সাধ।

শীলা ডায়েরীখানা হাতে তুলে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

সামান্য কয়েক সেকেণ্ড পরে সুমিতের দিকে চোখ তুলে বলল, আপনি আসলে সাহিত্যের ছাত্র। পুরোপুরি একজন কবি।

সুমিত বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, কবিতার রোগে যাকে ধরে সেই কবি হয়। সেদিক থেকে আমাকে কবি না বলে রোগী বলতে পারেন।

সত্যি আপনার এই কছত্র লেখা দারুণভাবে মনকে স্পর্শ করে।

আপনার প্রশংসার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। এখন চলুন মীরামার বিচে যাই।

ওরা এল মীরামার বেলাভূমিতে। তাল তমাল নয়, তাল নারকেলের বনবীথিতে বড় স্নিগ্ধ, বড় ছায়াময় স্থানটি। সবুজ বীথির নীচে চেয়ার পাতা। ওরা দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল। কিছু জলখাবারের অর্ডার দিল। এখানে নীল সমুদ্রের ধারে শ্যামল বৃক্ষের তলায় রেস্তোরাঁ।

এখন শীলা নিজের চেয়ারখানা সুমিতের কাছে টেনে নিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসল।

সমুদ্রের কাছে এসে সমুদ্র না দেখলে মন ভরবে কেন?

সুমিত বলল, তাইতো আমি আগেভাগেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছি। ঐ দেখুন মাণ্ডবী আরব সাগরে তার জল উজাড় করে দিচ্ছে।

শীলা আঙুল তুলে বলল, ঐ বুঝি নদীর মোহনা?

তাইতো দেখছি। ম্যাপও তাই বলছে।

বালিগুলো দেখছেন কেমন সোনালী?

সকালের রোদ সী-বীচটাকে আরও সুন্দরী করে তুলেছে।

ওরা প্রভাতী জলযোগ শেষ করে উঠে পড়ল।

সুমিত বলল, ঐ দূরে একটা সুন্দর প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে।

শীলা অমনি বলল, ওটা নিশ্চয়ই গভর্ণরের প্রাসাদ।

আপনি কি করে জানলেন?

যেমন করে আপনি মাণ্ডবীর মোহনার ঠিকানা দিলেন।

আচ্ছা রেস্তোর্ঁার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

শীলা অমনি একটি বয়কে হাত ইশরোয় কাছে ডাকল।

সুমিত বলল, আচ্ছা, ওটা কি গভর্ণর্‌স্ হাউস?

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল, সাহেবের অনুমান ঠিক।

এবার ওরা চলল 'বম জেসাস অব ব্যাসিলিকা'র দিকে।

গোয়ার অতি প্রসিদ্ধ চার্চ এই 'বম জেসাস'। এর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ, এখানে সন্ত ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মরদেহ রক্ষিত আছে।

পনের শত বিয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ার প্রথম ভারতভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করেন। তারপর নিরবচ্ছিন্ন কয়েকটা বছর ধরে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান সময়। পর্তুগালের রাজাকে লেখা তাঁর একখানা চিঠি থেকে জানা যায়, ভারতের মানুষ খৃষ্টধর্মকে কিভাবে গ্রহণ করত।

তিনি সেদিনের গোয়ানিজ খৃষ্টানদের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, এদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে একটা শার্ট অথবা প্যাণ্টের লোভে। এইসব সাধারণ মানুষগুলি ইউরোপীয়দের সঙ্গে গীর্জায় একাসনে বসতে পাবে, শুধু সেই গৌরব লাভের জন্য খৃষ্টান হয়ে যায়।

জেভিয়ারের ধর্মপ্রচারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পথের ওপর দিয়ে একটি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটে চলতেন। শিশুরা তাঁর পেছন পেছন ছুটত, যুবা বৃদ্ধ নারীপুরুষ জড় হত তাঁর চারদিক। তিনি অতি মধুর স্বরে, কখনও সংগীতের সুরে বাইবেলের কথাগুলি সহজ করে বলতেন।

এইভাবে তিনি বহু মানুষকে খৃষ্টধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরক্ত করে তোলেন। হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে তিনি রোগীদের সেবা করতেন। বিচারে যেসব আসামী চরমদণ্ড পেত তিনি অনেক সময় তাদের কাছে থাকতেন। তাদের জন্য চোখের জল ফেলে প্রভুর কাছে জানতেন প্রার্থনা।

গাড়ীতে 'বম জেসাসে'র দিকে যেতে যেতে সুমিত সেণ্ট জেভিয়ার সম্বন্ধে ভাবছিল এই সব কথা।

সুমিতকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে শীলা বলল, কি ভাবছেন প্রফেসার সরকার? নিশ্চয়ই সেণ্ট জেভিয়ারের কথা।

আপনি তো দেখছি জাত জ্যোতিষী।

এতে জ্যোতিষের কি আছে। যাচ্ছি বম জেসাস, এ কজন ঐতিহাসিক মৌন হয়ে বসে বসে কিছু ভাবছেন, স্বাভাবিকভাবেই সেণ্ট জেভিয়ার এসে পড়েন।

হ্যাঁ প্রফেসার আধারকার, ঐ আশ্চর্য মানুষটির কথাই ভাবছিলাম।

আমিও ভাবছিলাম ওঁর কথা, ওঁর শেষ দিনগুলোর কথা।

সুমিত অমনি বলল, সেণ্ট জোভিয়ার ক্যানটন যাবার পথে প্রতিকূল অবস্থায় সানসিয়ান দ্বীপে থাকতে বাধ্য হন। ওখানে ২রা অথবা ৩রা ডিসেম্বর ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে ওঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ওখানে থেকে ওঁর বডি গোয়ায় এল কি করে সেটা আমার সঠিক জানা নেই।

যতটুকু শুনেছি, ওখানে সেণ্ট জেভিয়ারের দেহ কবরের ভেতর ছিল। তারপর সান্তাক্রুজ জাহাজে ঐ দেহ মালাক্কাতে আনা হয়। জাহাজে আনার সময় ক্যাপ্টেন কিছু চুন ঐ কফিনের ভেতর ঢেলে দেন। ঐ দেহ পুনরায় মালাক্কাতে কবরস্থ করা হয়। মালাক্কার নিয়ম অনুযায়ী কফিনের বদলে শুধু মাটির গর্তেই সেণ্ট জোভিয়ারের দেহটিকে প্রোথিত করা হয়। পরে একসময় মালাক্কায় খৃষ্টান মিশনের চার্জ নিয়ে যিনি আসেন তিনি শ্রদ্ধাবশত জেভিয়ারের দেহ মাটি থেকে খুঁড়ে দেখতে যান। কি আশ্চর্য! দেহে এতটুকু পচন ধরেনি।

ঐ অলৌকিক দেহটি এরপর নিয়ে আসা হয় গোয়াতে। অবিশ্বাসী ডাক্তার এবং কোন কোন যাজক দেহটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। তাঁরা আবেগে চোখের জল ফেলতে থাকেন।

আপনি তো সেণ্ট জেভিয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন দেখছি।

শীলা বলল, একসময় কৌতূহলী হয়ে ওঁর সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা করেছিলাম।

এখনও কি দেহ তেমনি রয়েছে?

শুনেছি, দেহ শুকিয়ে এসেছে। এখন তাকে রাখা হয়েছে কাচের আধারে।

সুমিত বলল, চলুন, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে।

শীলা বলে চলল, বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে সেণ্ট জেভিয়ারের দেহটিকে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বাইরে এনে রাখা হত। অত্যুৎসাহী ভক্তদের কেউ কেউ তাঁর পায়ের আঙুল, মাথার চুল প্রভৃতি সুকৌশলে কেটে নিয়ে চলে গেছে। এক পর্তুগীজ মহিলা, নামটা যদ্দুর মনে পড়ছে, ডোনা ইসাবেল

ডা ক্যারম, স্মৃতিরক্ষার জন্য দাঁত দিয়ে পায়ের কড়ে আঙুলটাই কেটে নিয়ে গেছেন। ফাদার জেনারেল ক্লড অ্যাকোয়াভিভার আদেশে ডান হাতের কিছু অংশ কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোমে। তারপর প্যারিস, জাপান থেকে বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছে জেভিয়ারের মরদেহের কিছু কিছু অংশ। শুধু দেহই নয়, ইউরোপের কোন একটি দেশের সম্রাজ্ঞী বহু অর্থের বিনিময়ে কিছুদিনের জন্য সেণ্ট জেভিয়ারের বালিশটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্থমিত মন্তব্য করল, মানুষটি যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল পীড়িতের সেবা করে, দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করে অশান্ত ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবার মৃত্যুর পরেও তাঁর ঐ দেহের বিশ্রাম জুটল না।

গাড়ী এসে গেল 'বম জেসাসে'। ওরা গাড়ী থেকে নেমে বিশাল চত্বর পেরিয়ে চার্চের ভেতর ঢুকে গেল।

বহু প্রাচীন স্মৃতির সংগ্রহশালা এই বম জেসাস। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু।

স্থমিত বলল, সব শেষে আমরা দেখব সেণ্ট জেভিয়ারের অমর দেহ।

শীলা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই।

একসময় সবকিছু দেখার শেষে ওরা এসে দাঁড়াল সেণ্ট জেভিয়ারের মরদেহের স্থসজ্জিত আধারের সামনে। কিন্তু হায়, অনেক উঁচুতে রাখা হয়েছে সে আধার। নীচ থেকে দেহটিকে যথাযথ দেখা সম্ভব নয়।

শীলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম খুঁটিয়ে দেখব বলে। এতটা নিরাশ হতে হবে ভাবিনি।

তাকে প্রবোধ দেবার ছলে স্থমিত বলল, রূপোর আধারটার দিকে চেয়ে দেখুন, চোখ জুড়িয়ে যাবে।

শীলা বলল, নীচে পাথরের তৈরী স্থরম্য স্মৃতিসৌধটি আগে দেখুন। দেবদূত, ফুল আর পাতার মালা, সেণ্ট জেভিয়ারের পবিত্র কর্মের চিত্রিত রিলিফ, সব মিলে এক অসাধারণ শিল্পকর্ম।

ওরা পাথরে তৈরী স্মৃতিসৌধটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

শীলা বলল, ইতালীর এক ডিউক, ফার্দিনান্দ্ সেকেণ্ড এই অপূর্ব পাথরের সৌধটি তৈরী করিয়ে দেন। সেকালে ফ্লোরেন্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পী জিওভানী বাতিস্তা দশ বছর পরিশ্রম করে এই দর্শনীয় বস্তুটি তৈরী করেন।

বম জেসাস থেকে বেরিয়ে ওরা ঢুকল 'সে ক্যাথিড্রালে'। বিশাল চার্চ। অপূর্ব সাজান বেদী আর প্রশস্ত প্রার্থনার হল।

শীলা কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ বলে উঠল, ঐ তো, ঐ তো সেই রিলিফ।

সুমিত বলল, কিসে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রফেসার আধারকার ?

ঐ দেখুন বেদীর তিনদিকে সেই ধর্মযাজিকার মূর্তি, যাঁকে হত্যা করেছিল এক পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন।

হ্যাঁ, রিলিফে তাইতো দেখছি, কিন্তু ঘটনাটি কি ?

শীলা বলল, যতটুকু শুনেছি, এক ধর্মযাজিকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে এক দুর্বৃত্ত ক্যাপ্টেন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। ধর্মযাজিকা অস্বীকার করায় তার কাছে দুটো প্রস্তাব পাঠান হয়। হয় বিয়ে নয় মৃত্যু !

ধর্মযাজিকা মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় বলে মনে করেন। ঐ দেখুন ধর্মযাজিকার কাছে প্রস্তাব করা হচ্ছে। কয়েকটি রিলিফে ঘটনাটি বোঝান হয়েছে। আর ঐ শেষেরটিতে দেখুন, অস্ত্রাঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে মস্তক।

বাতিদানে বসান আছে বৃহৎ আকারের কতকগুলি মোমবাতি। বিশাল হলঘরখানা এখন শূন্য, নিস্তব্ধ। অস্পষ্ট আলোছায়ায় এক গভীর গম্ভীর পরিবেশ। হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওদের দুজনেরই মনে হল, 'সে ক্যাথিড্রালে'র সবত্রই অখণ্ড এক পবিত্রতা বিরাজ করছে।

ওরা এবার এল একটি তোরণের সামনে যা ভাস্কো ডা গামার স্মরণে তৈরী হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ আর ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে এসেছিলেন ভাস্কো ডা গামা। তাঁর গোয়ায় অবতরণ স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পর্তুগীজরা এই প্রবেশ-তোরণটি তৈরি করায়।

ভারত ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার অধ্যায়গুলিকে আলোচনা করতে করতে ওরা অবার এসে উঠল গাড়ীতে। গাড়ী চলল দক্ষিণ গোয়ার মন্দিরগুলি লক্ষ্য করে।

মাঝপথে গাড়ী থামাল শীলা আধারকার। পাহাড়ের কোলে একটি গ্রাম। ঠিক গ্রাম বলা যায় না, মধ্যবিত্ত মানুষের আট দশখানা ঘর। সবুজ গাছ-পালায় ছায়াচ্ছন্ন। তেমনি উঠোনে চিত্রিত তুলসীমঞ্চ।

শীলা গাড়ী থেকে নেমে বলল, আমি এই গ্রামে কিছু সময় থাকতে চাই। ঘরবাড়ী দেখে মনে হচ্ছে এটি আধুনিক জগতের স্পর্শ থেকে কিছু দূরে এখানে হয়ত প্রাচীন গোয়ার লোকাচারের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

সুমিত বলল, চলুন না, 'মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'

ওরা পথের একপাশে গাড়ী রেখে গ্রামের ভেতর ঢুকল। গাছগাছালির আড়াল পেরিয়ে ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল যেখানে দু'তিনটে দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। খবর নিয়ে জানা গেল, এখানে এক ডাক্তারবাবুর বাড়ী। পানাজীর হাসপাতালে তিনি কাজ করেন। সপ্তাহে যে তিন দিন বাড়ী আসেন সেই দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু রোগী এসে ভিড় জমায়। খুব নাম-ডাক ডাক্তারবাবুর।

চলুন মিঃ সরকার, রোগ সারিয়ে আসি।

সবিস্ময়ে সুমিত বলল, আপনার রোগ ওখানে সারবে!

পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি।

দু'চার পা এগিয়ে যেতেই ওদের চোখে পড়ল একটি হোটেল। লোকজন মধ্যাহ্নের আহারে বসেছে। শীলা অমনি বলল, আচ্ছা প্রফেসার সরকার, এখানে আমরা লাঞ্চটা সেরে নিতে পারি।

অবশ্যই। বেলা যত চড়ছে ক্ষিদেও তত বাড়ছে।

ওরা গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে খেতে বসে গেল। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হল পোস্ত দিয়ে চিংড়ি ভাজা। যার কোঙ্কনী নাম, তড়েলি সুংতা। তার ওপর ডাল আর বেইগনকা ভাজি। ভাজি অর্থে, তরকারি।

শীলা দেখল, এই কটি পদ দিয়েই বেশির ভাগ লোক খেয়ে চলে যাচ্ছে। এবার হোটেলের কর্তা ওদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু?

কি আছে আর?

দড়িয়ারা মাছের হোমণ্ড।

অর্থাৎ দড়িয়ারা নামের একপ্রকার ছোট মাছের কারি।

তাই নেওয়া হল। সঙ্গে দিল 'শোল কড়ি'। একটি ছোট্ট বাটিতে লাল জলের চাট। শোল গাছের ছাল শুকিয়ে জলে ফেলে দিলে রঙটা লাল হয়ে যায়। তার সঙ্গে নুন, লেবু, লঙ্কা মিশিয়ে তৈরী হয় এই মুখরোচক পানীয়।

খাওয়ার শেষ পর্বে কি ভেবে সুমিত বলল, প্রফেসার আধারকার আপনি বরং ডাক্তারের বাড়ী থেকে একাই ঘুরে আসুন। আমি সামনের ঐ বটগাছের আলোছায়ায় বসে এইসব গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি দেখি।

আর কাব্য রচনা করি।

সুমিত হেসে বলল, চাইকি আপনাকে একটা উপহারও দিতে পারি।

খাওয়ার শেষে শীলা গেল ডাক্তার কাশীনাথ গোবিন্দ জালমীয়ের বাড়ী।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের নামটা জানা হয়ে গিয়েছিল। সুস্মিত পরিকল্পনা মত আশ্রয় নিল অদূরে বটগাছের তলায়।

এক ভদ্রমহিলাকে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাশীনাথের স্ত্রী বিন্দ্যা কাশীনাথ জালমীর এগিয়ে এলেন। উঠোনের যেদিকে ডাক্তার জালমীরের চেম্বার সেখানে রোগীদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে।

বিন্দ্যা জালমীরের বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসির চিরস্থায়ী একটি প্রলেপ আছে।

আপনি কি ডাক্তার জালমীরের কাছে এসেছেন?

শীলা সস্মিত নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বলল, আপনার কাছেই এসেছি।

এবার বিস্ময়ের ছায়া পড়ল বিন্দ্যা জালমীরের মুখে।

শীলা কয়েকটি কথায় তার উদ্দেশ্যটি জানাতে গিয়ে বলল, আমি নিজে একজন সংগীতশিল্পী। এখানকার গ্রাম্য সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় আমি পেতে চাই। সে বিষয়ে আপনি যদি আমাকে কিছু সাহায্য করেন। অবশ্য একেবারে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি।

না না, সে রকম কিছু না।

আপনি নিশ্চয়ই ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন?

একেবারেই না। রান্নাবান্নার কাজ শেষ। এখন ডাক্তার জালমীরকে রোগী দেখার ব্যাপারে কিছু সাহায্য করছিলাম। অবশ্য ওঁর কম্পাউণ্ডার সারাক্ষণই রয়েছেন। আরে, আপনাকে এতক্ষণ উঠোনেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন, ঘরের ভেতরে বসি।

ভদ্রমহিলা শীলাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলার ওপর। সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন শোবার ঘর।

গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে শীলা একখানা চেয়ারের ওপর বসল। হঠাৎ বিন্দ্যা জালমীর নীচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই সরবত জাতীয় এক ধরনের পানীয় নিয়ে এলেন।

শীলা ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি এখুনি দুপুরের খাওয়া শেষ করেছি মিসেস জালমীর।

এ তো কোন খাবার নয়, সামান্য পানীয়।

শীলা সরবতটুকু চুমুক দিয়ে পান করল।

বিন্দ্যা জালমীর বললেন, এখন কি জানতে চান বলুন?

সেই প্রসন্ন হাসি মিসেস জালমীরের মুখে।

শীলা বলল, আপনাদের লৌকিক অনুষ্ঠানের ওপর যদি কোন গান থাকে তাহলে তাই যদি একটু গেয়ে শোনান।

বিন্তা জালমীর বললেন, যদি কথাগুলো নোট করে নিতে চান তাহলে কাগজ কলম এনে দিচ্ছি।

আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার ব্যাগেই রয়েছে।

বিন্তা জালমীর বললেন, আপনাকে এখন যে গানটি শোনাব, সে গান গাইতে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

শীলা সবিস্ময়ে বলল, সে কি!

আপনার ছেলেমেয়ে?

না, মিসেস জালমীর।

আমার একটি মেয়ে, এখন স্কুলে গেছে। যে গানটি আপনার কাছে গাইব তা গাইতে গেলে বুকখানা হু হু করে ওঠে। আগে গানটা শুনুন। এ গান বিয়ের দিনে মেয়েকে সাজাবার সময় গাইতে হয়।

'আইবা পাকড়ে লেইক যালি,
বার বরষ পোষলি, ব্যর্থ যালি;
একে দাড়িয়ে আইচে দুধ,
একে দাড়িয়ে বেকন,
বার পনিচি আইচি মায়া বিসরলি।'

শীলা অনুভব করল গানের সুরে একটা ব্যথার রেশ গুমরে গুমরে উঠেছে।

এবার ব্যাখ্যা করে দিলেন মিসেস জালমীর।

কন্যা জন্মাল বরেরই জন্য। বার বছর পালন করলাম, হায় সব বর্থ হয়ে গেল। পাল্লার একদিকে দুধ অন্যদিকে ওষুধ। বার বছরের কথা সব ভুলে গেলি!

এখানে দুধ আর ওষুধের তাৎপর্য হল, ক্ষুধার মুখে দুধ খাইয়েছি আর অসুখের সময় ওষুধ।

শীলা বলল, কথা আর সুরে এক ধরনের ব্যথা ঝরে পড়ছে। সবার ওপরে মিসেস জালমীর আপনার গলার প্রশংসা না করে পারছি না।

বিন্তা জালমীর একটু সলজ্জভাবেই বললেন, ডাক্তারও সেই কথা বলেন। উনি আমার কখানা গান টেপ করে নিয়ে গেছেন পানাজীতে।

একবার ওপরের জানালা দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে উঁকি মারলেন মিসেস জালমীর। তারপর বললেন, একটুখানি বসতে হবে ভাই, আমি এখুনি আসছি।

শীলা বলল, বড্ড অসময়ে এসে পড়েছি, আমি বরং আসি।

না না, বসুন। চেম্বারে বসলে মানুষটি নাওয়া খাওয়া একেবারে ভুলে যান। বলেন, কতদূর থেকে কত আশা নিয়ে মানুষগুলো এসেছে, তাদের ফিরিয়ে দিই কি করে।

কি আর করা যায়, জরুরী তলব দিয়ে দু'এক মিনিট ভেতরে ডেকে নিয়ে যা হোক কিছু মুখে গুঁজে দিই।

বিষ্কা জালমীর কাঠের সিঁড়িতে চরণধ্বনি তুলে নেমে গেলেন।

শীলা আধারকার শূন্য ঘরে বসে ভাবতে লাগল তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির কথা।

মায়ের বড্ড কষ্ট হয়েছিল ওকে বিদায় দিতে। বিষ্কা জালমীরের গানের ভাষাই সব মায়ের মনের ভাষা। এ গানের সুরে মায়ের বুকে অশ্রুনদী বয়ে যায়।

মায়ের কষ্টের বহিঃপ্রকাশ চিরদিনই বড় কম। তাই বিদায় দেবার সময় মা শুধু বুকে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখেছিল। চোখে জলের ধারা ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণাকে মা আশ্চর্য ক্ষমতায় চেপে রাখতে পারত।

ডক্টর আধারকার শাশুড়ীকে প্রণাম করতে গেলে মা তার হাত দুটো ধরে শুধু বলেছিল, আমি যতটুকু পেরেছি বাবা গড়ে দিয়েছি, এরপর সম্পূর্ণ করার পালা তোমার।

আধারকার বলেছিলেন, আপনি তো পূর্ণ করেই আমার হাতে তুলে দিলেন, এখন একে সযত্নে রাখা আর মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার।

আমেরিকায় ডাক্তার আধারকারের কোয়ার্টারটি ছিল বেশ মনোরম। প্রয়োজনের বেশী ঘর ছিল না ঠিক কিন্তু খোলামেলা জায়গা ছিল অনেকখানি। গাছপালা, লন আর ফুলের বাগানে ভরে উঠেছিল জায়গাটা।

নিজের দেশ থেকে নিজের রুচিমাফিক ঘর সাজানোর অনেক জিনিস নিয়ে গিয়েছিল শীলা। একেবারে ভারতীয় কায়দায় সাজিয়েছিল ঘর পর্দা, বেডকভার, ছবি, মূর্তি, পেতলের শিলমূজাটি থেকে সবকিছু।

ডক্টর আধারকার একদিন তাঁর বিদেশী বন্ধুদের পার্টি দিয়েছিলেন, তাঁরা

ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন শীলার রুচির। মহিলারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ও প্রশ্নমালায় বিব্রত করে তুলেছিল শীলাকে।

ওঁরা যখন চলে গিয়েছিলেন তখন আধারকার শীলাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, আজ তোমার জয় হল শীলা। ওরা ভারতীয় রুচির নমুনা দেখে গেল। কিন্তু আমার চোখ সেদিনই তোমার জয়ের গৌরবকে দেখবে যেদিন তুমি রুচির দিক থেকে শুধু ভারতীয় থাকবে না, আন্তর্জাতিক হবে।

কথাটা শীলার মনে ধরেছিল। সে বলেছিল, চেষ্টা করব।

রোজ গলা সাধত শীলা। ডক্টর আধারকার তাঁর কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে গেলে সে তানপুরা নিয়ে বসে যেত। কতক্ষণ কণ্ঠ সাধনা চলত তার। গুরু খোদাবক্সের মূর্তিখানা বার বার তার চোখের সামনে ফুটে উঠত। তালিম দেবার সময় যেমন কঠোর, স্নেহ দেখাতে গিয়ে তেমনি বিগলিত। এ বিষয়ে শীলার গুরুভাগ্য সত্যই ঈর্ষণীয়।

নিজের দেশে থাকতে শীলা প্রায় প্রতিটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে উপস্থিত হয়ে বড় বড গুণীর গায়কীর সঙ্গে পরিচিত হত। তার ইতিহাস বিষয়ক রিসার্চের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংগীতের নানা ঘরাণা, নানা গায়কী বিষয়ক রিসার্চ।

আমেরিকায় বসে সে সুযোগ পেত না শীলা। মাঝে মাঝে মনটা হুহু করে উঠত, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিত সে। নিজের ইচ্ছাতেই সে গ্রহণ করেছে এ জীবন। তাই কারুর ওপর দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশের উপায় ছিল না তার।

শীলা কিছুদিনের ভেতরেই ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠল। ডক্টর আধারকারের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে লাগল সে। কিন্তু ডক্টর আধারকারের সাংসারিক প্রয়োজনের দিকটা ছিল বড় সীমিত। দীর্ঘকাল একক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মিঃ আধারকার নিজের সামান্য কাজ নিজেই করে নিতেন। শীলা আসার পরে সে-ই খুঁটিনাটি সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিল। মাঝে মাঝে বাধা দিতেন ডক্টর আধারকার কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় খুশীও হতেন মনে মনে।

উইক এণ্ডে বেড়াতে যেতেন শীলাকে নিয়ে। সমুদ্রতীর, প্রপাত, বন, পর্বত কোনটাই বাদ ছিল না। ডক্টর আধারকার শিশুর মত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। হৈ হৈ করতেন, ক্ষণে ক্ষণে নতুন খাম-খেয়ালিতে মেতে উঠতেন। শীলাকে তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে পাহাড়ে উঠতে হত, ঢেউ-এর মাথায় চড়ে সমুদ্রস্নান করতে হত।

কিন্তু কাজের জগতে ফিরে আধারকার অন্য মানুষ। কথা মুখে প্রায় নেই বললেই চলে। আপন রিসার্চের দুরূহ চিন্তায় আপনি মশগুল।

শীলা আসার পরে কোয়ার্টারে ছোট্ট একটি ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিয়েছিলেন আধারকার। তাতে তাঁর কাজের অগ্রগতির সুবিধে হলেও দাম্পত্য জীবনের অলিখিত কতকগুলি আনন্দের শর্ত উপেক্ষিত হচ্ছিল।

শীলার চোখের ওপর আজও ছবির মত ভেসে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা। বাগানের ফুলে ফুলদানিটি সাজিয়ে শীলা রেখে দিয়ে এসেছে ডক্টর আধারকারের স্টাডিতে। কোন একটা বই পড়তে পড়তে তারিফের চোখে দেখছেন ডক্টর আধারকার। করিডোরে দাঁড়িয়ে তাই লক্ষ্য করছে শীলা। হঠাৎ কি হল, শীলাকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর আধারকার। মুখোমুখি হতেই থমকে থেমে দাঁড়ালেন। কি একটা বলবেন বলে এসেছিলেন কিন্তু সবকিছু হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন।

শীলা বলল, কিছু বলবে?

অসহায়ের মত শীলার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন আধারকার। বললেন, না, তেমন কিছু বলার নেই।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই কথাটা মনে পড়ে গেল। অমনি বললেন, জাপানী প্রথায় ভারী সুন্দর সাজান হয়েছে তোমার ফুলদানীটি। তবে…।

তবে কি?

তবে গাছের ডালে ডালে যখন ওরা ফুটে থাকে তখন সে শোভার কোন তুলনাই হয় না। আজ ভোরবেলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তোমার তোলা ঐ ভিক্টোরিয়া রোজটিকে দেখছিলাম, পূর্ণ প্রাণ থেকে যেন চারদিকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। ওকে হঠাৎ ফুলদানিতে দেখতে পেয়ে কেমন যেন কষ্ট লাগল।

আমি তো কখনও এমন করে ফুল নিয়ে ভাবিনি। বাগানের ফুল তুলে আর ফুলদানি সাজাব না। দরকার মত মার্কেট থেকেই নিয়ে আনব।

আমার কথায় তুমি কিছু ভাবলে?

না না, ভাবব কেন, তোমার এ ধরনের সেন্টিমেণ্টকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি।

ডক্টর আধারকার স্টাডিতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমি জানি, তুমি আমার সেন্টিমেণ্টের মূল্য দেবে।

সেদিন শীলার মনে হয়েছিল, যে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে তাজা প্রাণ-

গুলোকে ছিনিয়ে আনার জন্যে লড়াই করছে, তার বুকে একটা তাজা ফুলের মৃত্যুও যে ব্যথার ঢেউ তুলবে, এ তো স্বাভাবিক।

ডক্টর আধারকারের চরিত্রের ছোট ছোট পরিচয় শীলাকে অনেক সময় অভিভূত করে রাখত।

একদিন শীলার চোখে পড়ল ডক্টর আধারকার স্নানের ঘর থেকে স্টাডির দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। কোমরে নামমাত্র একখানা তোয়ালে জড়ানো। সর্বাঙ্গে জল ঝরছে।

শীলা কিচেন থেকে স্টাডিতে পৌছে দেখে র‍্যাক থেকে একখানা বই নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে চলেছেন ডক্টর আধারকার। তাঁর মাথার চুল থেকে ঝরে পড়া জলে ভিজে যাচ্ছে বইএর পাতা। সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই তাঁর।

সম্ভবত রিসার্চের বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন স্নানের ঘরে। হঠাৎ বইটির দরকার পড়ে যায়। তাই পরিস্থিতি আর পরিবেশ ভুলে স্টাডিতে বইটির খোঁজে ছুটে যান।

শীলা সেদিন অতি সাবধানে শুকনো একখানা তোয়ালে দিয়ে অনেক যত্নে ডক্টর আধারকারের চুল থেকে জলের ধারা মুছে নিয়েছিল।

আজ বিদ্যা জালমীরের সংসার জীবনের ছবি দেকে শীলার মনে পড়ে গেল আত্মভোলা, কাজ পাগল ডক্টর আধারকারের কথা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন মিসেস জালমীর। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন— বড় দেরী হয়ে গেল ভাই, ওঁকে একমুঠো খাইয়ে এলাম।

না না, আমি দিব্যি ছিলাম। অসুবিধে বরং আমিই ঘটিয়েছি।

কিছু না, কিছু না। উনি তো রোগী ফেলে খেতেই চান না। বলেন, অসুস্থ মানুষগুলো এসে লাইন দিয়েছে, আমি কি করে খেতে যাই বল।

আমি জোর করে ওঁকে ধরে এনে খাওয়াই। বলি, তুমি বাঁচলে তবে তো তোমার রোগী বাঁচবে। আচ্ছা ভাই, আমরা যে আলোচনায় বসেছিলাম, এখন তাই আবার শুরু করা যাক।

কত গান গেয়ে গেলেন বিদ্যা জালমীর। নোট নিয়ে গেল শীলা আধারকার দ্রুত হাতে। বর্ষা আবাহন, ফসল তোলা, লৌকিক প্রেম-কাহিনী, আরও কত বিষয়ের গান। শেষে বিদ্যা জালমীর বললেন, যে গান দিয়ে প্রথমে শুরু করেছিলাম, তেমনি একখানা গান দিয়ে শেষ করছি। এটি কন্যা-বিদায়ের গান।

রুমড়াচা সানিত আনি

ভাওরা চা ঘড়িত,

তুকা ইতলানো আই বাপা চো
যাচ পড়িন।
ইয়া ঘরচি লেক যাতা পর ঘরা,
পরঘরা যাতা না কায় মক্ষী
রাজ করুন'আনন্দন যাইসি।

কুমড়া গাছের ফুল ঝরে গেল (মেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল)। সোনার ঘড়ির সময় এখন (আনন্দের সময় এখন)। মা বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ। এখন অন্য ঘরে যাও। সেখানে সংসার কর সুখে।

বিন্তা জালমীরকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না শীলার তবু আসতে হল। উঠোন পেরিয়ে আসতে আসতে শীলা অনুভব করছিল, শান্তির একটা হাওয়া ডক্টর জালমীরের সারা সংসার ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা এবার এল মন্দির দর্শনে। মঙ্গেশ, মহালসা, রামনাথ, শান্তা দুর্গা। শান্তির দেবী শান্তা দুর্গা। গর্ভগৃহে ঝোলান রয়েছে সারি সারি ঝাড়লণ্ঠন। রামনাথ মন্দিরে লক্ষ্মী নারায়ণ আর রামের মূর্তি। আধুনিক স্থাপত্যের চিহ্ন এই মন্দিরের সর্বত্র। মহালসা মন্দিরে দেবী নারায়ণীর অধিষ্ঠান। কালো পাথরে তৈরী মূর্তি। ভেতরে নাটমণ্ডপের দুধারে অনেকগুলি শতদীপা পিলসুজ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দোতলার ছাদ সমান উঁচু দীপাধার।

মঙ্গেশ মন্দিরের দীপাধারটি সত্যিই দর্শনীয়। চার পাঁচতলা উঁচু পেতলের অপূর্ব দীপস্তম্ভটি প্রবেশ পথের সামনেই বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বিগ্রহ শিব। মন্দিরকে কেন্দ্র করে মঙ্গেশ গ্রাম। সংগীতের সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকার এই গ্রামেরই কন্যা। বছরে একটি দিন দেবতার চরণে তিনি নিবেদন করেন সংগীতের ডালি।

পূজার ফুল নৈবেদ্য নিয়ে শীলা ঢুকল মন্দিরের ভেতর। সুমিত দীপস্তম্ভের ছবি নিল। সে এবার শীলার খোঁজে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করল। ঐ তো শীলা বসে রয়েছে। একেবারে স্থির পূজারিণী মূর্তি। শিবের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে শীলা আধারকার। দুটি হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত।

সুমিতের মনে হল, এই নারীর ভেতর কল্যাণী গৃহবধূর পবিত্রতা বিরাজ করছে। আধুনিক জীবনকে ও প্রয়োজন মত গ্রহণ করেছে কিন্তু আধুনিক জীবনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ওকে গ্রাস করতে পারেনি।

সেই মুহূর্তে একটি সত্য সুমিতের মনে উদিত হল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর গৃহে একটি কল্যাণী বধূ পুরুষের জীবনে অপরিহার্য।

মহেশ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শীলা আধারকার দাঁড়াল দীপস্তম্ভের কাছে। চোখ দুটি বন্ধ করতেই তার মনে হল, অনন্ত অন্ধকারের বুকে প্রাণের এক একটি প্রদীপকে কে যেন জ্বালিয়ে চলেছে। বাতাসে দু'একটি নিভে যাচ্ছে, আবার তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে কেউ। এমনি একটির পর একটি জ্বলতে জ্বলতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল সমস্ত দীপস্তম্ভটি।

গাড়ী এসে থামল কোলভা বীচে রূপালী বালির সৈকত কোলভা। অদূরে সবুজ নারকেল বীথি। কিছুদূরে সবুজ পোশাক পরে পাহাড় নেমেছে সমুদ্রস্নানে। সারি সারি নৌকো ভেসে আছে সমুদ্রের অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে। নৌকোর ভেতর শেষ বেলায় তেমন কোন কর্মচঞ্চলতা নেই। এইমাত্র একখানা নৌকো সাগর ঢুঁড়ে কিছু মানিক নিয়ে এল। অমনি নারকেল বীথির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল মেয়ে। জেলেরা জাল ঝেড়ে রূপোলী মাছ বের করে বালির ওপর ঢেলে দিল। ওরা রঙীন শাড়ী ঘুরিয়ে মাছের চারদিকে গোল হয়ে বসে মাছ বাছতে লেগে গেল।

সুমিত ভাবল, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সে তার ক্যামেরায় ধরে রাখল রঙবাহারী শাড়ী পরা মেছুনিদের ছবি।

ফটো তোলা শেষ হলে সে তাকিয়ে দেখল, শীলা কোথাও নেই। কি আশ্চর্য! এক মিনিটে মেয়েটি উবে গেল নাকি!

সামনে সাজপোশাক খোলা কতকগুলো নৌকো রূপোলী বালির বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল। নিকষ কালো গায়ে কোলতারের লাবণ্য। প্রতিটি নৌকোর পাশে শুয়ে আছে তার ছায়া-সঙ্গিনী।

কিন্তু শীলা কোথায়? ঐ দূরে যে সারি সারি নৌকো তীর ছুঁয়ে সমুদ্রের জলে ভেসে আছে, সেখানে পৌছতে গেলেও তো সময় চাই।

গভীর জলের থেকে হুস্ করে ভেসে ওঠার মত সামনের একটা নৌকোর আড়াল থেকে মাথা তুলল শীলা। তারপর এঁকেবেঁকে এক একটা নৌকো পেরুতে পেরুতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। শেষ নৌকোখানার আড়াল থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ান মাত্রই একঝাঁক সী-গাল শব্দ তুলে লম্বা ডানা হাওয়ায় ভাসিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে উড়ল। সূর্যের শেষ সোনায় ওদের সাদা বুক আর পাখা উজ্জল হয়ে উঠল।

ক্লীক, ক্লীক, ক্লীক। দারুণ কয়েকটা শর্ট নিল শীলা।

সুমিত এতক্ষণ দেখছিল শীলাকে। তার মনে হচ্ছিল তারই মনের আঁকাবাঁকা অলিগলিতে শীলা নামের একটি মেয়ে চুপি চুপি পা ফেলে চলেছে। হঠাৎ সী-গালগুলো সূর্যের সোনা মেখে আকাশে ডানা মেলে দিতেই তার মুখখানাও উজ্জল হয়ে উঠল। আশার পাখিগুলো এমনি করেই কি ঝকঝকে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। শীলা কি পারবে সুমিতের ভাবনার পাখি-গুলোকে তার মনের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতে ?

গাড়ী ছুটে চলেছে মার্মাগোয়া লক্ষ্য করে। ভারতের সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক সমুদ্রবন্দর এটি। কেবল বড় নয়, সৌন্দর্যেও তুলনারহিত। ড্রাইভার ছেলেটি বলেছে, সূর্যাস্ত যদি দেখতে চান মার্মাগোয়া চলুন। ওখানে চৌগুলেদের জাহাজ মেরামতের বিশাল ইয়ার্ড আর অফিস আছে। পাঁচটার পরে অফিস বন্ধ হয়ে যাবে, গেটও বন্ধ। ওখানকার কেয়ারটেকার আমার পরিচিত। গেট খুলে অফিস কম্পাউণ্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে নারকেল গাছের ফাঁকে সূর্যাস্ত দেখা জীবনের এক বিরল অভিজ্ঞতা।

এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারান যায় না। গাড়ী ছুটে চলল ঈপ্সিত সূর্যাস্তকে লক্ষ্য রেখে।

ডানদিকে বসেছে সুমিত, বাঁয়ে শীলা। সাইড গ্লাস নামিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে শীলা আধারকার। ভাবনার গভীরে ডুবে আছে সে। সুমিতও ভাবছে। আজ তাদের গোয়াবাসের শেষ রাত্রি। পরদিন শীলা কর্মস্থলে চলে যাবে প্লেনে। আর সে, দুদিনের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে করতে রাতের বাস ধরে চলে যাবে বম্বে। আনন্দের রোশনাই হৃদয়ের আকাশে কয়েক মুহূর্ত আলোর ফুল ছড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শীলা আধারকার পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল। সুদূর পশ্চিমে, আমেরিকা নামে একটি মহাদেশ। তারই এক অতি ক্ষুদ্র কোণে ডক্টর আধারকার নামে এক বিজ্ঞানীর কোয়ার্টার। তিনি দুরারোগ্য একটি ব্যাধি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী শীলা সামনে এসে দাঁড়াল।

এ উইক এণ্ডে আমাদের বেড়াতে যাবার প্ল্যান তো এখনও করলে না ?

ডক্টর আধারকার হাতের বইখানা টেবিলে রেখে বললেন, এ শনিবার আমাকে রিসার্চের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হবে শীলা। তুমি বরং মিঃ আর মিসেস লরেন্সের সঙ্গে ওদের খামারবাড়ীতে কাটিয়ে এস। তোমাকে পেলে ঐ প্রবীণ দম্পতি খুবই খুশী হবেন।

নরেন্সরা দীর্ঘকাল ডক্টর আধারকারের প্রতিবেশী। তাঁরা সজ্জনও। তবু ডক্টর আধারকারের প্রস্তাবে এই প্রথম আহত হল শীলা। একটা সপ্তাহে কোথাও যেতে না পারার জন্য ক্ষোভ নয়। ডক্টর আধারকারের মত মানুষের রিসার্চের কাজে আটকে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনাও নয়। কিন্তু প্রবীণ এক দম্পতির সঙ্গে উইক এণ্ড কাটাবার প্রস্তাবেই যত আপত্তি শীলার। একটি বয়স্ক মানুষকে শ্রদ্ধা জানান এক কথা আর তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতি-বাহিত করা ভিন্ন কথা। এই বোধটুকু ডক্টর আধারকারের নেই, এটাতেই দুঃখ পেল শীলা। এই প্রথম ডক্টর আধারকারের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করল সে।

উইক এণ্ডে কোথাও না যেতে পেলে আমি খুব মুষড়ে পড়ব, এমন একটা ধারণা তোমার না থাকাই ভাল।

ডক্টর আধারকার বুঝলেন, সরল বুদ্ধিতে তিনি সমাধানের যে সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তা ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর অসহায়ভাবে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মানুষটির এই অসহায়ত্ব শীলার সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনে আঘাত হানল। সে জানে, ঘোরতর সংসারী মানুষ অন্যভাবে ঘুরিয়ে কথাটা বলত। কিন্তু এ মানুষের কাছ থেকে সে কৌশল আশা করা যায় না। শীলা জানে এই সরলতাটুকুই ডক্টর আধারকারের সম্পদ।

শীলা এবার গলার স্বর কোমল করে বলল, তুমি একা থাকবে কাজ নিয়ে আর আমি ওঁদের খামারবাড়ীতে গিয়ে আনন্দ করব, এ আমি পারব না। বরং তোমার কাছে থাকতে আমার ভালই লাগবে।

শনিবার রাতে ল্যাবরেটারি থেকে ফিরলেন ডক্টর আধারকার। ঘরে ঢুকলেন ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে। শীলা ঘরে ছিল না। তিনি বাথরুমে ঢুকে দেখলেন শীলা সব কিছুই গুছিয়ে রেখে গেছে। স্নান সেরে বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন, কিচেনে রাতের খাবার রেডি। ডক্টর আধারকার ড্রইং রুমে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওন্টাতে লাগলেন অলসভাবে। হয়ত বাইরে কোথাও গেছে, এখুনি এসে পড়বে শীলা।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে শীলা ঘরে ঢুকল। ব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে এক পাঁজা রেকর্ড।

ও, তুমি এসে গেছ। কতক্ষণ? কিছু খাওয়া হয়নি তো?

ডক্টর আধারকার বললেন, স্নান সেরে দেখলাম, কিচেনে ডিনার রেডি। ম্যাগাজিন ওন্টাতে ওন্টাতে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

আমি এখুনি টেবিলে ডিনার সার্ভ করে দেব, তুমি ডাইনিং রুমে চলে এসো।

তুজনে খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। ডক্টর আধারকার বললেন, কি সব বাজার করে আনলে?

ও কয়েকখানা রেকর্ড।

কাদের রেকর্ড?

বিতোভেনের প্যাথেটিক সোনাটা, প্যাস্টোরাল। মোজার্টের একটা পিয়ানো বাদন। ইহুদী মেন্নুহীন আর রবিশঙ্করের ডুয়েট।

দারুণ দারুণ সব ব্যাপার বল।

তোমার তো শোনার সময়ই হয় না।

আমার তুর্ভাগ্য শীলা। একদিন একটি নিগ্রো ছেলে এসে বলেছিল, আমি গান গাইতাম, এখন আমার গলা থেকে গান হারিয়ে গেছে। তোমরা এত রিসার্চ করছ, পার না আমার গলার স্বরটাকে ফিরিয়ে দিতে?

কি প্রাণবন্ত তরুণ, নামী একটা হোটেলে সংগীত পরিবেশন করত। বেচারার চাকরীটা গেছে। প্রাণটুকু ঝুলছে একটা ক্ষীণ সুতোর বাঁধনে। সেই থেকে সঙ্গীত কানে এলেই আমি কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ি।

শীলা তুঃখ প্রকাশ করে বলল, আমার মন্তব্যের জন্য আমি সত্যিই তুঃখিত।

না না, আমি কিছুই মনে করিনি। ক্যানসারে ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হল বলে কি পৃথিবী থেকে গান হারিয়ে যাবে!

শীলা ছেলেটির প্রসঙ্গে মনে মনে খুবই ব্যথিত হয়েছিল। সে কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, তোমার কথা মত আমি এখন আন্তর্জাতিক হবার চেষ্টা করছি।

কি রকম?

দিশী বিদেশী সবরকম স্বরস্রষ্টা ও সংগীতবিদের সম্বন্ধে পড়াশোনা করছি।

খুব ভাল। মিউজিক লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে যাও।

অনেক আগেই হয়ে গেছি। এখন আমি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সংগীতের তুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ভেতর অন্তর্নিহিত মিলটুকু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

তুমি নিশ্চিত সফল হবে শীলা।

কি করে বুঝলে?

কাজের ভেতর তোমার নিষ্ঠা দেখে।

তুমিও তো গভীর নিষ্ঠায় তোমার কাজ করে চলেছ, নিশ্চয়ই একদিন সফল হবে। আর সেদিন সারা দুনিয়া তোমার জয়ধ্বনি দেবে।

আমি প্রশংসা চাইনা শীলা। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের মুখে প্রাণের হাসি ফোটাতে পারলেই সার্থক হবে আমার সাধনা।

এবার গুরু কথাগুলোকে লঘু করে দিয়ে ডক্টর আধারকার বললেন, তুমি আর একটি বিষয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছ শীলা।

যেমন ?

রান্নার ব্যাপারে। এমন চাইনিজ, মোগলাই, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ ডিসের সমন্বয় আমি বড় একটা দেখিনি।

শীলা হেসে বলল, ডক্টর আধারকারের স্ত্রী ওটাতেই আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে বসে আছেন।

কিছুদিন ধরে আধারকারের পরিবারে জীবনযাত্রার ব্যাপারে ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি চলছিল।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল ডক্টর আধারকারের। যখন আধারকার একক জীবন জাপন করতেন তখন বালাই ছিল না ওসব অনুষ্ঠানের। বিয়ের পর এ অনুষ্ঠান চালু করল। সে ডাকতে চেয়েছিল আধারকারের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে। বাধা দিলেন ডক্টর আধারকার। বললেন, ছোটদের আর জগতবিখ্যাতদের জন্মদিন পালন করা যেতে পারে, আমি ওদের কারু দলেই পড়ি না।

শীলা বলল, তুমি আমার চোখে অনেক বড় বিখ্যাতদের একজন।

বেশ, তাহলে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তুমি থাকবে আর অমি থাকব। আর তৃতীয় কেউ থাকবে না।

শীলা শেষ তাই মেনে নিয়েছিল। সে ঘর সাজিয়েছিল নিজের হাতে। একশাট নতুন পোশাক তৈরি করিয়ে রেখেছিল। উইক এণ্ডে বেড়াতে গিয়ে ডক্টর আধারকারের একটি সুন্দর ছবি তুলেছিল সে। সেটিকে এনলার্জ করিয়ে চমৎকার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিল সারপ্রাইজ দেবে বলে। রান্নার পদগুলোও করেছিল ডক্টর আধারকারের রুচি মাফিক। চারখানা শিলেক্টেড রেকর্ডের ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন খাঁ, মেনুহীন, বড়ে গুলাম আলী খাঁ, শুভলক্ষ্মী।

ডক্টর আধারকার রাত নটাতে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, আমাকে জরুরী কনফারেন্সে শিকাগো যেতে হবে আজ রাতের ফ্লাইটে। ডক্টর বার্ণার্ড আসছেন। তিনি পেপার পড়বেন। যদিও আমার রিসার্চের সঙ্গে তাঁর পেপারের যোগ নেই তবু আমার কিছু প্রশ্ন আছে। সেগুলোর সঠিক উত্তর আমার রিসার্চের কাজে সহায়ক হবে বলে মনে করি। ওঁর আসার খবরটা বড় দেরীতে পেলাম, তাই।

শীলা একটিও কথা বলল না। নীরবে সব কিছু গোছগাছ করে দিয়ে শুধু বলল, খাবার সময় হবে?

ডক্টর আধারকার বললেন, প্লেনেই খেয়ে নেব।

আর একবার এমনি এক ঘটনা ঘটল। ইউরোপ টুরের সব ব্যবস্থা পাকা। কদিন শীলা দর্শনীয় স্থানগুলোর ভূগোল, ইতিহাস নিয়ে বেশ উত্তেজনার ভেতর সময় কাটাচ্ছিল, এমন সময় একটা ট্রাঙ্ককলে সব তছনছ হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়া থেকে জুলজির এক অধ্যাপক বন্ধু আসছেন, তিনি আধারকারের সঙ্গে রিসার্চের বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে চান। ঐ বন্ধুটিও ক্যানসার রিসার্চের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়েছেন।

মুহূর্তে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ডক্টর আধারকার শীলাকে একান্তে টেনে নিয়ে বললেন, যদি আমার বন্ধু এখানে একটা ফর্টনাইট কাটান তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে শীলা? বিয়ের আগেও আমার এখানে এসেই উঠত।

শীলা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, তার কোন অসুবিধে হবে না।

মহাখুশীতে শীলাকে জড়িয়ে ধরে সেদিন ডক্টর আধারকার বলেছিলেন, আমি জানতাম, তুমি আমার কথা রাখবে।

শীলা সেদিন ডক্টর আধারকারের সামনে মৃদু হেসেছিল কিন্তু একান্তে গিয়ে ভেসেছিল চোখের জলে। না ইউরোপ ভ্রমণে যেতে পারেনি বলে নয়, না যেতে পারার জন্ত স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য সান্ত্বনাটুকু পেল না বলে।

মাঝে মাঝে ডক্টর আধারকারকে তার বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হত। নিজের মন ছাড়া শীলা আধারকারেরও যে মন বলে একটা কিছু থাকতে পারে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতনতার পরিচয় ছিল না ডক্টর আধারকারের আচরণে।

শীলা মনে মনে বড় অস্থির হয়ে উঠত। ডক্টর আধারকারকে সে যদি মুখোমুখি বিতর্কের মাঝখানে টেনে আনতে পারত তাহলে হয়তো মনের ভার কিছুটা লাঘব হত তার। কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষটি যে তার সব

স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে বিশ্বজনের সেবায়। তাকে তুচ্ছ পারিবারিক বিতর্কে টেনে এনে লাভ কি। তাছাড়া মানুষটি সাংসারিক তর্কবিতর্কে একেবারেই অপটু। এ বিষয়ে যুদ্ধের আগেই বসে থাকেন পরাজয় বরণ করে।

এই পরিস্থিতিতে শীলা নিজেকে বেশী করে ঢেলে দিতে চাইল নিজের সাধনায়। সে পাগলের মত রাত্রিদিন রেয়াজ করে চলল। কিন্তু 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'। সেই দোসরটি কোথায়, যে তার গানের সঠিক জায়গায় বাহবা দিয়ে উঠবে।

ডক্টর আধারকারের কাছ থেকে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন আগে শীলাকে আর একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল। বলা যায়, এই সামান্য ঘটনাই ত্বরান্বিত করল তার দেশে প্রত্যাবর্তন।

ইন্দো আমেরিকান ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির উদ্যোগে রবিশঙ্কর আর ইহুদী মেনুহীনের সেতার ও বেহালার যুগল-বন্দীর ব্যবস্থা হয়েছিল। মোটা অঙ্কের দুখানা টিকিট কেটেছিল শীলা। কদিন ধরে ঐ আলোচনাই হচ্ছিল। উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল শীলার মন।

ঠিক যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন ডক্টর আধারকারের ল্যাবরেটারি থেকে ফোন এল—তুমি অনুষ্ঠানে চলে যাও শীলা, আমার আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কারণটা পরে জানবে।

শীলা একাই যেতে পারত কিন্তু ইচ্ছে করেই যায়নি। অনেক রাতে সেদিন ফিরেছিলেন ডক্টর আধারকার। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলেন তবু অপরাধীর একটুকরো হাসি লেগেছিল মুখে।

খাওয়া দাওয়া চুকলে প্রতিদিনের অভ্যেস মত দুজনে কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে বসল ড্রইং রুমে। শীলা নিজের মনের ক্ষোভকে চেপে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

ডক্টর আধারকার পকেট থেকে ছোট্ট একটি চিঠি বের করে শীলার দিকে এগিয়ে দিলেন।

শীলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল।

প্রিয় ডক্টর আধারকার,

হাসপাতালে সকলের মুখে শুনেছি তোমার নাম। তুমি নাকি ক্যানসার বিজয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছ। আমি আঠারো বছর বয়সেই এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েছি। আমি ডেভিডকে ভালবাসি। সে প্রতিদিন বহুদূর থেকে আমাকে দেখতে আসে। হাতে হাত রেখে কতক্ষণ

চুপচাপ বসে থাকে। চলে যাবাব সময় বলে, আবার আসবো। আমি জানি, এমন আসা যাওয়া করতে করতে একদিন এসে দেখবে, বিছানা শূন্য, রোগী নেই। ও সেদিন বড় আঘাত পাবে ডক্টর আধারকার।

আচ্ছা তুমি কি পার না তোমার রিসার্চের কাজকে একটু ত্বরান্বিত করতে? আমার যে ডেভিডেব জন্য বেঁচে থাকার বড দবকার।

মৃত্যুপথযাত্রিণী

'সারা'

শীলা চিঠিখানা পডে দুঃখ পেল। কিন্তু এর প্রতিকারে কিই বা সে কবতে পাবে। তাই চুপচাপ বসে বইল।

ডক্টর আধারকার এবার অন্য একটি প্রসঙ্গেব অবতা বণা কবলেন।

আজ তুমি অনুষ্ঠানে কেন যাওনি শীলা?

কি কবে জানলে তুমি?

আমি অনুষ্ঠান শেষ হবার সময হলের সামনে দাঁডিয়েছিলাম। তোমাকে দেখতে পাইনি।

একা যেতে আমার ভাল লাগেনি, তাই যাইনি।

এবাব অত্যন্ত কোমল গলায় ডক্টব আধাবকার বললেন, শীলা, আমি জানি কত বড অবিচার আমি তোমাব উপব করে যাচ্ছি। স্ত্রীব যথাযোগ্য মর্যাদা তুমি আমার কাছ থেকে পাওনি। তোমাব দিনরাত্রিব নিঃসঙ্গতাকে ভবিয়ে দেব, এমন ক্ষমতা আমাব নেই। মনে হয় তোমাকে আমার ঘবে এনে আমি একটি প্রাণসম্পদে ভরপুর নারীর প্রতি অবহেলা করেছি।

একটু থামলেন ডক্টর আধারকার। শীলা কোন মন্তব্য করল না, মেঝেব লতাপাতা আঁকা কার্পেটের দিকে চেয়ে বসে রইল।

এবার আধারকাব আরও গাঢস্বরে বললেন, শীলা মানুষই ভুল করে আবাব সে ভুল সংশোধনের ভার সেই তুলে নেয়। আমি তোমাকে বিবাহিত জীবনে অনেক ছোট বড সুখ থেকে বঞ্চিত করেছি, এ সত্য আমি নিজের কাছে অস্বীকার করতে পাবব না। তাই আজ তোমার কাছেই একটা সমাধানের প্রস্তাব রাখছি। এই মুহূর্তে আমার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। তুমি দুদিন এ নিয়ে তোমার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া কর, তারপর স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে আমাকে তোমার মতামত জানিও।

শীলা এবার মেঝের কার্পেটের থেকে মুখ তুলে ডক্টর আধারকারের দিকে তাকাল। কি প্রস্তাব ডক্টর আধারকার তার কাছে রাখতে চায়।

প্রস্তাব রাখলেন আধারকার। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে যোগ দাও তোমার কলেজের কাজে। আবার শুরু কর গুরু খোদাবক্সের কাছে তোমার সংগীত সাধনা। যখন প্রথম তোমার মুখোমুখি হই তখন আমি আমার স্বার্থের দিকটাই দেখেছিলাম। আমার ছন্নছাড়া সংসারটাকে তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে তুলবে এই ছিল আমার গোপন মনের ইচ্ছে। সেদিন জানতাম না কত বড় সম্পদ তোমার ভেতর লুকোনো আছে। দিনের পর দিন সেগুলো পরিচর্যার অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে তোমার চারিদিকে একটুখানি অনুকূল হাওয়া কোথাও নেই। তাই ভাবলাম আর নয়, তোমার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে আমি আর দাঁড়াব না।

আমার দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাব আছে। যদি কোন সহৃদয় যুবক তোমাকে নিয়ে নতুন করে সংসার রচনা করতে চায় তাহলে তোমাদের মিলিত জীবনের প্রতি থাকবে আমার পুর্ণ সমর্থন। সেক্ষেত্রে আইনসংগত স্বীকৃতি পেতে কোন অসুবিধেই হবে না তোমার।

এরপর আমার শেষ প্রস্তাব হল, তুমি আমার মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছ শীলা। যে রকম জীবনই তুমি দেশে যাপন কর না কেন, যেদিন তোমার মনে হবে এ মানুষটার কথা, অথবা তোমার সাজান এই ঘরের কথা, সেদিন মনে কোন দ্বিধা না রেখে চলে এসো এ সংসারে। অগোছাল সংসারটাকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তোলার কোন বাধা থাকবে না তোমার।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বাক্যহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে রইলেন ডক্টর আধারকার। হাতের পাতায় মুখ ঢেকে পাথরের প্রতিমার মত স্থির হয়ে রইল শীলা।

মার্মাগোয়ায় চৌগুলেদের অফিস কম্পাউণ্ডে এসে ব্রেক কষল। ড্রাইভার ছুটে গিয়ে লোহার গেট খোলার ব্যবস্থা করে দিলে। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে শীলার ভাবনায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। সুমিত বলল, তাড়াতাড়ি চলুন প্রফেসার আধারকার, সূর্য সমুদ্রের বুকে বড় দ্রুত নেমে আসছে।

ওরা দৌড়ে অফিসের পেছনে একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড়াল। ওপরে টিলার গায়ে হেলান দিয়ে অফিস। নীচে খাড়াই খাদ সমুদ্রের জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ান। তাদেরই ভেতর থেকে বাঁকা কটি নারকেল গাছ সমুদ্রের দিকে দেহ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম সাগরের হাওয়া মাথার জটিল জটায় লেগে সারা শরীর

ভুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য এখন রক্তবর্ণ। নারকেল গাছের ফাঁকে সে প্রস্তুত হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার জন্যে।

কি উত্তাল, কি নীলাভ অশান্ত সমুদ্র। নীচের বোল্ডারগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে আহত দানবের মত আর্তনাদ করছে।

আকাশে লালের বর্ণচ্ছটা। সমুদ্রের নীল শিরা ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত। বহু দূরে উত্তাল ঢেউ-এর চূড়াগুলো লোহিত নাগের মত এগিয়ে আসছে ফণা তুলে।

সুমিত আকাশ আর সমুদ্রের সেই অশান্ত মিলন-লীলাকে কয়েকটি সটে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। শীলা কিন্তু অচঞ্চল। অপলকে সে চেয়ে রইল সীমারেখাহীন আরব সাগরের দিকে।

সূর্য ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই মারণযজ্ঞে। দুটো চোখ কেন জানি না হাতের পাতায় বন্ধ করে ফেলল শীলা আধারকার। হঠাৎ তার হাতখানা ধরে সুমিত বলল, কি হল শীলা?

শীলা চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, এত বড় সূর্যের এই আত্মনাশ আমি সইতে পারছিলাম না সুমিত।

এই মুহূর্তে অনিবার্য এক একাত্মতায় দুজনে দুজনকার নাম ধরে ডাকছিল।

সুমিত বলল, পেছনে. চেয়ে দেখ শীলা, কি আশ্চর্য চন্দ্রোদয়।

পূর্ণিমার চাঁদ একটি গাছের ডাল আর ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে অপরূপ মহিমায় আটকে ছিল।

শীলা বলল, কোন কিছু হারায় না, তাই না সুমিত? ঐ চাঁদের ভেতর দিয়েই তো বিলীন হয়ে যাওয়া সূর্য বলছে, আমি হারাইনি, কখনও হারাই না।

ঐ গাছটার দিকে শীলার হাত ধরে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে যেতে সুমিত বলল, শীলা এই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত জীবনে বার বার ফিরে ফিরে আসে না। আজ এই দুর্লভ ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে, মাত্র কয়েকটা বছর আগে এমনি চন্দ্রোদয় লগ্নে কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল না।

চাপা একটা উত্তেজনায় সুমিতের গলা কাঁপছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইছিল আর একটা গলার প্রতিধ্বনি।

এখন শীলা শান্ত, নিস্তরঙ্গ। সে সুমিতের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করে বলল, এসো সুমিত আমরা ঐ মসৃণ পাথরটার ওপর বসি।

দুজনে গাছের তলায় চাঁদের স্ফটিক জলে ধোয়া পাথরখানার ওপর বসল।

কয়েক মুহূর্ত কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে। এবারও শীলাই কথা বলল প্রথমে,— আমরা এখন পরস্পরের সব চেয়ে বড় বন্ধু সুমিত।

সুমিত হাত বাড়িয়ে শীলার হাতখানা ধরে তার কথার সমর্থন জানাল।

আমার একটা অতীত আছে সুমিত, সেই অতীতটা তোমার সামনে মেলে ধরতে চাই।

সুমিত বলল, আমাদের অতীত এই মুহূর্তে জীবনের পাতা থেকে ধুয়ে মুছে যাক্ শীলা।

না সুমিত, আমার অতীত মুছে যাবার নয়। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে শোন আমার অতীতের কথা।

সুমিত চেয়ে রইল শীলার মুখের দিকে। শীলা একে একে বলে চলল তার বিবাহিত জীবনের কাহিনী।

আমাকে ডক্টর আধারকার তার প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য দুটো দিন সময় দিয়েছিল। আমি কিন্তু সেই দুদিন কিছুই ভাবতে পারিনি।

এক সময় ডক্টর আধারকার আমাকে ডেকে বলল, কিছু স্থির করলে শীলা।

আমি প্রথমে কিছু না বলে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপর ওর দিকে চেয়ে বললাম, আমি কিছু ভাবতে পারছি না, তুমি বলে দাও আমি কি করব ?

ডক্টর আধারকার আমাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, সমস্যাকে খুব সহজভাবে নিতে হয় শীলা। আমার অভিমত যদি জানতে চাও তাহলে বলি, কিছুকাল দেশে চলে যাও তুমি। সেখানে থাকতে থাকতে তোমার মনের কাছ থেকেই সত্য উত্তরটি পেয়ে যাবে।

সুমিত কি ভেবে বলে উঠল, ঠিকই বলেছেন ডক্টর আধারকার।

শীলা বলল, আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি সুমিত। আজই এই চন্দ্রস্নাত আরব সাগরের তীরে।

সুমিতের সমস্ত সত্তা এখন উন্মুখ উত্তরটি শোনার জন্য। সে নিষ্পলক চেয়ে রইল শীলার মুখের দিকে।

শীলা শান্ত আর গভীর গলায় বলল, আমাকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে সুমিত। যে মানুষ সবার মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে, নিজের সুখের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি, তাকে আমি না দেখলে কে দেখবে সুমিত। আমার আনন্দ, আমার সুখ আমি তারই সেবায় উৎসর্গ করে দিতে চাই।

এক বিচিত্র অনুভূতি সুমিতের কণ্ঠকে সেই মুহূর্তে রুদ্ধ করে দিল। এক-সময় নিজেকে সংযত করে নিয়ে সুমিত বলল, শীলা, বন্ধু হিসেবে তোমার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত না জানিয়ে পারছি না। কোহিনূর সম্রাজ্ঞীর মুকুটেই মানায়।

বন্ধুর দিকে পরম বিশ্বাসে হাতখানা প্রসারিত করে দিল শীলা। সে হাত গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগে স্পর্শ করল সুমিত।

আয়না

দুদিকে দুটো থাম। মাথায় লোহার আর্ক। তার মাঝখানে বাতি দেবার জন্যে লোহার ফ্রেমের কাজ। সব ঠিক তেমনি আছে শুধু অনেককাল মেরামতের অভাবে চুনবালির কাজ জায়গায় জায়গায় খসে খসে গেছে।

কৈলাশ সুটকেশ আর ব্যাগ নিয়ে মাথা নীচু করে আগে আগে চলল। তাকে খবর না দিয়ে যে মালিক এমন করে এসে যাবে সে ভাবতেই পারেনি। প্রায় দু'যুগ পার করে বসুভিলায় এল সুবর্ণা। শেষ যখন এসেছিল তখন সে অষ্টাদশী তরুণী। তখন ঠাকুরমার খাস চাকর কৈলাস প্রৌঢ়। ঠাকুরমা তার বিয়ে দিয়ে পেছনের বাগানের এক কোণে একটি চালাঘর তুলে দিয়ে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কৈলাসের বউ কাজ করত ঠাকুমার কাছে। ওরা দুজনেই দু'বেলা পাত পাতত ঠাকুমার নিরামিষ রান্নাঘরে। সেবার সন্ত মা মারা যাবার পর বাবার সঙ্গে এই নিভৃতে খামার-বাড়িতে এসেছিল সুবর্ণা। ঠাকুরমার কাছে মাসখানেক শান্তিতে বিশ্রাম করতে এসেছিলেন বাবা।

এ খামারবাড়ি ঠাকুরদা উইল করে দিয়ে যান ঠাকুরমাকে। সামনে সুবর্ণরেখা। দিগন্তে শালবন আর পাহাড়। পেছনে চাষের জমি। আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। পথের ধারে কয়েকটা ছোট বড় শালের গাছ। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল একটি বড় পুষ্করিণী। তাতে শান-বাঁধানো ঘাট আর একটা ছোট্ট নৌকো ছিল। পুষ্করিণীর ওপারে ছিল শরবন। শরৎকালে ঝাঁক ঝাঁক বালুহাঁস উড়ে এসে বসত।

বসুভিলায় ঢুকতে গিয়ে পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল সুবর্ণার। আজ এখানে আত্মীয় বলতে কেউ নেই তার। ঠাকুরমা বাবা সবাই গত হয়েছেন। মারা যাবার আগে বাবা শুধু বলেছিলেন, সুবু, তোর ঠাকুমার বড় সাধের বসুভিলাটা যেন কোনদিন বিক্রি করে দিস না মা।

বাবা মারা যাবার পর বহু বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব এসে পড়েছিল তার ওপর। অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছিল সে সব ঝঞ্ঝাট। কোন বিজনেস

বিক্রি করে দিয়েছিল, কোন শেয়ার হস্তান্তরিত করেছিল। এখানে ওখানে ছড়ানো বাড়ি জমি বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাবা আর ঠাকুরমার কথা ভেবে বিক্রি করতে পারেনি এই বসুভিলার সম্পত্তিটা। এখানে আসতে অবশ্য পারেনি বহুদিন। গোমস্তা আর কৈলাসই দেখাশোনা করছে বসুভিলার সম্পত্তি।

শহরের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কাজ করে সুবর্ণা। অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও নিঃসঙ্গতা দূর করার প্রয়োজন ছিল তার। তাই একটা কাজের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল সে। ছুটি পড়লেই বেরিয়ে যেত কোন না কোন বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে দূর-পাল্লার ভ্রমণে। এবার শুধু ব্যতিক্রম। সে জানে না কোন্ বিশেষ তাগিদে সে এবার এই প্রায়-পরিত্যক্ত বসুভিলায় ছুটি কাটাতে এল। ছুটি পড়ার আগেই ক'জন এসেছিল তার কাছে নতুন জায়গায় যাবার প্ল্যান নিয়ে, কিন্তু কেমন যেন একটা শীতলতায় পেয়ে বসল তাকে। সে সব প্ল্যান দূরে সরিয়ে রেখে বলল, এবার আমাকে বাদ দাও। আমি বড় ক্লান্ত।

বরুণ বলল, কিন্তু তুমি তো আমাদের সঙ্গে ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছ।

তা ঠিক, কিন্তু ওতে আনন্দ থাকলেও বিশ্রাম নেই।

এরপর বন্ধুরা অনেক অনুরোধ করেছিল। বন্ধু-পত্নীরা ওর খুঁটিনাটি সুবিধে-অসুবিধেগুলোর দিকে নজর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু নড়াতে পারেনি সুবর্ণাকে।

ওরা চলে গেলে নিজেকে আরও ক্লান্ত মনে করছিল সুবর্ণা। তারপর হঠাৎ কি করে যেন তার মনে বসুভিলার ছবিটা ভেসে উঠেছিল। সে দ্বিতীয়বার কোন চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিল না। একেবারে একখানা সুটকেশে সব ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বসুভিলার উদ্দেশ্যে।

কৈলাস দোরদালান পেরিয়ে সুবর্ণার ঠাকুরমার ঘরের দরজা খুলে বলল, রাঙা-মা, তুমি কি কর্তামার ঘরেই থাকবে?

বিশ-বাইশ বছর পরে দেখা কৈলাসের সঙ্গে। অনেক বুড়ো হয়ে গেছে লোকটি। কিন্তু সুবর্ণার মনে হল, লোকটি ঠিক তাকে মনে রেখেছে। সে ঠাকুরমাকে কর্তা-মা বলে ডাকত, আর তাকে ডাকত রাঙা-মা বলে।

সুবর্ণা বলল, হ্যাঁ, এ ঘরেই আমি থাকব।

কিছুক্ষণের ভেতর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্নান খাওয়া, সবই। গোমস্তা সদরে কি যেন কাজ নিয়ে গেছে। আসবে কবে ঠিক নেই। পথে নিজের বাড়িতে কাটিয়ে আসবে কয়েকদিন।

কৈলাস ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি কাল ভোরবেলা রওনা হয়ে গোমস্তাবাবুকে ধরে আনব।

সুবর্ণা বলল, থাক, এত ব্যস্ততার কিছু নেই কৈলাস কাকা। তুমি থাকলেই আমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কৈলাস মনে মনে খুশী হয়ে বলল, রাঙা-মা, বুড়োকে যে মনে রেখেছ এই আমার ভাগ্যি।

পথের ধারে শালগাছের তলায় পাতা পড়েছে। গরমের দিনে দমকা হাওয়ায় সে পাতা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। ক'টা শালিক তারই তলায় নেচে নেচে ফিরছে খাবারের সন্ধানে। রোদ্দুর এখনও চড়া। পথের ঠিক পরেই সুবর্ণরেখার সোনালী বালীর চর। তার ওপারে দূরবিস্তৃত প্রান্তর। শালের বন। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের দু'দিকে সারি সারি অরণ্য-সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে আছে। দিগন্ত ছুঁয়ে ধূমল রঙের ক'টি পাহাড় দাঁড়িয়ে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, ওগুলো পাহাড় নয়, সারি সারি শিবির। পথে লোকজন নেই। খাবার সময় কৈলাস বলেছিল, এ পথে চাষ-আবাদের সময় ছাড়া বড় কেউ একটা হাঁটে না। নদী পারাপারের খেয়াটা বেশ খানিক দূরে! সেখান অবধি এই পথে লোক আসে দূর গাঁ থেকে। তারপর নদী পারাপার করে চলে যায়। আমাদের বসুভিলা প্রায় উড়িষ্যা আর বিহারের সীমান্ত ছুঁয়ে।

ঠাকুরমার পালঙ্কের ওপর পুরনো সব বিছানা নামিয়ে পাতা হয়েছে। গ্রীষ্মের দিন বলে বিছানার ওপর কৈলাস বিছিয়ে দিয়েছে পুরনো মসলন্দ। সরু কাঠির ওপর বড় সুন্দর নক্সার কাজ। গরমের দিনে ওর ওপর গড়িয়ে বেশ আরাম হয়।

সুবর্ণা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পথের দিকে চোখ পেতে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এবার সে পাশ ফিরে শুতে গেল। আর কি আশ্চর্য, এতক্ষণ যা তার চোখে পড়েনি সেই বহু পুরনো দিনের আয়নাটা সে দেয়ালের গায়ে দেখতে পেল।

মেহগিনি কাঠের তৈরী কারুকার্য করা ফ্রেম। তার মাঝে ওভাল সাইজের বিরাট আয়নাখানা। ঠাকুরমার বাবা তার মেয়েকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। সুবর্ণা উত্তেজনায় উঠে বসল বিছানার ওপর। তাকিয়ে রইল আয়নার দিকে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। তার প্রতিফলিত আলোটুকু মুখে এসে পড়েছে সুবর্ণার।

আয়নায় পড়েছে তার মুখের প্রতিবিম্ব। কিন্তু একি! এত ভাল আয়নাটার এই হাল হয়েছে! যেখানে সেখানে ছোপ দাগ। মুখখানা ভেঙে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বিকৃত চেহারাখানার দিকে চেয়ে ম্লান একটা হাসি হাসল স্বর্ণা। আয়নাটার মত চেহারায়ও পরিবর্তন এসেছে। বিয়ে করেনি তাই, নইলে উত্তর-চল্লিশ মেয়েদের শরীরে ভাঁটার টান শুরু হয়ে যায়।

স্বর্ণা পলকহীন চোখে চেয়েছিল আয়নার দিকে। হঠাৎ তার মনে হল আয়নায় আর সে ছোপ ছোপ দাগ নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার আয়না। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রক-পরা একটি মেয়ে। সে দেখছে নিজেকে। যত দেখছে, ততই ঝোটন বাঁধা নোটন পায়রার মত পালক উঁচিয়ে নিজের অহংকারটুকু উপভোগ করছে। সাদা ফ্রক। কোমরে, গলায় আর ফ্রকের তলায় সোনালী সুতোয় তৈরী লেসের কাজ। দারুণ খুশীতে আর গর্বে ডগমগ মেয়েটি।

বাবার সঙ্গে এসেছে দশ বছরের স্বুবু ঠাকুরমার মহালে। এই প্রথম তার মুক্ত আলো হাওয়ায় বেশ কয়েকটা দিনের জন্যে বেড়াতে আসা। সকাল থেকে জলখাবার খেয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়া। পাখির পেছনে, প্রজাপতির খোঁজে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। বাগানের কাজে নিযুক্ত জনমজুরদের এটা ওটা বায়না ধরে নাজেহাল করা। পুকুরের জলে কাউকে নিয়ে নৌকোয় চেপে ঘুরে বেড়ান। এমনি অজস্র অকাজে কেটে যাচ্ছিল তার আনন্দ-উত্তেজনায় ভরা দিনগুলো।

দুপুরের দিকে সে একাই বেরিয়ে যেত। নদীর চরের ওপর পা ফেলে ফেলে চৈত্রের খরায় চরাচর রিণ্ রিণ্ করত। ভ্রূক্ষেপ নেই স্বুবুর। ঠাকুরমা দিবা-নিদ্রাগত। বাবার এসব ব্যাপারে ঢালাও পারমিশন। একটিমাত্র মেয়ে ডাকাবুকো হোক, স্বর্ণার বাবার এই ইচ্ছে।

নদীর চর ধরে সেদিন অনেখানি দূরে চলে গিয়েছিল স্বুবু। খেয়াঘাটটা যেদিকে তার ঠিক উল্টোদিকে। চাষের জমি এখন মাঠ। তার পরেই শুরু হয়েছে একটানা জংগল। শাল মহুয়া পলাশ সিমুলে জায়গাটা ঘন নিবিড়। সরকারী লোক এসে মাঝে মাঝে গাছ কেটে নিয়ে যায়। এদিকের জংগলে খরগোস, বুনো শুয়োর ইত্যাদির বাস।

জায়গাটার কাছে এসেই স্বুবুর দারুণ ভাল লেগে গেল। কোন কিছু ভাল লাগা মানেই স্বুবুর দেহে-মনে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া। সে ঢুকে পড়ল জংগলে। এতক্ষণ কড়া রোদ্দুরে থেকে নরম ছায়ায় এসে স্বুবুর মনে

হল, তার শরীর হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা আমেজে ভরে উঠেছে। সে পেছন দিকে দুটো হাত রেখে মুখ উঁচিয়ে দেখতে লাগল, গাছের ডালে কোনকিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা।

দুটো কাঠবেড়ালী চোখে এসে পড়ল। ওরা তিরৃ তিরৃ করে এ-ডাল ও ডাল বেয়ে পরস্পরকে ধরার নেশায় মেতে উঠেছে। কিছুক্ষণ খেলা দেখিয়ে ওরা অদৃশ্য হল। অন্য একটা গাছে হঠাৎ ক'টা পাখি ঝগড়া শুরু করে দিলে। স্বৃবু কান পেতে শুনল কতক্ষণ, কিন্তু বুঝতে পারল না কি নিয়ে ওদের ভেতর এমন ঝগড়াঝাটি। কিছুক্ষণ পরেই ওরা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ পাখা টেনে উড়ে চলে গেল।

স্বৃবু শুনতে পেল কোথায় যেন একটা কোকিল ডাকছে। সে পায়ে পায়ে তার খোঁজে বনের ভেতর ঢুকল। এক সময় আবিষ্কার করল সে। একটা শিমূল গাছ চারদিকে তার ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর ঐ শিমূলের শাখায় শাখায় ফুটে আছে লাল লাল ফুল। কালো কুচকুচে কোকিলটা ঐ লাল ফুলগুলোর মাঝখানে বসে বন কাঁপিয়ে গলা সাধছে।

কতক্ষণ কোকিলটার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর কোকিলটা উড়ে যেতে ও লাল লাল ফুলগুলোর দিকে চেয়ে রইল। স্বৃবুর মনে হল, কি দারুণ সুন্দর ঐ ফুলগুলো।

শিমূলের ফুল যখন স্বৃবুর মনে জাগিয়ে তুলল প্রলোভন তখনই ও দ্রুত একটা পায়ের সাড়া শুনতে পেল। কে যেন কোথা দিয়ে ছুটে আসছে।

স্বৃবু অত্যন্ত সাহসী। সে একটুও ভয় পেল না, কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে কৌতূহলের সৃষ্টি করল। সে তাকাতে লাগল চারদিকে।

ঠিক তার কাছাকাছি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল একটি ছেলে। প্রায় তারই সমবয়সী কী এক-আধ বছরের বড়। হাঁটুর ওপর পরেছে ময়লা এক টুকরো কাপড়। খালি বুকখানার ওপর তার চেয়েও অনেক কালো রঙের একটা কার থেকে ঝুলছে চ্যাপটা রূপোর তাবিজ। ছেলেটা স্বৃবুকে দেখে যেন ঘাবড়ে গেল। সে হয়ত পরী-টরির গল্প শুনেছিল, তার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিল এ মেয়েটির।

স্বৃবুই প্রথম কথা বলল। সাদা কাশ যেমন বাতাসে দোল খায় আবার স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি একবার সাদা ফ্রকপরা স্বৃবু দোল খেয়ে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলল, কোথায় চলেছ এমন দৌড়ে। আর একটু হলে ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে যে।

ছেলেটা কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় বাৎ করে বড় বড় চোখ মেলে সুবুর দিকে চেয়ে রইল।

সুবু এই বয়সে দারুণ গিন্নীবান্নি হয়ে গেছে। সে এবার কোমরে হাত তুলে দিয়ে বলল, কি? কথা বলছ না যে? কি নাম তোমার? থাকই বা কোথায়?

ছেলেটা প্রথমে পেছন ঘুরে আঙুল তুলে একটা জায়গা নির্দেশ করে বলল, খেয়াঘাটে যে খড়ের টঙ্ রয়েছে, ওখানে আমরা থাকি। আমার বাবা ঘাট-মাঝি। মা ঘরের সামনে পান-বিড়ির দোকান পেতে বসে।

থামলো ছেলেটা। সুবু অমনি বলল, কিন্তু তোমার নামটা বললে না তো?

ছেলেটা এবার অপ্রতিভ গলায় বলল, রাজারাম মণ্ডল।

সুবুর দারুণ হাসি পেল। সে খিল খিল হেসে উঠে বলল, তুমি রাজা? কই, মনে হচ্ছে না তো? রাজারা কেমন ঝলমলে পোশাক পরে, মাথায় থাকে মুকুট। সবাই রাজাকে কত খাতির করে।

রাজারাম বলল, ওসব জানি না। আমার নাম যা তাই বললাম তোমাকে।

তবে বাবা-মা আমাকে রাজু বলে ডাকে।

সুবু বলল, আমি তোমাকে রাজা বলেই ডাকব। ওসব রাজুটাজুর চেয়ে রাজা নাম খুব ভাল।

তোমার নাম?

সুবু। তুমিও সুবু বলে ডাকবে। এখানে আমার কোন বন্ধু নেই। তুমি আমার সঙ্গে খেলবে?

রাজা বলল, খেলব। তুমি কোথায় থাক?

নদীর ধারে ঐ কোঠাবাড়িতে। বসুভিলা জান না? ওটা আমাদের বাড়ি। ওখানে এস।

রাজা বলল, তোমার সঙ্গে খেলা হবে না।

বড় বড় চোখ বার করে সুবু বলল, কেন?

একদিন ও বাড়ির পেছনের বাগান পেরিয়ে তাড়াতাড়ি আসছিলাম, তোমাদের গোমস্তা আমাকে ধরে চাপড় মারলে। আমাকে বললে, তুই ফল চুরি করতে বাগানে ঢুকেছিলি।

আমি এক হ্যাঁচকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে টঙে হাজির। গোমস্তা-

টার মিছে কথা শুনে আমার রাগ হয়েছিল খুব। মাকে সব বলে দিলাম। মা বলল, খবরদার ও-মুখো হবি না। ওখানে মানুষ থাকে না, সব বনমানুষ থাকে।

আবার খিল খিল হাসি ছড়াল সুবু। বলল, বনমানুষ। খুব মজার কথা বলেছে তোমার মা। আচ্ছা, তুমি আমার বাড়ি না হয় নাই গেলে, আমরা দুপুরবেলা এখানে খেলতে পারি।

তা পারি। কাল আসব। আজ আমার অনেক কাজ।

সুবু গিন্নীর মত বলল, বারে। বন্ধু হলে কিছু দিতে হয় জান না?

রাজা বলল, কি দেব বল?

গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে সুবু বলল, ফুল পেড়ে দিতে পারবে?

রাজা বলল, তা পারি।

বলেই তর্ তর্ করে কাঠবেড়ালীর মত গাছে উঠে গিয়ে একরাশ টকটকে লাল ফুল মাটিতে ফেলে দিলে। পরে নীচে নেমে এসে বলল, এ বনে আরও অনেক ফুল আছে, আমি তোমাকে পেড়ে দেব।

কই দাও।

আজ না। আজ আমাকে এক্ষুনি দৌড়ে এক জায়গায় যেতে হবে বড্ড দেরী হয়ে গেছে!

সুবু বলল, তুমি বন্ধু না ছাই!

রাজা ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কেন?

কোথায় যাচ্ছ, আমাকে তো বললে না। বন্ধুকে সব কথা বলতে হয়। কিছু লুকোতে নেই।

রাজা একটু ইতস্তত করল। তারপর সুবুর কানের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল, একটা খবর দিতে যাচ্ছি বনের ওপারে।

কি খবর?

রাজা আবার ফিসফিস করে বলল, দুটো লোক বনের ওধারে ফসল পাহারা দেবার টঙ্ ঘরে লুকিয়ে আছে। মা খবর পাঠিয়েছে, ওদের এখুনি টঙ্ ছেড়ে পালাতে।

ওরা কারা রাজা?

তা আমি কি জানি। তবে বাবা খেয়া পার করার সময় লোকের মুখে শুনেছে, পুলিস এদিকে আসছে, দুটো লোকের খোঁজে, অমনি মা আমাকে ছুটিয়ে দিলে ওদের কাছে পুলিসের খবরটা পৌঁছে দেবার জন্তে।

ওরা খুব খারাপ লোক, না হলে পুলিস ওদের ধরতে আসবে কেন?

রাজা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি একটুও কিছু জান না। মা বলে, পুলিস অনেক খারাপ লোক। এরা খুব ভাল।

সুবু উৎসাহী হয়ে উঠল, ঐ ভাল মানুষদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে?

একটু কি ভাবল রাজা। তারপর বলল, আমার সঙ্গে দৌড়তে পারবে?

খুব পারব।

তবে এসো আমার সঙ্গে।

রাজা বন চিরে ছুটে চলল। একটা সুতো বাঁধা সাদা ঘুড়ির মত রাজার পেছনে পেছনে উড়ে চলল কিশোরী সুবু।

বন পার হয়ে ওরা একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকটা উঁচু বাঁশের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে খড়ে ছাউনি দেওয়া টঙ্। তারপর উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো জমি। পাথুরে মাটির ঢিপি কোথাও কোথাও।

একটা লোক ভেতর থেকে মুখ বের করে বলল, ও কে!

রাজা বলল, আমার বন্ধু সুবু।

লোকটা আবার বলল, তোমার বন্ধু? কোথায় থাকে?

বসুভিলায়।

ভেতরে দু'টি লোকের হঠাৎ ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল।

একটু পরে ভেতর থেকেই একটি লোক হাত বের করে ইঙ্গিতে শুধু রাজাকে ডাকল।

রাজা সুবুকে নীচে দাঁড়াতে বলে বাঁশ ধরে ওপরে উঠে গেল।

চাপা গলায় ওরা কি সব কথা বলছিল। দু'চারটে শব্দ কানে এসে বাজছিল সুবুর। পুলিস; একে সঙ্গে আনলে কেন। একেবারে বলবে না; পরে দেখা করব; সোমবার, মাকে বলো।

এইসব টুকরো টুকরো কথা থেকে সুবুর কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না কিছুই। তবে এসবে তার কোন কৌতূহলও ছিল না। তার আগ্রহ ছিল শুধু লোক-গুলোকে দেখার। পুলিস যাদের খুঁজছে তারাও যে ভালমানুষ হতে পারে, এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা চোখে দেখতে চায় সে।

একটু পরেই লোক দুটো ঝপ ঝপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল। দুজনের চোখেই গগল্‌স, মুখে গোঁফ-দাড়ি। সুবুর দিকে ওরা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তারপর পেছন ফিরে হন্ হন্ করে চলতে লাগল।

রাজাও নেমে এসেছিল। ওরা চলে গেলে সে স্বুর দিকে ফিরে বলল, চল যাই।

স্বুর কৌতুহল তখনও মেটেনি। সে বলল, আমি ঐ ঘরের ভেতরটা দেখব।

রাজা বলল, তুমি উঠতেই পারবে না।

স্বু বাঁশের খুঁটি দু'হাতে ধরে হনুমান পুতুলের মত দু-পা লাগিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই হেসে উঠল। তার সাদা ফ্রকে ধুলো লাগল। সে নিজে কিছুটা ঝেড়ে নেবার চেষ্টা করল। রাজা কাছে এগিয়ে এসে চাপড় মেরে মেরে বাকীটুকু পরিষ্কার করে দিল।

স্বু বলল, দুর, উঠতে পারলাম না।

সে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে দেখে রাজা বলল, এসো, আমাকে ধরে ওঠ। রাজা খুঁটি ধরে বসল।

স্বু বলল, কি করে উঠব?

কেন, আমার কাঁধে পা রেখে শক্ত করে খুঁটি ধরে থাক। আমি উঠে দাঁড়াব তোমাকে নিয়ে। তখন তুমি সোজা ওপরে উঠে যেতে পারবে।

স্বু তেমনি করে টঙের ওপর উঠল। সে হামা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। একটা কলসী আর এ্যালুমিনিয়ামের রঙচটা দুটো থালা ছাড়া আর কিছু ছিল না ঘরের ভেতর। বাঁশের ছাউনির ওপর খড় বিছানো মেঝে।

স্বু ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, ওরা থালা ফেলে গেছে।

রাজা নীচ থেকে বলল, ওগুলো আমাদের থালা।

তোমাদের থালা এখানে কেন?

রাজা বলল, ওদের খেতে দেওয়া হয়েছিল। ওগুলো আমি ঘরে নিয়ে যাব।

রাজা বাঁশের খুঁটি বেয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

চারদিকে টুলটুলে রোদ। সামনে ঘন বন। পেছনে ঢেউ খেলানো ক্ষেত। ছোট ঘরখানার ভেতর আবছা আঁধার। কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল সব কিছু। স্বু পা ছড়িয়ে বসে খুশীতে হেসে উঠল। রাজার হাত ধরে টেনে বলল, বস আমার পাশে। দারুণ জায়গা, তাই না?

রাজা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

স্বু পা গুটিয়ে নিয়ে রাজার দিকে চেয়ে বলল, এ ঘরটা কার?

আমার বাবার।

এ ঘরে তবে অন্ত লোক ছিল কেন?

জানি না। মা-বাবা জানে।

সুবু বেশ খানিকটা চিন্তা করে বিজ্ঞের মত বলল, এখন এ ঘরে ও লোক-গুলো নেই, আমরা রয়েছি, এ ঘরটা এখন আমাদের।

রাজা মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। বলল, ঠিক। তবে বর্ষাকাল শুরু হলেই বাবা ক্ষেত চষবে। তখন এ ঘরটা তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

সুবু প্রশ্ন করল, কবে বর্ষা পড়বে?

রাজা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বলল, বোধহয় দেরী আছে।

সুবু চিন্তিত হল। সে অমনি বলল, তাহলে অনেকদিন এ ঘরে আমরা খেলব।

কি খেলব?

কেন, বর-বউ। তুমি বুঝি বর-বউ খেলতে জান না?

রাজা মাথা নেড়ে জানাল সে এ খেলা কোনদিন খেলেনি।

সুবু তার হাত ধরে মুখোমুখি বসল। বলল, কি বোকারাম তুমি। এ খেলা সকলে জানে। কলকাতার বাড়িতে আমি, আমার বন্ধু জুঁই, মালিনী সবাই মিলে বর-বউ খেলি। কোনদিন মালিনী বা জুঁই বর সাজে, আর আমি বউ, কোনদিন বা আমি বর ওরা বউ।

একটু থেমে আবার বলল, এখানে অবশ্য তুমি বর সাজবে আর আমি বউ সাজব। তুমি তো ছেলে, তাই বউ তোমাকে সাজতে হবে না।

রাজা বলল, আমাকে এ খেলায় কি করতে হবে?

তুমি বনের থেকে ফুল ফুল পাতা পেড়ে আনবে। অমি রান্নাবাড়ি করে তোমাকে খাওয়াব।

রাজা বলল, বেশ, আমি যাচ্ছি। আমি তীরও ছুঁড়তে পারি।

দারুণ উৎসাহে ফেটে পড়ল সুবু। তোমার তীর-ধনুক আছে?

রাজা লাফ দিয়ে নেমে গেল। বলল, তুমি বস, আমি ছুটে ধনুকটা আনছি।

মিনিট পনের কুড়ি সেই ছোট্ট ঘরে ঠায় বসে বসে বরের কথা ভাবল সুবু। গায়ের রঙটা ময়লা হলে কি হবে, ভারি সুন্দর দেখতে রাজা! তাছাড়া কেমন শিমূলগাছের মগডালে উঠে ও ফুল পেড়ে আনল। আবার তীর ছুঁড়তে পারে। শাবাশ ছেলে! এমন একটা বর পেতে ভাগ্যি করা চাই।

মা-মালীদের উচ্চারণ করা কথাগুলো স্থবু তার চিন্তার ভেতর লাগিয়ে দিলে।

রাজা এল তীর-ধনুক নিয়ে ছুটতে ছুটতে। ততক্ষণে নতুন পরিকল্পনা এসে গেছে স্থবুর মাথায়।

স্থবু বলল, এ্যাই, তুমি আর ওপরে উঠবে না। আমি নীচে নামব। তুমি খুঁটি ধরে দাঁড়াও, আমি তোমার কাঁধে পা রেখে তেমনি করে নামি।

রাজা বলল, আমার গায়ে তুমি একবার পা দিয়ে উঠেছ, তখন কিছু বলিনি এখন তুমি আমার বউ, গায়ে পা দিতে পারবে না।

স্থবু অমনি বলল, কি হাঁদারাম বর বাবা! ছবি দেখনি? কালীঠাকুর তার বর শিবঠাকুরের ওপর চড়ে নাচছে না?

রাজা গরম হয়ে বলল, অতশত বুঝি না আমি গায়ে আর পা লাগাতে দেব না।

অগত্যা কি আর করে স্থবু। লাফিয়ে নামল নীচে। এতটা লাফাতে গিয়ে চোট পেল হাঁটুতে। খানিকটা ছড়ে গেল হাঁটুর চামড়া। রক্ত বেরোল তাই দেখে বনের ভেতর ছুটল রাজা। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল কয়েকটা পাতা নিয়ে। হাতে বেশ করে দলে রস বার করল। ঐ রস নিংড়ে ফেলল ছড়ে যাওয়া জায়গার ওপর। তারপর হাত দিয়ে ব্যথাটা পাতাসহ চেপে ধরল।

স্থবু সমানে বলে যেতে লাগল, ও কিছু না, ও কিছু না!

রাজা বলল, সত্যি তোমাকে কাঁধে করে নামিয়ে নিলে আর এমন ছড়ে কেটে যেত না।

স্থবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'পাক নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে নিয়ে বলল, ব্যস, সব সেরে গেছে। এখন চল, আমরা রাম-সীতা খেলি।

রাম-সীতা।

কেন, রামায়ণের গল্পটাও জান না বুঝি?

আত্মসম্মানে লাগল রাজার। বলল, খুব জানি। যাত্রায় দেখেছি।

স্থবু বলল, তাহলে সামনের বনে যাই চল। তুমি ধনুক নিয়ে আগে আগে আর আমি পেছনে।

রাজা বিজ্ঞের মত বলল, আর একটা ছেলে ছিল না? আমি যাত্রায় দেখেছি।

স্থবু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, তুমি সত্যি বোকা। ওর নাম জান না? ও তো লক্ষ্মণ। কাজ নেই ওকে সঙ্গে নিয়ে। চল আমরা দুজনেই বনে যাই।

নির্জনে দুপুরে নিঃশব্দে দু'টি কিশোর-কিশোরীর খেলা চলছিল ক'টি দিন। সভ্য জগতের কেউ সে খেলার সন্ধান পায়নি। শুধু দু'টি শিশুমন পরস্পরকে সেদিন বেঁধেছিল নিবিড় বাঁধনে।

খেলা তাদের একদিন ভাঙল। আর ভাঙল গভীর একটা বিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে।

প্রথম দিন পুলিস খোঁজ করে গেছে সারা তল্লাট, কিন্তু দেখা মেলেনি কারু। ইনফরমারের নিশ্চিত খবর ছিল, দুটো লোক ঢুকে পড়েছে এই অঞ্চলে। তারা রয়েছে ছদ্মবেশে। তাদের কাছে পিস্তলও দেখা গেছে। এখানে কোথাও ডাকাতি করে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে বিহার অথবা উড়িষ্যাতে পালাবে। এরা সাধারণত ডাকাত নয়, সরকার-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী, অথবা ঐ ধরনের কোন লোক। টাকার সন্ধানে জমিদার-জোতদারদের নির্জন খামারবাড়ি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এসব খবর সুবুর রাখবার কথাও নয় আর সে রাখেও নি। লোক দুটোকে সে চোখে দেখেছে, আর চলে যেতে খুশীই হয়েছে। তার ঠিক পরেই জমে উঠেছে ওদের মজার খেলা।

দ্বিতীয় দফায় পুলিস এল প্রায় পাঁচ দিন পরে। সারা অঞ্চল ঘিরে চলল তাদের তল্লাসী আর জিজ্ঞাসাবাদ। জাল পাতার খবর পেয়েই পাখি পালিয়েছে মুল্লুক ছেড়ে।

সেদিন দুপুরবেলা ওরা রোজকার মত খেলছিল রাম-সীতার খেলা। বনের ধারে নদীর দিকে চেয়ে বসেছিল সুবু। ওপারে শালবন আর নীল পাহাড়। নদীটা কেমন এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। ঠাকুমার কাছে ক'দিন সে কৃত্তিবাসের রামায়ণখানা পড়ে শোনাবার জন্মে বায়না ধরেছিল। ঠাকুরমা নাতনীর আবদার রেখেছিল পরম আদরে।

সুবু বসে বসে পঞ্চবটি বনের কথা ভাবছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে ঠিক বসে আছে পঞ্চবটি বনের ভেতরে। রাম গেছে বনের গাছগাছালি থেকে ফুল পেড়ে আনতে। সীতা বসে আছে ফুলের গয়নায় সাজবে বলে।

এমন সময় পেছনে কাদের পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। বালির ওপর দিয়ে আসছিল, তাই দূর থেকে কোন শব্দই ভেসে আসেনি। চমকে ফিরে তাকাতেই সুবু দেখল লোকগুলো তার একেবারে সামনে এসে গেছে।

সুবু পুলিসের লোকদের চেনে। তাদের সঙ্গে ছিল বসুভিলার একজন গোমস্তা।

সুবুকে দেখে গোমস্তা বলল, খুকুমণি তুমি এখানে?

খেলছি।

একজন পুলিস এগিয়ে এসে বলল, একা একা এতদূরে? পাশে বনজঙ্গল, ভয় করছে না?

না। ভয় কিসের।

একটি অফিসার গোছের লোক বললেন, মেয়েটি কি মিঃ বোসের?

গোমস্তা বলল, হ্যাঁ স্যার।

অফিসারটি বললেন, খুকী, এটা খেলার জায়গা নয়। বাড়ি যাও।

সুবু সঙ্গে সঙ্গে বলল, এটা পঞ্চবটি বন। এখানে রাম-সীতা খেলার জায়গা।

অফিসারটির গোমড়া মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি সেপাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে বসুভিলায় পৌঁছে দিয়ে চলে এস।

সুবু বলল, আমি কিছুতেই যাব না।

অমনি গর্জন করে ধমকে উঠলেন অফিসারটি, ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যাও। ঢ্যাটা মেয়ে কোথাকার!

বেহারী সেপাইটি বেশ পালোয়ান গোছের। সে সুবুকে পেড়ে ফেলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। সুবু হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল। দারুণ অপমানে তখন তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

সামান্য কয়েক পা এগিয়েই সেপাইটা চেঁচিয়ে উঠল। তার হাত থেকে বালির চরে ছিটকে পড়ে গেল সুবু। সে-ও হতভম্ব। পুলিসের দল কি হল, কি হল বলে ছুটে আসছে সেপাইটির দিকে।

ঘাড়ে হাত চেপে কাতরে চলেছে বেহারী সেপাই।

দেখা গেল, একটা বাঁশ থেকে তৈরী স্থঁচোলো তীর এসে লেগেছে সেপাইয়ের ঘাড়ে। খানিকটা বিঁধে রক্ত বের করে তীরটা পড়ে গেছে নীচে।

পুলিস অফিসারটি গোমস্তাকে বললেন, নিয়ে যাও ওকে বাড়িতে। আমরা বনের দিকটা দেখছি। মনে হচ্ছে, এখানে কিছু একটা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

গোমস্তা সুবুকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল বসুভিলার দিকে। বন্দুক বাগিয়ে সেপাইগুলো ঢুকল বনের ভেতর। অফিসারটি গোমস্তাকে হেঁকে বলে দিলেন, ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে এস চটপট।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে গোমস্তা দ্রুত পা চালাল।

সন্ধ্যায় সুবুর কানে এল ব্যাপারটা। বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে অফিসার আর সেপাইরা কথা বলছিল। ও আড়ালে থেকে কান পেতে শুনছিল সব।

অফিসারটি বললেন, আর একটু হলে ঐ ছোঁড়াটার তীর এসে লাগতে পারত আপনার মেয়ের চোখে।

সুবুর বাবা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কি সর্বনাশ! ভাগ্যিস আপনি ওকে ওখানে দেখতে পেয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একা একা এ্যাদ্দুর চলে গেছে আমি ভাবতেও পারিনি।

অফিসারটি বলে চললেন, ছোঁড়টাকে ধরতে গিয়ে একটা ক্লু পেলাম। কাল ঐ সূত্রটা ধরে তদন্ত করব ভাবছি।

কি রকম?

ছোঁড়াটাকে বনের ভেতর তাড়া করছিল সেপাইগুলো। লাঠি ছুঁড়তে ও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। রক্ত ঝরছিল মাথা থেকে। তবু কি কইমাছের প্রাণ মশাই! ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ছুটল। আমরা ভাবছি, কোথায় সিঁধোলো রে বাবা। শেষে বন পেরিয়ে এসে দেখি, একটা ঝোপড়ির ভেতর থেকে ইঁদুরের মত লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। উঁচু নীচু খানা-খন্দ পেরিয়ে ও এমন দৌড় দিল যে দুটো সেপাই হিমসিম খেয়ে ফিরে এল।

কিন্তু ক্লু পেলেন কি?

অফিসার বললেন, তাই বলছি। ঐ ঝোপড়ির ভেতর ঢুকে খড়কুটো সরিয়ে দেখা গেল একটি তাজা কার্তুজ পড়ে আছে। ওফ্, কাদার! তাহলে লোকগুলো এখানেই ছিল। আপনার গোমস্তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ঐ ঝোপড়িটা ঘাটমাঝির। চাষের সময় আর ফসল তোলার সময় দিনে রাতে এখানে বিশ্রাম করে, জানোয়ারদের হাত থেকে ফসল পাহারা দেয়।

সুবুর বাবা বলল, এমনও হতে পারে, এখন চাষের সময় নয় বলে ঐ লোকগুলো ঐ ঝোপড়িটাকে নির্জন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছিল। ঘাট-মাঝি হয়তো এ সবের কিছুই জানে না।

সে আমারও মনে হয়েছে মিঃ বোস। তবে কিনা ছেলেবেলায় পড়া সেই কবিতাটার কথা আজও ভুলতে পারিনি:

'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'

তাই ভাবছি, কাল ঘাটমাঝিটাকে একবার ধমক-ধামক দিয়ে দেখব। হয়ত সুতোর প্রান্তটা পেয়ে যেতেও পারি।

সুবুর বাবা বলল, দেখুন চেষ্টা করে।

অফিসারটি বললেন, আপনি কিন্তু আর বেশী দিন এখানে থাকবেন না। যখন একটা ঝঞ্ঝাটের শুরু হয়েছে তখন মেয়ে নিয়ে এখানে থেকে লাভ নেই। বরং চারদিক ঠাণ্ডা হলে আবার আসবেন।

আমি তাহলে পরশুর ভেতর মহল থেকে চলে যাচ্ছি। মেয়ে নিয়ে থাকা সত্যিই রিস্কি। তবে আমার মা তো আর এখান থেকে নড়বেন না, তাঁর জন্যে কি ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনারা?

মাসখানেক ধরে আপনার বাড়িতে দুজন সেপাই ডিউটিতে থাকবে। তাহলেই আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন মিঃ বোস।

আমি ওদের সব খরচ খরচাই দিয়ে দেব।

অফিসার বললেন, আরে মশাই ওরা সরকারের চাকর। ওরা থানার ডিউটিতে থাকবে। আপনাকে ওসব কিছু ভাবতে হবে না। কাল একবার শুধু আপনার গোমস্তাটিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

রাতে চাঁদ উঠেছে। অনেক রাত। বসুভিলায় সবাই ঘুমে অচেতন। পাহারাদার সেপাইটা বাইরে ঢুলছে। সুবু নিঃশব্দে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরুল। পেছনের বাগান পেরিয়ে সে উঠল বড়রাস্তায়। একটুও ভয় করছিল না তার। ছোটবেলা থেকেই সে নির্ভিক। হন্ হন্ করে সে হেঁটে চলল পথ ধরে। বেশ খানিক দূরে গিয়ে দেখতে পেল নদীর ধারে বালুর চরের ওপর চালাঘরটি। সে এবার বালির ওপর পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল। চালা-ঘরের ভেতর এত রাতেও একটা টেমি জ্বলছিল। কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সুবু। বাইরের দাওয়ায় পড়ে একটা লোক ঘুমুচ্ছে। সুবু বুঝল, লোকটি পারঘাটের মাঝি। রাজার বাবা। এবার সে নীচু হয়ে ঝোরকা দিয়ে তাকাল। ঘরের ভেতর রোজকার ব্যবহারের জিনিসে ঠাসা। রাজা তারই ভেতর শুয়ে আছে, আর ঠায় বসে মাথায় জলপটি দিচ্ছে রাজার মা। সুবু কোনদিন রাজার মাকে দেখেনি। কি ভাল দেখতে। পরিষ্কার রঙ। নাক চোখ মুখ, সবই সুন্দর। স্থির হয়ে বসে একমনে ছেলের মাথায় আঙুলে জল তুলে বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিচ্ছে মা।

রাজা কেমন আছে মাসীমা?

খুব আস্তে কথা ক'টি স্বুবু বললেও চমকে ঘোরকার দিকে তাকাল মহিলা। হামা দিয়ে এগিয়ে এসে বলল, কে তুমি মা ?

আমি স্বুবু। রাজার বন্ধু। ওকে দেখতে এসেছি।

মহিলাটি এবার নীচু হয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। স্বুবুর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি স্বুবু ? কিন্তু মা, এত রাতে একা এলে কি করে ?

আমার ভয় করে না।

কিন্তু ওরা যদি হঠাৎ জানতে পারে তুমি ঘরে নেই আর হৈ হৈ করে খোঁজা শুরু করে দেয় ?

আমি একা একটা ঘরে শুই। সে ঘরের পেছনের দরজা খুলে বাগানের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে চলে এসেছি।

তুমি তবুও এসে ভাল করনি মা। ওরা জানতে পারলে আমাদের শুদ্ধ টানাটানি করবে।

স্বুবু বলল, আমি ক'টা কথা বলতে এসেছি। রাজা ভাল হয়ে উঠলে বলবেন, আমরা পরশু দুপুরের বাস ধরে চলে যাব। পরে এলে আবার আমরা খেলব।

একটু থেমে গলার স্বর নীচু করে বলল, আর সাবধানে থাকবেন। বনের ধারের ঘর থেকে পুলিসের লোকেরা একটা কার্তুজ পেয়েছে। ওরা আপনাদের সন্দেহ করেছে কিছুটা। খোঁজখবর নিতে আসবে কাল। বাবা বলেছে পার-ঘাটের মাঝি হয়তো কিছুই জানে না, ওরা নিজেরাই ঘর খালি পেয়ে ঢুকে বসেছিল। থানার অফিসার বলেছেন, তবু একবার ধমক-ধামক দিয়ে দেখা ভাল, যদি কিছু বেরোয়।

স্বুবু থামলে রাজার মাকে কিছুটা চিন্তিত দেখাল। আর ঠিক সেই সময় খেয়াঘাটের ওপারে শালগাছগুলোর ভেতর থেকে একটা অতি সবুজ আলোকে নড়তে দেখা গেল। আলোটা প্রথম চোখে পড়ল স্বুবুর। সে অমনি বলে উঠল দেখ দেখ মাসীমা, একটা আলো ওপারে কেমন নড়ছে।

রাজার মা চমকে উঠল। তারপর বলল, তুমি মা একটু রাজার কাছে বস, আমি এখুনি আসছি।

স্বুবু রাজার মাথার কাছে গিয়ে বসল। সে হাত দিয়ে দেখল মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। পাশে রাখা বাটি থেকে জল নিয়ে সে বিন্দু বিন্দু ফেলতে লাগল রাজার কপালের ওপর পাট করে রাখা ন্যাকড়াটায়। কিছুক্ষণ পরেই

সে দেখল রাজা তার দিকে তাকাল। ঠিক ঐ শিমূলের লাল ফুলের মত রাঙা দুটো চোখ।

রাজা অবাক হয়ে দেখছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে ঠিক চিনে উঠতে পারছে না মেয়েটিকে।

স্বুবু মুখ নীচু করে বলল, আমি, আমি রাজা। আমি স্বুবু।

এবার চোখ বন্ধ করল রাজা। কিছু পরে আবার চোখ খুলে তাকাল। সে এখন চিনতে পেরেছে স্বুবুকে। অমনি বিছানা থেকে উঠে বসার জন্যে নড়ন চড়ন শুরু হয়ে গেল তার।

স্বুবু বলল, একটুও নোড় না যেন। আমি তো পাশেই বসে রয়েছি।

রাজা আর উঠে বসার চেষ্টা করল না। সে স্বুবুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে এক সময় বলল, তুমি এখানে কি করে এলে স্বুবু?

সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক।

রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল। স্বুবুর মুখেও হাসি। সে রাজার একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরল। ঠিক সেই সময়টিতে ঘরে এসে ঢুকল রাজার মা।

স্বুবু বলল, ওটা কিসের আলো মাসীমা?

সে তুমি বুঝবে না মা। তবে তুমি আজ এখানে এসে অনেক উপকার করলে মা। আশীর্বাদ করছি, জীবনে তুমি পরের উপকার করবে আর খুব সাহসী হবে।

স্বুবু রাজার দিকে ফিরে বলল, খুব লেগেছে তোমার মাথায়?

রাজা মাথা নাড়তে পারল না। হাত নেড়ে জানাল, তার তেমন কিছু লাগেনি।

রাজার মা বলল, এখুনি তোমাকে চলে যেতে হবে মা। বাইরে দুজন লোক রয়েছে, তারা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

স্বুবু অমনি বলল, ও, সেদিনের সেই দুটি গগল্‌স্ পরা লোক?

রাজার মা ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

স্বুবু রাজার দিকে এক চোখে চেয়ে একটু ভেংচি কাটল। তারপর রাজা আর সে দুজনেই হেসে ফেলল।

বাইরে এসে স্বুবু দেখল সেই দুটি লোক দাঁড়িয়ে। তারা স্বুবুকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। স্বুবুও হেসে হাসি ফিরিয়ে দিল।

তারা স্বুবুকে নিয়ে চলতে শুরু করলে রাজার মা চুমু খেলে স্বুবুর গালে

সুবু হঠাৎ পিছন ফিরে দেখল, রাজা ঝোরকার পাশে উঠে বসে তার দিকে চেয়ে আছে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল সুবুর। ঘুম ভাঙতেই কৈলাস কাকা তাকে এসে খবরটা দিলে, রাঙামা, কাল যে কাণ্ড হয়েছে না।

কি কাণ্ড কৈলাস কাকা?

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। বাইরে যে সেপাই ডিউটিতে ছিল তাকে ডাকাতেরা হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখে গেছে। সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে তার বন্দুকখানা।

বন্দুক নিয়ে গেছে?

কৈলাস হাত-মুখ নেড়ে বলল, সেই নিয়ে কি হৈ চৈ। অফিসার সাহেব ভেতরে শুয়েছিলেন, খবর পেয়ে তিনি একখানা যা লাফ দিলেন, কি বলব রাঙামা। কনুইতে আবার দরজার কাঠখানা বেজে গিয়ে উ-হু-হু-হু আওয়াজ করে বসে পড়লেন। সেপাই ছুটো তাকে ধরে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে হাত-পা বাঁধা সেপাইটা ছাড়া পেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ খোলা পেয়ে সে আস্ফালন করছে ব্যাটাদের একবার ধরতে পারলে দেখে নেব বলে।

সাহেব ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কনুইখানা ঘষতে ঘষতে মুখখানা খিঁচিয়ে উঠলেন, চুপ রও। নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো হচ্ছিল পাহারার নামে।

মার খাওয়া ভুলোটা যেমন কুঁই কুঁই করে সেপাইটা তেমনি করতে লাগল। তারপর সাহেব ধমকে দিয়ে সব ক'টাকে ছোটালেন শালজঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের ওদিকে টঙ ঘরটা সার্চ করে দেখতে। ওরা মুখ নীচু করে ফিরে এল। অমনি সাহেব ওদের পাঠালেন ঘাটমাঝিকে পাকড়াও করে আনতে।

সুবু চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কি! ঘাটমাঝিকে ডাক দিলে কেন? লোকটি কি এসেছে? সেই বা ওসব চোর-ডাকাতের কি জানে?

কৈলাস বলল, ওসব পাটও চুকে গেছে। ঘাটমাঝি আসতেই বাঘের মত হাঁকড়ে উঠলেন সাহেব, ব্যাটা হারামজাদা, ঘর করেছে জঙ্গলে ডাকাত পুষবে বলে। বল, কত টাকা ওরা ঘর-ভাড়া দেয় তোকে?

হাউমাউ কান্না শুরু হয়ে গেল ঘাটমাঝির। অমনি আবার ধমক। মাঝির কান্না বেড়ে গেল। পায়ে পড়ে আরকি। লোকটা চিরকালই সোজা সরল। বউটা বরং একটু অন্য রকমের। দেমাকী। কথা কয় না কারো সঙ্গে।

রূপের গরব। কোথা থেকে এসে যে ঘাটমাঝিকে বিয়ে করেছিল তা কেউ জানে না।

সুবু বলল, তারপর কি হল বল না কৈলাস কাকা?

তোমার বাবা মাঝে পড়ে ইংরিজিতে কি যেন বলল সাহেবকে। অমনি সাহেব মাঝিকে বলে উঠলেন, যা ব্যাটা, কোনদিন যদি শুনতে পাই তুইও আছিস যোগে, তাহলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে করে দেব। ভাগ্‌।

সুবু বলল, ঘাটমাঝি তাহলে চলে গেছে?

ধর্মবাপ বলে মাটিতে পেন্নাম ঠুকে পালিয়েছে।

সুবু মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠল। যে দুটি লোক অনেক আদর করে তাকে কাল রাতে পেছনের বাগান দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তারাই তাহলে সেপাইয়ের বন্দুকটা যাবার সময় নিয়ে গেছে। আর রাজাদের মারধোর করার জন্যে যে সেপাইগুলো নদীর ঘাটে যাবে না তাতেই তার খুশীর শেষ রইল না।

দুপুরে চর্বচোষ্য সাঁটিয়ে বিদেয় হল থানার সেপাইরা। অফিসার বলে গেলেন, রাতে একজনকে ডিউটিতে পাঠাবেন। পালা করে এক একজন ডিউটি দেবে। দিন পনেরো এমনি ঘোরাঘুরি করলে আশা করি ভয় পেয়ে পালাবে সন্ত্রাসবাদী বীর পুঙ্গবেরা।

দুপুরে থানার লোকগুলো চলে গেলে বায়না ধরল সুবু বাইরে যাবার জন্যে। কিন্তু এবার থেকে তাকে ঘিরে বসেছে কড়া পাহারা। কিছুতেই বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। ওরা সব করতে পারে। ফুটফুটে মেয়ে দেখলে ফুসলে নিয়ে পালাতে পারে। তারপর অনেক টাকা চেয়ে বসবে মুক্তিপণ। ওসব ঝামেলায় আর কে যেতে চায়। ঠাকুরমা রামায়ণ নিয়ে বসল সুবুকে শোনাতে। এখন আর রামায়ণে মন নেই সুবুর। রাক্ষসদের তীর ছুঁড়তে গিয়ে শেষটায় রাম নিজেই চোট পেয়ে বিছানা নিয়েছে। তার সঙ্গে একটিবার দেখা হবার দরকার ছিল সীতার, কিন্তু সীতা এখন বন্দিনী।

পরের দিন বাবার সঙ্গে বাসে গিয়ে উঠল সুবু। বাসটা রাতের ট্রেন ধরিয়ে দেবে। বাস ছাড়তে দেরী আছে। গোমস্তা সামনের দুটো সীটে বসিয়ে দিয়ে গেছে ওদের। কৈলাস মালপত্র বয়ে এনেছিল, মিঃ বোস তাকেও বিদেয় করে দিয়েছেন। কর্তামার দিকে নজর রাখার কথা বলে দিয়েছেন বার বার করে। এখন গাড়ি ছাড়ার প্রতীক্ষা। গরমের দিনে গলদঘর্ম হচ্ছে যাত্রীরা।

হঠাৎ সুবুর চোখে পড়ল পথের ধারে ক'টা শালগাছের জটলার দিকে। একটা মাথা উঁকি দিচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা। সুবু তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা, এই এলাম বলে।

মিঃ বোস বললেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে আবার, দূরে কোথাও যেও না যেন।

নেমে যেতে যেতে সুবু বলল, এই গাড়ির কাছেই রয়েছি।

সুবু গাড়ির পেছন দিকে চলে গিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল রাজাকে। এক গোছা টকটকে লাল ফুল রাজার হাতে। এগিয়ে এসে ফুলগুলো সুবুর হাতে তুলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীর পেছনে কেউ ওদের দেখছিল না। সুবু কোন কথা বলতে পারছিল না। রাজার ব্যাণ্ডেজ করা মাথার দিকে চেয়ে তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। রাজা সুবুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর কোন কথা না বলে উদ্গত অশ্রু বুকে চেপে বাসের দিকে ছুটে চলল।

হর্ন বাজতেই ফুলগুলো বুকে চেপে ধরে গাড়িতে এসে বসল সুবু। বাবা বলল, ফুল কোথা পেলি সুবু?

কাঁপা কাঁপা গলায় সুবু বলল, একজন দিয়েছে।

মিঃ বোস ভাবলেন, যেমন দস্যি মেয়ে, কারো হাতে ফুল দেখে নেমে গিয়েছিল। তার কাছ থেকেই নিয়ে এসেছে।

তিনি মেয়েকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। গাড়ি ছেড়ে দিল। সুবর্ণরেখা দূরে সরে যাচ্ছে। সুবু জানলার ফ্রেমে মুখ ঠেকিয়ে বসেছিল। তার চোখে হঠাৎ ভেসে উঠল একটা ছবি, সুবর্ণরেখার বালু চিক্-চিক্ চরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একটি সুন্দর কালো ছেলে। সে কোনদিকে আর তাকাচ্ছে না। ছুটে চলেছে খেয়াঘাট লক্ষ্য করে।

সুবুর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। গাড়িটা টাল খেয়ে নতুন বাঁক ধরে তীব্র-গতিতে ছুটতে লাগল। সুবর্ণরেখা পড়ে রইল অনেক পেছনে দৃষ্টির বাইরে।

কৈলাস পাশে এসে দাঁড়াতেই স্মৃতির স্বপ্নটা ভেঙে গেল সুবর্ণার।

কৈলাস বলল, রাঙা মা, মায়া মেমসাহেবকে তোমার মনে আছে?

সুবর্ণা দারুণ উৎসুক গলায় বলল, আছে নাকি এখানে?

আছে কিগো, তিনিই তো এখন ফ্লোরেন্স সেবা আশ্রমটি পরিচালনা করছেন।

কিছুক্ষণ আগে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে তেনার সঙ্গে দেখা। কি কাজে যেন

শহরে যাচ্ছেন। আমি তোমার কথা ওনাকে বললাম। খুব খুশী হয়ে উঠলেন। তিনি দু'চারদিন পরে ফিরবেন, আর ফিরে এসেই তোমার কাছে আসবেন বলেছেন।

নদীর ওপারে পাহাড়ের কাছাকাছি শাল বনের ভেতরেই তো ওদের আশ্রম?

হ্যাঁ রাঙা মা, সেইখানেই আশ্রম। তবে তুমি শেষবারে যা দেখে গিয়েছিলে তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে আশ্রমটি। এখন সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটা ইস্কুল হয়েছে। তাছাড়া ছোট একটা হাসপাতাল, ডাক্তার-নার্স, তাদের থাকার ঘর, সব মিলে বেশ জমজমাট ব্যাপার।

বাঃ, তাহলে তো মায়া মেমসাহেবের বেশ ক্ষমতা আছে বলতে হবে।

এ তল্লাটে সবাই ওনার কথায় ওঠে বসে। সবাই ওনার পরামর্শ নিয়ে চলে।

বাইরে থেকে কৈলাসের ডাক এল। পাশের গাঁ থেকে লোক এসেছে কৈলাসের অর্ডার দেওয়া খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। কৈলাস হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

সুবর্ণার চোখ আবার গিয়ে পড়ল ঠাকুরমার সেই আয়নাটার ওপর। ঝক্ ঝক্ করে উঠল ডিম্বাকৃতি সেই আয়না। একটি তরুণী এসে দাঁড়াল তার সামনে। মুখখানা থমথমে। কিছুদিন হল মাকে হারিয়েছে সে, তাই শোকের ছায়া এখনও মুখের ওপর থেকে মুছে যায়নি। সবে স্নান করে সিক্ত কুমুদ ফুলটির মত নিজের ছায়া দেখছে আয়নার জলে।

বাবার ডাক শোনা গেল, সুবু মা, একবার এসো তো এখানে।

যাই বাবা, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সুবু।

একটি তারই বয়েসী মেয়ে বাবার সামনে মোড়ায় বসে রয়েছে। হাতে চাঁদার খাতা। মেয়েটি নামের পোশাক পরে আছে। এ দেশীয় মেয়ে।

বাবা বলল, নদীর ওপারে কিছুদিন হল একটি সেবাকেন্দ্র এরা গড়ে তুলেছেন। তার জন্যে চাঁদা নিতে এসেছেন ইনি। তোমার সঙ্গে এঁর বয়েসের খুব একটা তফাৎ হবে বলে মনে হয় না। তুমি যে ক'দিন রয়েছ, ওঁদের সেবাকেন্দ্রে যেতে পার।

নানটি হেসে বলল, আপনি যখন আমাকে আপনার মেয়ের বয়েসী বললেন তখন ও আমার বন্ধু হল, আর আপনি হলেন আমার আঙ্কেল। এরপর আপনি আমাকে নিশ্চয়ই আর 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলবেন না।

মিঃ বোস হেসে বললেন, নিশ্চয়ই না। তবে তোমরা সমাজের যে আসনে বসে রয়েছ সেখানে মানুষের শ্রদ্ধাই শুধু গিয়ে পড়ে।

মেয়েটি বলল, এইখানেই ভুল করলেন আংকেল। আমরা সমাজের সেবা করি মানুষকে ভালবেসে। তার বিনিময়ে আমরা মানুষের ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা নয়।

মিঃ বোস বললেন, খুব ভাল লাগল তোমার কথাটা শুনে। আমার বিশ্বাস তোমার মত এমনি কয়েকজন সেবাব্রতী থাকলে তোমাদের ঐ সেবা-কেন্দ্রটি যথার্থ আদর্শ একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

নান বলল, আপনাদের সবার শুভেচ্ছায়।

মিঃ বোস ভেতরে উঠে যাবার সময় বললেন, স্বর্ণা, তুমি তোমার নতুন বন্ধুটির সঙ্গে গল্প কর। আমি আসছি।

ঘরের ভেতর ঢুকে একটু পরেই বেরিয়ে এসে নানটির হাতে একশো টাকার একখানা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, প্রতি বছর আমি থাকি আর না থাকি তুমি এই টাকাটা বসুভিলা থেকে সেবাকেন্দ্রের জন্যে নিয়ে যেও। আমি আমার গোমস্তাকে নির্দেশ দিয়ে যাব।

খুশী হয়ে নানটি রসিদ কেটে মিঃ বোসের হাতে তুলে দিল।

মিঃ বোস ভেতরে ঢুকে গেলে স্বর্ণা বলল, এখন থেকে আপনি বলব না তুমি? নিশ্চয়, তুমি।

আমার নাম স্বর্ণা, তোমার?

একটু ভেবে নানটি বলল, এখন নামের পরিবর্তন আর সংযোজন হয়েছে অনেক, তবে তুমি আমাকে মায়া বলেই ডেকো।

এখন তোমাদের সেবাকেন্দ্রের চার্জে কে রয়েছেন মায়া?

মাদার রেবেকা। তিনি শহর থেকে সপ্তাহে দু'দিন আসেন এখানে। আর বাকী দিনগুলো আমার ওপরেই সব কাজের ভার দিয়ে যান।

এখানে তুমি কি একা?

না না, একা থাকব কেন, আমরা তিনজন রয়েছি। আমি এবং আর দুটি নান।

তুমি কি সিস্টার?

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে মায়া হাসল। মুখে বলল, তোমার অনুমান ঠিক। শহরে আমাদের কনভেন্ট থেকে একজন সিস্টার আর দুজন নানকে এখানে পাঠান হয়েছে। আমরাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। শিশুদের

খাবারদাবার বিলি করি। রোগীদের জন্য পথ্য দেবার চেষ্টা করি। ছোট ছেলেমেয়েদের একটা ভাল স্কুল গড়ে তোলার ইচ্ছে আছে। মাদার রেবেকা এলে ঘুরে ঘুরে পল্লী পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে লোকেদের উৎসাহিত করেন। নিজের হাতে এক একটি করে ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে দেখিয়ে দেন, কি করে সামান্য উপকরণও একটি ঘরের রূপকে আমূল পাল্টে দিতে পারে।

সুবর্ণা বলল সহযোগিতা পাও ?

সব সময়ে নয়, তবে এ অঞ্চলের মানুষগুলি বেশ সহজ সরল। কোন কথা বোঝাতে গেলে মন দিয়ে শোনে।

সুবর্ণা বলল, সব সময়ে নয় কেন ?

সিস্টার মায়া বলল, একটি ছেলে ভারী সুন্দর জবাব দিয়েছিল। সে বসেছিল তার বন্ধুর বাড়ি, আমি আর মাদার গিয়ে পৌঁছলাম। বাড়ীর ভেতর ঢুকে মাদার মেয়েদের সঙ্গে ঘর গোছান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বেরিয়ে আসার সময় ছেলে দুটিকে দাওয়ায় বসে আড্ডা দিতে দেখে বললেন, তোমরাও ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে মেয়েদের সাহায্য করতে পার।

ছেলেটি অমনি বলল, পেট যখন ঠাণ্ডা থাকে তখন মন অনেক কিছু সুন্দরের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু মাদার, পেটে আগুন জ্বললে সুন্দরও পুড়ে বীভৎস হয়ে যায়। এদের পেটে এখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ঘর গোছানোর চিন্তা মগজে নেই।

মাদার সেদিন ছেলেটির সঙ্গে কোন তর্ক করেন নি। শুধু বলেছিলেন, এটা তোমার বাড়ি ?

হ্যাঁ।

মাদার চলে আসছিলেন, ছেলেটি পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এসে বলল, লোকে যাকে নিজের বাড়ী বলে, সে অর্থে এ বাড়ী আমার নয়। তবে এটা বন্ধুর বাড়ী, তাই নিজের বাড়ীর সঙ্গে এর কোন তফাৎ দেখি না।

মাদার হাসলেন, এবারও কিছু বললেন না। পথে আসতে আসতে আমার দিকে তাকিয়ে এক সময় হঠাৎ বললেন, ছেলেটি পেটের আগুনের কথা বলল, কিন্তু ওর মনেও দারুণ একটা আগুন রয়েছে। ও আমার সমস্ত চিন্তাটাকেই নাড়া দিয়ে দিলে।

সুবর্ণা বলল, অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে তো।

সিস্টার মায়া বলল, ছেলেটি সম্বন্ধে আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, ভূ-ভারতে ওর কেউ কোথাও নেই। আর

গাঁয়ের সব মানুষের হৃদয় জুড়ে রয়েছে ছেলেটি। একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলতো, তোমরা যে ওকে ভালবাস, কি গুণ আছে ওর?

মেয়েটি বলেছিল, কোন্ গুণটা ওর নেই, তাই বল? ওর মত মাটি চষতে, ঘর ছাইতে, গাছে উঠতে, তীর ছুঁড়তে কেউ পারে না। তাছাড়া নিজের ক্ষেতের ফসল গাঁয়ের অভাবী লোকদের ভেতর বিলিয়ে দেয় সে। সারা বছর নিজে কিন্তু এর ওর বাড়ী ঘুরে ঘুরে খায়। যেদিন যে বাড়ীতে ভোজন সেদিন সে বাড়ীতেই শয়ন। কারু ঘরে হঠাৎ কোন মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিল, ডাক্তার চাই, বেরুল ছেলেটি। রাত যত গভীরই হোক, এক ফোঁটা ভয়ডর নেই। কাউকে তার কষ্টের সংগী করবে না, নিজেই যাবে। আর সে বেরোলে সবাই জানে, ডাক্তার একজন আসবেই। এখন বল ওকে ভাল না বেসে কে পারবে। ও সারা গাঁয়ের বুকে বল।

সুবর্ণা বলল, অসাধারণ!

সিস্টার মায়া বলল, আরও খবর আছে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা।

কি রকম?

বর্ষাকালে একদিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমি একাই এসে-ছিলাম গাঁয়ে কিছু গুঁড়ো দুধ বিলি করতে। বৃষ্টি হতে খানিক সময় আটকে পড়লাম। এদিকটাতে যেমন বৃষ্টি হলেই জলটা সঙ্গে সঙ্গে বালির ভেতর চলে যায়, গাঁয়ের রাস্তাতে ঠিক তা হয় না। বেশ আঠালো এক ধরনের কাদা জমে যায় পথে। আমি একটি বাড়িতে বসেছিলাম। সেখানে বড়োসড়ো এক নেতাও বসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা নিজের কানে শুনতে। সে সব কথা তাঁকে মন্ত্রী পর্যায়ে রিপোর্ট করতে হবে। তাঁর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, কিন্তু ফেরার সময় বৃষ্টি বাদ সাধল। এসেছেন একখানা গাড়ী করে, এখন কাদা রাস্তায় গাড়ী পার করা কিছুটা মুশকিল বইকি। তিনি তাড়াতাড়ি কাদা রাস্তার ওপর দিয়েই গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ড্রাইভারকে বলছিলেন, কারণ তাঁকে নাকি জরুরী কাজে এখুনি শহরে যাবার জন্যে ট্রেন ধরতে হবে। ড্রাইভার রাস্তায় নেমে বৃষ্টির ভেতর পা টিপে টিপে মাটি পরীক্ষা করছিল। তবে মুখে সম্মতির ছাপ ছিল না।

একটু পরেই বৃষ্টি থামল। তড়িঘড়ি করে উঠলেন ভদ্রলোক। আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতা করে বললেন, আপনি তো খেয়াঘাট পার হবেন, চলুন ঐ পর্যন্ত আপনাকে লিফ্‌ট্ দিচ্ছি।

একটুখানি ইতস্তত করে উঠলাম ওঁর গাড়ীতে। রাস্তার অবস্থা খুব ভাল মনে হচ্ছিল না। গাড়ী চলল গড়িয়ে। কিছু পথ এসেই গ্রামের প্রান্তে একটা বটগাছের তলায় গাড়ীর চাকা গেল নরম মাটিতে বসে। অনেক তর্জন গর্জন করেও কিন্তু চাকা আর উঠল না।

স্থবর্ণা বলল, দারুণ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার।

সিস্টার মায়া বলল, শোনই না শেষটুকু। ঐ বটগাছের তলায় চণ্ডীর মণ্ডপ। চালাঘরের নীচে দাওয়ায় বসে ক'টা ছেলে তাস খেলছিল। তারা আড়চোখে ব্যাপারটা দেখে আবার তাসের দিকে মন দিল। গাড়ির ব্যাপারে কোন রকম গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হল না।

ভদ্রলোক মনে মনে খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে চুপি চুপি বললেন, ওয়েস্টেজ অব এনার্জি। যুবক ছেলেগুলো তাস পিটছে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র জলে যায়।

তিনি ড্রাইভারকে পাঠালেন ওদের সাহায্য চেয়ে। ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠে এল। অমনি আমি নেমে দাঁড়ালাম গাড়ী থেকে। ভদ্রলোক কাদায় না নেমে সটান বসে রইলেন। আমি নেমে দাঁড়ানোতে একটু বিরক্তির ভাব ফোটালেন মুখে। ছেলেরা গাড়ীতে হাত লাগিয়ে ঠেলা দিলে। ভদ্রলোক সমানে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, আরো জোরে, আরও, আরও।

গাড়ীটা নরম মাটির খাদ থেকে উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ছেলেদের হাতছানি দিয়ে ডাক দিলেন। ঐ ছেলেটি এগিয়ে এল গাড়ীর দিকে। ভদ্র-লোক মনিব্যাগটা খুলতে খুলতেই বললেন, এমন যাচ্ছেতাই বৃষ্টি যে কাজকর্ম সব পণ্ড করে দিল। জরুরী মিটিংটা আর অ্যাটেণ্ড করা যাবে না মনে হচ্ছে। একটা টাকা বের করে ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, তোমরা সবাই চা খেও।

ছেলেটা হাত বাড়াল না। শুধু বলল, যান, আর দাঁড়াবেন না, এখুনি আবার সেই যাচ্ছেতাই বৃষ্টিরা এসে যেতে পারে।

ভদ্রলোক আর একটা টাকা বের করে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, মন উঠল না বুঝি, এই নাও।

ছেলেটা পা বাড়িয়েছিল চলে যাবার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল। স্পষ্ট দেখলাম, তার চোখে আগুনের শিখা! বলল, মন যাতে ভরে ওঠে তা দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক অনেক চালাক। বললেন, কোন কিছুতেই তোমাদের মন ভরান যাবে না।

ছেলেটি বলল, একটু আগে যে বৃষ্টিকে যাচ্ছেতাই বলে গালাগালি করছিলেন, দেশের হাজার হাজার মানুষ ঐ বৃষ্টির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। আপনাদের ঐ চোঁথা বুক্‌নি-সর্বস্ব মিটিংগুলোর চেয়ে ওর দাম অনেক বেশী। আর শুনুন, পাকা সড়কে পড়ার আগে ফের যদি বৃষ্টিতে গাড়ী আটকে যায় তাহলে নিজে গাড়ী থেকে নেমে ঠেলবেন। পথে দোকান পেলে ঐ টাকায় চা কিনে খাবেন, যান।

আমার তখন মনে হচ্ছিল গাড়ী থেকে নেমে যাই। ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বললেন। গাড়ী চলল এগিয়ে। হঠাৎ একটা কথা ভেসে এল কানে, লোকটার আবার মেয়েমানুষ ছাড়া চলাই হয় না।

সুবর্ণা বলল, ঐ ছেলেটাই বললে!

না, একেবারেই না, সম্পূর্ণ অন্য গলা। তখনই বুঝেছিলাম ওর মুখ দিয়ে রূঢ় কথা বেরুতে পারে কিন্তু অশ্লীল ইংগিত বেরুবে না। পরের দিন আমার অনুমান যে সত্য তা বুঝতে পারলাম।

কি রকম?

সিস্টার মায়া হেসে বলল, প্রথমে কথাটা মনে বেজেছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষাতেই রয়েছে, কোন কিছু ক্ষোভ বা গ্লানি মনে রাখতে নেই। রাতেই বিশেষ প্রার্থনায় বসে মনের গ্লানিটা মুছে ফেললাম।

পরের দিন সকালে সেবাকেন্দ্র থেকে বেরিয়েছি সেই গুঁড়ো দুধ নিয়ে অন্য একটি গ্রামের দিকে, মাঝপথে একটা শাল জঙ্গলের ভেতর থেকে ছেলেটি বেরিয়ে এল।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ও কাছে এগিয়ে এসে বলল, ক্ষমা চাইছি কালকের অশালীন মন্তব্যের জন্য।

হেসে বললাম, মন্তব্যটা আপনি নিশ্চয়ই করেন নি।

ধরুন আমিই করেছি।

বললাম, কেন নিজের ওপর দোষটা চাপিয়ে নিচ্ছেন। আপনার গলা আমার চেনা।

ছেলেটি অমনি বলল, গলা চিনলেই কি আর সব চেনা হয়ে গেল। সবাই যখন বন্ধু তখন স্বভাবগুলোও সমান হওয়াই স্বাভাবিক। তাই একজনের

বলা মানেই সকলের বলা।

বললাম, আপনার বন্ধুদের বন্ধুভাগ্য ভাল।

কেন?

আপনার মত বন্ধু পেয়েছে তারা।

ছেলেটি বলল, তা জানি না। তবে অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা করলেন কিনা বলুন?

আমাদের কিছু মনে পুষে রাখতে নেই।

অবাক হয়ে ছেলেটি বলল, সে কি কথা। তাহলে মন বলে তো আপনাদের কোন বস্তুই নেই।

কি উত্তর দেব এ কথার। চুপ করে রইলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আরও উত্তেজিত হল। আবার বলল, অন্যায়ভাবে কেউ যদি আপনাকে আঘাত করে যায় তা বলে বেমালুম তার কথা ভুলে যাবেন?

লোকটির মনে যাতে পরিবর্তন ঘটে সে চেষ্টাই করব। আর না হলে সব সহ্য করে যাব।

ছেলেটা শ্লেষের হাসি হেসে বলল, সত্যিই আপনারা সর্বংসহা।

আমি অমনি উল্টে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি হলে কি করতেন?

প্রথমে থাপ্পড় লাগাতাম! তারপর সে রুখে উঠলে লড়াই বাধত। যতক্ষণ না একটা রক্তারক্তি হয়ে ফয়সালা হয় ততক্ষণ।

হেসে বললাম, আমরা আপনাদের মত শক্তি পাই কোথা?

গলায় জোর নেই?

বললাম, গলার জোরেই কি সব কিছু জয় করা যায়?

ও বলল, জগতটার দিকে চেয়ে দেখুন, গলার জোরেই মানুষগুলো বাজীমাৎ করছে।

বললাম, আমি সে দলে নই। আর আমরা বোধহয় আমাদের আলোচনা থেকে সামান্য কিছু দূরে সরে এসেছি।

ও খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, সেজন্যে আবার ক্ষমা চাইছি।

দেখলাম, ছেলেটি যেমন শক্তিধর তেমনি ভদ্র। ওর স্বভাবের ভেতর যেন বিদ্যুৎ আর বর্ষার একসঙ্গে খেলা চলে। আমি বললাম, দেখুন ওদের হয়ে আপনি ক্ষমা চাইছেন, ভাল কথা। কিন্তু আমার মধ্যে আর এতটুকুও ক্ষোভ নেই।

ছেলেটি আর কথা বাড়িয়ে আমার পথ আটকাল না। শাল বনের দিকে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আমি হঠাৎ বললাম, আপনি তো আপনার গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি।

ও ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, কি বললেন?

কথাটা এবার ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আপনাকে গাঁয়ের প্রতিটি মানুষই ভালবাসে। সবার কাছেই আপনি প্রিয়। ঈর্ষা করার মত।

ও হেসে বলল, আপনারাও তাহলে ঈর্ষার অধীন?

বললাম, এবার আপনার কাছে হেরে গেলাম।

ও বলল, এটা কিন্তু গায়ের জোরে হারাইনি।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। তারপর যে যার পথে চলে গেলাম।

সুবর্ণা বলল, ছেলেটির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, বেশ মার্জিত আর শিক্ষিত।

সিস্টার মায়া বলল, প্রায় বছর বার তেরোর সময় ও গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাইরে মফঃস্বল টাউনে লেখাপড়া শিখে গাঁয়ে ফিরে এসেছে কিছুকাল হল। তার পরেই গাঁয়ের ব্যাপারে ডুবে গেছে।

সুবর্ণা হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। সে বলল, আচ্ছা, কি নাম বলতো ছেলেটির?

রাজারাম মণ্ডল। সবাই ওকে রাজু বা রাজা বলেই ডাকে।

সুবর্ণার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। তার 'রাজা', তার 'রাম' আজ গাঁয়ের এতবড় মানুষ হয়ে উঠেছে। তার চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল এল। সে সামান্য অজুহাতে আড়ালে গিয়ে চোখের জল মুছে এল।

সিস্টার মায়া বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভাল লাগল।

আমারও। এখানে প্রায় আট দশ বছর পরে এলাম। বড় একা একা যখন মনে হচ্ছিল তখন তোমাকে সঙ্গী পেয়ে গেলাম মায়া। প্রথম দিনেই তুমি আমার মন ভরে দিলে। আর ঐ ছেলেটি সম্বন্ধে দারুণ সব ইণ্টারেষ্টিং কথা শোনা গেল। আচ্ছা ছেলেটির বাবা মা কি নেই? তুমি যে বলেছিলে ভূ-ভারতে ওর কেউ নেই?

আমি যতদূর শুনেছি, ছেলেটির কেউ নেই। মা বাবা মারা গেছেন।

সুবর্ণার চোখের ওপর অনেক ছবিই ভেসে উঠল। কিন্তু সে রাজার ব্যাপারে আর কোন কথাই জানতে চাইল না সিস্টার মায়ার কাছে। তার যতটুকু জানার ছিল, আপাতত তা জানা হয়ে গেছে। সে নিজের সঙ্গে রাজার সম্পর্কের কথাও আর কোন প্রসঙ্গে তুলল না।

সিস্টার মায়া বলল, আজ বেলা বাড়ল, পাশের গাঁয়ে আর যাওয়া হয়ে উঠবে না।

সুবর্ণা বলল, খুব অন্যায় হয়ে গেল কিন্তু।

কেন?

তোমাকে এতক্ষণ আটকে রাখলাম। তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটালাম।

হেসে বলল সিস্টার মায়া, আক্কেল আজ প্রথমেই আমার পাত্র ভরে দিয়েছেন। তাই বেশী লোভ আর নাই বা করলাম।

মায়া উঠে দাঁড়াল। চলে যাবার আগে বলল, সুবর্ণা একদিন এসো আমাদের সেবাকেন্দ্রে। তোমাকে পেলে সবাই খুশী হয়ে উঠবে, আর তোমারও পরিবেশটা পছন্দ হয়ে যেতে পারে।

নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। তবে তোমাকে কোন সময়ে ঠিক কেন্দ্রে পাওয়া যেতে পারে?

সকালে আমি বেরোই ভাই। দুপুরের পর আমাকে রোজই ওখানে পাবে।

মায়া চলে গেলে সুবর্ণা ভাবতে লাগল। রাজার কথা, রাজার মায়ের কথা ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল তার। একবার যে করেই হোক তাকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাজা কি তাকে চিনতে পারবে! চিনলেও সে কি সেই কিশোরবেলার সম্বন্ধটাকে স্বীকার করে নিতে পারবে। আবার অভিমান এল, যদি সে তাকে দেখেও এড়িয়ে চলে তাহলে সে কি করবে? না, সেও তাহলে তার আত্মমর্যাদা হারিয়ে রাজার সঙ্গে তার পূর্ব সম্বন্ধ ঝালাই করে নিতে এগোবে না।

এসব কথা ভেবেও কিন্তু সুবর্ণা শেষ অব্দি রাজার সঙ্গে দেখা করার কথাটাই স্থির করল। সে একদিন বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবে গাঁয়ের ভেতর। সেখানে রাজার সঙ্গে দেখা হলেও হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, রাজাদের সেই বনের ধারের ঝোপড়িটা কি এখনও রয়েছে? একদিন ওখানে খোঁজ নিলে কেমন হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে সবাই যখন বিশ্রামের জন্যে তৈরী তখন সুবর্ণা চলল ঘুরে বেড়াতে। মিঃ বোস দেখলেন, সুবর্ণা নদীর দিকে চলেছে, তিনি তাকে কোন প্রশ্ন করলেন না। চিরদিনই স্বাধীনভাবে চলার অলিখিত অনুমতি দিয়েছেন মেয়েকে। এখন সে আর ছোটটি নেই, সুতরাং সামান্য লক্ষ্য নজর দেবার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেন না।

সুবর্ণা নদীর চর ধরে বনের দিকে চলল। রোদ্দুরটা ভারী মিঠে লাগছে। অঘ্রাণে গ্রাম বাংলায় শিরশিরে একটা শীতের আমেজ। সুতীর কাজকরা একখানা র‍্যাপার গায়ে আলতো করে জড়িয়ে নিয়ে চলছিল সুবর্ণা। সুন্দর দেহ আর আকর্ষণীয় মুখের জন্য সুবর্ণা বন্ধুদের দীর্ঘশ্বাস আর বান্ধবীদের ঈর্ষার কারণ হয়ে আছে। কিন্তু সুবর্ণাকে সকলে ভালবাসে তার অকৃত্রিম আচরণের জন্য। সে বন্ধুদের সামান্য কথাও গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। উত্তর দেয় সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে। তার হৃদয়ের উদ্দামতা আছে কিন্তু অশোভনতা নেই।

সুবর্ণা বনের কাছে এসে পৌঁছাল। ঢুকল বনের ভেতর। এখন বন প্রায় রিক্ত-পত্র আর মন সঙ্গ-প্রত্যাশী। সেই শিমুলের গাছটি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ফুলে ফুলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের রক্তপ্রলাপ নেই। সুবর্ণা কিছুক্ষণ দাঁড়াল শিমুল গাছটার তলায়। ভাবতে ভাবতে তার এক সময় মনে হল, সে সেই কিশোরী সুবু হয়ে গেছে আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র শিমূলের ফুল। মগডাল থেকে ফুল ভেঙে ভেঙে মাটিতে ফেলছে একটি কালো সুঠাম কিশোর।

আবার নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সুবর্ণা। তার চোখের সামনে এখন একটিও ফুল নেই। মুখে ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। যখন সে অজস্র ফুল পেয়েছিল তখন তার ফুলের মর্যাদা বোঝার মত বয়েস হয়নি আর এখন তার সারা মন প্রার্থিত পুরুষের হাত থেকে শুধু একটি ফুল পাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।

সুবর্ণা রিক্ত বনের শুকনো পাতা মাড়াতে মাড়াতে এক সময় বন পার হয়ে এল। আশ্চর্য, এখনও সেই ঘরটি রয়েছে। বরং সযত্ন একটা খড়ের ছাউনি পড়েছে তার ওপর। আরও একটা নতুন জিনিসের সংযোজন হয়েছে। বাঁশের তৈরী একটা সিঁড়ি প্রবেশ পথের গায়ে লাগানো।

সামনে ঢেউ খেলানো অবারিত প্রান্তর। এখন সূর্যের সোনা শুষে নিয়ে পাকা ধানের বিপুল সম্ভারে গর্বিত পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে।

কেউ কোথাও নেই। ক'দিন পরেই শুরু হয়ে যাবে ফসল কাটার কাজ। তখন ঘুমিয়ে থাকা মাঠ জেগে উঠবে। কাস্তের হিস্ হিস্ আওয়াজে, কর্মব্যস্ত সারি সারি মানুষের অবনমিত দেহের সঞ্চালনে, মাঝে মাঝে তামাকের ধোঁয়ায়, টুকরো টুকরো সংলাপ আর গানের কলিতে শুরু হয়ে যাবে ফসল ক্ষেতের নাটক। জোতদারের খামারে খামারে গড়ে তোলা হবে চাষীর বুকের রক্তে তৈরী আসলী সোনার পাহাড়।

ছ'চোখ ভরে সুবর্ণা চেয়ে দেখল সোনালী শাড়ীতে জড়ানো মা ধরিত্রী হেমন্তের অলস অপরাহ্নে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল, এই নিস্তব্ধ প্রহরে রাজা যদি তার কাছে থাকত তাহলে সে পৃথিবীতে নিজেকে সবচেয়ে সুখী বলে মনে করত।

সুবর্ণার অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এই জায়গাটির ভেতর। তারা রাম-সীতা সেজে দিনের পর দিন ছপুরের রোদ অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়িয়েছে। সামান্য তীর ধনুক নিয়ে কি অসামান্য লক্ষ্যভেদ করতে পারত রাজা। শেষ দিন যখন তাকে এই বনের ধার থেকে চলে যেতে হল, তখন ক্ষিপ্ত কিশোর রাম বাণ ছুঁড়ে মেরেছিল রাক্ষসরূপী সেপাইকে লক্ষ্য করে। তার পরের পরিণতির কথা ভাবলে বুকখানা আজও টনটন করে। যখন ওরা ঐ কিশোর ছেলেটির মাথায় লাঠির ঘা বসিয়েছিল, আর দরদর করে ঝরে পড়েছিল রক্ত তখনকার ছবি নিজের চোখে না দেখলেও কল্পনা করে নিতে কষ্ট হয় না সুবর্ণার। সেদিন সে যদি বনের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে না যেত তাহলে এতখানি নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হত না রাজাকে।

সুবর্ণা পায়ে পায়ে ঝোপড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। সে ঐ ছোট্ট ঘর-টুকুর ভেতর উঁকি দেবার প্রলোভন জয় করতে পারল না। সিঁড়ি বেয়ে একটুখানি ওপরে উঠে সে মুখ বাড়িয়ে একেবারে চমকে উঠল। রাজা শুয়ে আছে, খড়ের উপরে একটা পাতলা কাঁথা বিছানো। তার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে রাজা। সে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে, শব্দ হয়েছে বাঁশের তৈরী সিঁড়িতে, তার একটুও কোন ছোঁয়া লাগেনি রাজার নিশ্ছিদ্র ঘুমের ভেতর।

সুবর্ণা ঘরের ভেতরে ঢুকতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করছিল। হঠাৎ তার অবাক লাগল কিশোরী সুবুর কথা মনে পড়ায়। সুবু প্রথম দিনটিতেই পাকা গিন্নীর মত এই ছোট্ট ঘরে পা ছড়িয়ে বসে রাজাকে বর-বউ খেলার জন্যে অসংকোচে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সত্যি, কিশোর জীবনটা কত সুন্দর। এ জীবনের সঙ্গে তার কত তফাৎ। এখন নিজেকে নানা আবরণে শুধু ঢেকে রাখার যন্ত্রণা আর তখন নিজের সব আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু ছড়িয়ে বিলিয়ে দেবার আনন্দ।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে সুবর্ণা কিশোরী সুবু হয়ে গেল। সে হাত বাড়িয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল ঘুমন্ত রাজার পায়ে।

প্রথমে পাটা টেনে নিল রাজা। তারপর আচমকা উঠে বসে ছ'হাতের

আঙুলে চোখ ঘষে নিয়ে তার ঘুমের বিঘ্নকারী ব্যক্তিটির দিকে তাকাল।

রাজার চোখে এখন দারুণ সংকোচ আর বিস্ময়। সে চিনতেই পারল না আট দশ বছর আগেকার সেই খেলার সাথী মেয়েটিকে। কে এই তরুণী! এমন নিবিড় নির্জনতায় কি করেই বা তার আবির্ভাব ঘটল।

রাজার চোখে প্রশ্নের ছবি ফুটে উঠতে দেখে সুবর্ণার মুখে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রাজা, সুবু! কি আশ্চর্য!

আমি তো সুবু নই, আপনি ভুল করছেন।

বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজা সুবর্ণার হাত ধরে টান দিলে ভেতরে।

আরে পড়ে যাব, পড়ে যাব, উঠছি উঠছি।

কে শোনে কার কথা। রাজা হাঁটু ভেঙে বসে দু'হাত বাড়িয়ে প্রায় ঘরের ভেতরে তুলে আনল সুবর্ণাকে।

তুমি কি আমাকে সুবু পেলে নাকি?

না না, সুবু হতে যাবে কেন, তুমি সুবুর দিদিমা।

সুবর্ণা অমনি বলল, তুমি বুঝি রাজা ছেলেটার দাদামশাই?

এবার সব সংকোচ কোথায় ভেসে গেল। দুজনে দুজনকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে হো হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে পরস্পর পরস্পরকে একটুখানি দেখে নিল।

রাজা বলল, কেমন দেখছ আমাকে?

সুবর্ণা বলল, হাত দেখে বলব না মুখ দেখে?

বলই না।

আগের চেয়ে মনে হয় দস্যুবৃত্তি অনেক পরিমাণে বেড়েছে।

এবার হা হা করে হেসে উঠল রাজা।

সুবর্ণা বলল, বন না থাকলে নদী পেরিয়ে তোমার হাসির আওয়াজ গিয়ে পৌঁছত একেবারে পাহাড়ের কোলের সেবাকেন্দ্রে।

চেন নাকি ঐ দিশি মেমসাহেবকে?

কই, চিনি না তো।

রাজা বলল, চিনবে চিনবে, ও নিজে এসেই তোমাকে চিনিয়ে দিয়ে যাবে।

তাই নাকি? সে আবার কি রকম?

বুঝবে, যখন চাঁদার বইখানা নাকের ডগায় তুলে ধরবে।

ধরা হয়ে গেছে।

রাজা বলল, তাহলে চেনাও তো হয়ে গেছে।

আমার তো বেশ ভাল লাগল। সিস্টার মায়া খুব মিশুকে। আর সে তো একটা যুবক ছেলের প্রশংসায় পাগল।

রাজা বলল, এটা কি খুব প্রশংসনীয় খবর? বিশেষ করে সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গকারিণী এক মহিলার পক্ষে।

সুবর্ণা আঙুল নেড়ে নেড়ে বলল, তুমি মায়া সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বলতে পারবে না, সে আমার বন্ধু।

বুঝেছি, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটেছে।

কি রকম?

তুমি বড়লোক আর মায়া মেমসাহেব গরীবের বন্ধু।

সুবর্ণা বলল, ভারী অদ্ভুত কথা, এতে মিল হল কি করে? এ তো পুরোপুরি গরমিলের ব্যাপার।

রাজা বলল, নাঃ, তুমি সেই সুবুই থেকে গেছ। তোমার মগজও একেবারে অবিকৃত থেকে গেছে।

আমাকে বুঝিয়ে দেবে তো?

রাজা বলল, বড়লোক বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোটের গুদাম তৈরী করে আর গরীব লোক না খেতে পেয়ে মনের মধ্যে আগুন জ্বালে। কিন্তু তোমার ঐ সেবাব্রতী মেমসাহেবের দল খয়রাতির জল ঢেলে সেই আগুন নেভান। বাইরে থেকে দেখলে ওঁরা গরীবের বন্ধু, কিন্তু বিচার করে দেখলে ওঁরা গরীবের অপকার করে বড়লোকদেরই সুবিধে করে দেন। তাই বলছিলাম তোমাদের বন্ধুত্ব খুব স্বাভাবিক।

সুবর্ণা উত্তেজিত গলায় বলল, ওঁরা যখন অপুষ্ট কচি ছেলের মুখে দুধ তুলে দেন, তখন নিশ্চয়ই আগুনে জল দেন না।

রাজা বলল, আমার পুরো কথাটাই তুমি ধরতে পারনি। ছোট ছেলেটা দুধ খেতে না পেয়ে মায়ের কোলে ঢলে পড়বে যখন কেবল তখনই আগুন বেরোবে মায়ের চোখ দিয়ে। সেই আগুনে একদিন পুড়বে তোমাদের গোলা, পুড়বে তোমাদের সাজান ড্রইংরুম।

সুবর্ণা একটু চুপ করে থেকে বলল, পুড়ুকগে।

রাজা বলল, চমৎকার। এটা তোমার মুখের কথা না মনের কথা, সুবু?

আমি না ভেবেই কথাটা বলেছি রাজা। তবে এটুকু কথা দিতে পারি, বাবার এই খামারবাড়ীর উত্তরাধিকার যদি কোনদিন আমার হাতে আসে

তাহলে আমি তা তোমার ঐ গরীবদের হাতেই তুলে দেব।

রাজা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, গরীবরা তোমার ও দান চায় না স্বু, তারা তোমার হৃদয় চায়। তাদের সংগ্রামে যদি কোনদিন বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়াতে পার তাহলেই তারা লাভবান হবে।

একটু থেমে রাজা হেসে বলল, নিজের ঘরে নিয়ে এসে তোমাকে তত্ত্বকথা শোনাচ্ছি, তাই না স্বু ?

স্বর্ণা অমনি বলল, বারে, তুমি আবার আমাকে আনলে কোত্থেকে, আমি তো নিজেই এসেছি এ ঘরে।

রাজা বলল, দাঁড়িয়েছিলে তো সিঁড়ির ওপর দরজার বাঁশ ধরে। উঠতে ভরসা হয়নি ওপরে। আমি টানলাম, তাই উঠলে। নিজের থেকে তো উঠে আসনি।

স্বর্ণা বলল, তোমার সঙ্গে কথায় পারব না রাজা। আচ্ছা, তুমি তো আগে খুব চুপচাপ থাকতে, হঠাৎ এত কথা শিখলে কোত্থেকে ?

রাজা স্বর্ণার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, স্বু, চিরদিন কেবল তোমরাই কথা বলবে, আমরা বলব না ?

স্বর্ণা বুঝল বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে রাজার ভেতর। সে এখন এক-বচনে কথা বলতে চায় না, তার কথা বহুবচন দিয়ে। সে সিস্টার মায়ার কাছে ক্ষমা চাইতে যায় সবার প্রতিনিধি হয়ে। রাজা এখন একা নয়, সে ছড়িয়ে পড়েছে সবার ভেতরে।

স্বর্ণা রাজার দিকে তাকিয়ে যেন নতুন করে তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল। সে রাজার কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসল।

রাজা এবার সহজ হল। বলল, কবে এলে ?

স্বর্ণা বলল, এই ক'দিন হল। এসে অব্দি শুনছি তোমার গুণপনার কথা।

কারা আমার পেছনে লেগেছে বলতো ? জানতে ইচ্ছে করে।

তোমাদের ঐ মায়া মেমসাহেব।

রাজা বলল, আমি তো জানতাম মায়া মেমসাহেব কেবল ছোটদের পেছনেই লাগেন।

মুখ টিপে হাসল স্বর্ণা। বলল, মায়া মেমসাহেব হয়ত তোমাকে ঐ দলের বলেই ভেবেছে।

রাজা বলল, একজন বয়স্কা মহিলা সব সময় আমাদের মত তরুণদের ছেলেমানুষ বলেই ভাবেন।

রাজার কথায় খিল খিল করে হেসে উঠল সুবর্ণা। বলল, আমার বন্ধুর বয়স নিয়ে বাজে কথা বলবে না রাজা। আর বিশ্বাস কর, সিস্টার মায়া দারুণ গুণগ্রাহী। রাজা বলল, ওদের কাজকর্মের আমি সমালোচনা করতে পারি কিন্তু মায়া মেমসাহেবকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি সুবু। চলাফেরায়, কথা বলায় একটা বলিষ্ঠতা আছে। প্রায় আমাদেরই বয়েসী কিন্তু মুখের ভেতর আশ্চর্য একটা সংযমের ছবি ফু:ট ওঠে।

সুবর্ণা বলল, বাস্ বাস্ আর বেশী নয়। সব বিষয়ে দেখছি তোমার খুব উন্নতি হয়েছে, শুধু একটা বিষয় ছাড়া।

রাজা বলল, কি রকম?

সুবর্ণা বলল, একটি মেয়ের সামনে যে আর একটি মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, সে বুদ্ধিটাই কেবল হয়নি।

রাজা আবার হাসল। বলল, তোমার রাজা ঠিক আট বছর আগের সেই বোকারামই থেকে গেছে।

সুবর্ণা এবার অন্য প্রসঙ্গে এল, দেখ রাজা, এমন একটা সময়ে এলাম যে তোমার হাত থেকে লাল শিমুলের ফুল পাবার কোন উপায় নেই। শুধু শিমুল নয়, সারা বনটা একেবারে রিক্ত হয়ে গেছে।

তুমি লাল রঙ খুব ভালবাস দেখছি।

সুবর্ণা বলল, ফুলের বেলা লালের দিকেই আমার ঝোঁক বেশী।

রাজা যেন একটু অন্যমনস্ক হল। এক সময়ে আপন মনে বলে উঠল, লাল যে আমাদের রক্তের রঙ। আমাদের হৃদয়ের রঙও লাল।

একটু থেমে হঠাৎ বলল, ফুল তো তোমাকে দিতে পারব না, চাইলে জবা-ফুলের মত খানিকটা লাল রক্ত ঢেলে দিতে পারি।

কথাগুলো যখন বলছিল তখন কেমন যেন গভীর শোনাল ওর গলার স্বর। এ যেন অন্য রাজা। একটু আগের সে তরুণটি নয়।

সুবর্ণা ওর হাত ধরে বলল, তুমি এমন করে কথা বলছ কেন রাজা। ফুলের কথাটা মনে পড়ল তাই বললাম। আমি আমার কিশোর বেলার বন্ধুর কথা ভুলতে পারিনি বলে দেখা করতে এসেছি।

রাজা সুবর্ণার ধরে থাকা হাতখানার ওপর তার বাঁ হাতখানা চেপে রেখে বলল, তোমাকে শেষ সেই যে বাসস্ট্যাণ্ডে ফুল দিতে গিয়েছিলাম, সে কথা আজও ভুলতে পারিনি সুবু।

আমি বুঝি ভুলতে পেরেছি? সেদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায় তুমি যখন

রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটছিলে তখন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।

রাজা বলল, আমার মনে আছে সকালের দিকে জ্বর ছেড়ে গেলে আমি মায়ের মুখে শুনলাম, তোমরা তার পরের দিনই চলে যাচ্ছ। আমি জানতাম, তোমাদের বাস কখন ছাড়বে। পরের দিন মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে শালবনের ভেতর গিয়ে পলাশ ফুল পেড়ে আনলাম। ঐ পথে বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে তোমাকে পেয়ে গেলাম। ভাগ্যিস তখনও বাসটা ছেড়ে দেয়নি। আমি ফুল দিয়ে আর দাঁড়াতে পারিনি, মায়ের উদ্বেগের কথা ভেবে ছুটে চলে এসেছি।

তোমার মার কাছে সেদিন নিশ্চয় ফিরে গিয়ে খুব একচোট বকুনি খেয়েছিলে?

একটুও না। শালবনে আমাদের খেলার কথা মাকে বলেছিলাম। তাই আমি যখন ফুল নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটে চলেছিলাম তখন মা ঘরে বসে দেখেছিল কিন্তু হাঁকডাক করে আমাকে বাধা দেয়নি। ফিরে গেলে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে, সুবুকে ফুল দিতে পারলি?

সুবর্ণা বলল, মাসীমার কথা আমি ভুলতে পারিনি রাজা। আমি রাতে তোমাকে দেখে ফিরে আসার সময়ে মাসীমা আমাকে ধরে চুমু খেলেন। তাঁর সেই স্নেহের উত্তাপ অনেক দিন আমার শিশু মনে লেগেছিল। তাছাড়া তাঁর কথাবার্তার ভেতর বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আমি সেই কিশোর বয়সেও লক্ষ্য করেছিলাম।

রাজা বলল, আমার জীবনের মোড় আমার মা-ই ঘুরিয়ে দিয়েছে সুবু। আজ যদি আমি আমার দেশের মানুষের কথা ভাবতে শিখে থাকি তাহলে সে মন আমার মা-ই আমাকে দান করে গেছে।

সুবর্ণা বলল, তুমি কিছু মনে করো না রাজা, তোমার মায়ের আকৃতি, আভিজাত্য আর আচরণ দেখে আমার কিন্তু ওঁকে ঘাটমাঝির ঘরের কোন মেয়ে বলে মনে হয়নি।

রাজা বলল, আমার মা ঘাটমাঝিরই স্ত্রী ছিল, কিন্তু তার পেছনে আশ্চর্য একটা ইতিহাস পরে আমি জেনেছিলাম।

সুবর্ণা বলল, তাঁর কথা শুনতে আমার দারুণ আগ্রহ। অবশ্য যদি তোমার বলতে কোন বাধা না থাকে।

রাজা মাথা নীচু করে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল। তারপর এক সময় মাথা তুলে বলল, তুমি কি জান আমার মা বাবা দুজনেই আর নেই?

সিস্টার মায়ার কাছ থেকে সেই কথাই শুনেছি।

রাজা বলল, তোমার অনুমান মিথ্যে নয় সুবু। বাবা আমার সামান্য ঘাটমাঝির ছেলে হলেও মা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা পরিবারের মেয়ে। শিক্ষিত এক দেশব্রতী পরিবার থেকেই মা এসেছিল। সন্ত্রাসবাদীদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মা এ অঞ্চলে এক সময়ে এসে পড়ে। তারপর আত্মগোপনের কোন উপায় না পেয়ে আমার সহজ সরল মাটির মানুষ বাবার শরণাপন্ন হয়। বাবা তাকে কিছুদিন ঐ ঘটমাঝির সামান্য ঝোপড়িতে লুকিয়ে রাখে। সে সময় একই ঘরের ভেতর একটি পুরুষ আর নারী দিনের পর দিন কাটায়। তুমি একজন তরুণী হিসেবে অনুমান করতে পার, তার পরিণতি কি হতে পারে। কিন্তু না, আমাদের কোন অনুমানই বাবা মা সম্বন্ধে সত্য নয়। আমি পরে বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম, একজন ঘাটমাঝির চরিত্রবল নাকি মাকে বিস্মিত আর মুগ্ধ করে। মা বিনা দ্বিধায় স্বামী বলে গ্রহণ করে আমার বাবাকে। স্বামী ক্ষুদ্র কাজ করে বলে কোনদিন কোন বিকার তার ভেতর দেখা যায়নি। বাবাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা শ্রদ্ধা ভালভাসা জানিয়ে গেছে।

সুবর্ণা বলল, সত্যি, অসাধারণ চরিত্র তোমার মায়ের। আচ্ছা, তোমার মা মারা গেলেন কবে ?

তুমি সেবার এখান থেকে চলে গেলে ঠিক তার কয়েক মাস পরেই মা মারা যায়। একটু থেমে অদ্ভুত একটা কণ্ঠস্বরে বলল রাজা, আমার মাকে হত্যা করা হয় সুবু।

হত্যা! কে হত্যা করেছে।

মানুষের ভেতর যে জানোয়ার বাস করে, তাদেরই কয়েকটা একদিন আমার মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

একটা অর্ধস্ফুট আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল সুবর্ণার গলা দিয়ে, কি বলছ রাজা!

রাজা তখন অন্য মানুষ। জগতের কোন কিছুই যেন তার কানে পৌঁচচ্ছে না। সে একই কণ্ঠস্বরে বলে চলল তার নির্যাতিতা মায়ের কথা।

সেদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন অনেক রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, পাশে মা নেই। আমি উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দেখলাম, মা এল না, তখন ঘরের বাইরে এলাম। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন। আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাবাকে বেঁধে

রাখা হয়েছে পাকে পাকে। তার মুখে কিছু গুঁজে দিয়ে বাক্‌রোধ করা হয়েছে।

আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তারপর ঐ বিদ্যুতের আলোয় বাবার বাঁধন খুলে বাবাকে মুক্ত করলাম।

ছাড়া পেয়েই বাবা মায়ের নাম ধরে আর্ত চীৎকার তুলে বৃষ্টির মধ্যেই নদীর তীর ধরে ছুটতে লাগল। আমিও বাবার পেছন পেছন ছুটে চললাম।

বিদ্যুতের চমকে সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এক জায়গায় বাবা থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখে নিল। তারপর চীৎকার করতে করতে ছুটল নদীর কিনারার দিকে, আমিও কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম সেদিকে।

মায়ের জানু থেকে পাটা পড়েছিল জলের মধ্যে। দেহের বাকী অংশ পড়েছিল ডাঙায়।

বাবা মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে আনল। অনেকক্ষণ পরে থেমে থেমে ক্ষীণ গলার একটা আওয়াজ শোনা গেল, কুকুরগুলো আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। আমার আর কিছু নেই।

কতক্ষণ আবার একটা মৃত্যুর মত নিঃসাড় অবস্থা। হঠাৎ নিভু নিভু দীপটা দপ্ করে জলে উঠল। মা বলতে লাগল, আমার শরীর থেকে যত রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে তার প্রতিটি বিন্দু থেকে জন্ম নেবে আগুনের মত এক একটি সন্তান। তারা প্রতিশোধ নেবে। সব ধর্ষিতা মায়ের হয়ে তারা প্রতিশোধ নেবে। তুমি আমার দেহ রাজাকে ছুঁতে দিও না, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি। তুমি আমাকে জান, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

বলতে বলতে মা আমার নিভে গেল। চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল আমার মায়ের গলার স্বর। বাবা পাগলের মত সেই ঝড়ের রাতে মায়ের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে আক্ষেপ জানাতে লাগল।

রাজা আর কথা বলতে পারছিল না। স্বর্ণা বলল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না রাজা। শুধু তুমি আমাকে বল, কারা জঘন্য এই পাপ করে গেল?

যারা চিরদিন রক্ষকের পোশাকে নিজেদের পশু-দেহগুলোকে ঢেকে রাখে তারাই রাতের অন্ধকারে নিজেদের চেহারাগুলোকে প্রকাশ করেছে। জানো স্বর্ণ, জানোয়ারগুলো জানতে পেরেছিল, মা আমার কৃষক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গোপনে গভীর যোগ রেখে চলেছে, কিন্তু তারা জানতো মাকে হত্যা করলেও কোন কথা আদায় করা যাবে না। তাই এই জঘন্য কলঙ্কিত পথে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আর তারা

একথা জানত, এই পাশবিক অত্যাচারের কথা মানুষ কখনও বাইরে প্রকাশ করতে চাইবে না। তারা তাই এই পথে মাকে টেনে এনে এক সময় মৃত ভেবে নদীতে ফেলে দিয়ে পালায়। মা মনে হয় প্রবল শক্তিতে আধখানা দেহ ডাঙায় তুলে আনতে পেরেছিল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, পরে অবশ্য জ্ঞান ফিরে পায়। সে শুধু শেষ জলে ওঠার জন্যে।

এবার রাজা তার ছেঁড়া কাঁথাখানার তলা থেকে কতকগুলো পত্রপত্রিকা আর বই বের করল। সুবর্ণা দেখল ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে প্রায় দশ-বারখানা বই। পত্রপত্রিকাগুলো কৃষক-বিদ্রোহ সংক্রান্ত। বই-এর ভেতর একটি হল গোর্কীর 'মা'। রাজা কয়েকখানা বই সামনে ফেলে রেখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় পড়তে লাগল। পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মায়েরা কি রকম মহীয়সী ছিলেন, তারই বৃত্তান্তে ভরা পাতাগুলি।

পড়া শেষ হলে বলল, এই লেখাগুলো আমার কাছে এখন বেদ-বাইবেলের চেয়েও অনেক বড় জিনিস, সুবু।

সুবর্ণা বলল, এই কিছুদিন হল আমার মাও মারা গেছে রাজা। কিন্তু তোমার মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে আমার মাতৃশোক ভুলে যাচ্ছি।

রাজা সহজ হল এবার। বলল, সুবু, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। আমার মায়ের এ ধরনের মৃত্যুর খবর এ অঞ্চলের কেউ জানে না। আজ শুধু তোমার কাছে প্রাণ খুলে সব কথা জানিয়ে মনে মনে বড় শান্তি পেলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, যাক এ সব কথা, এখন বল, কতদিন আছ এখানে ?

বড় জোর আর দিন পনেরো। মা মারা যাবার পর বাবা বড় ভেঙে পড়েছে। তাই ক'দিন শান্তিতে এখানে কাটাবার জন্যে এসেছে।

রাজা একটুখানি ভেবে বলল, ক'দিন পরেই কিন্তু এ অঞ্চলটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে সুবু। তখন একটুও শান্তি থাকবে না।

কি রকম।

রাজা বলল, এই মুহূর্তে এ কথা পৃথিবীর আর কাউকে বলা যাবে না, শুধু তোমাকে বলতে বাধা নেই আমার।

সুবর্ণা বলল, আমাদের ছোটবেলার সম্পর্কটা তুমি ভুলতে পারনি আজও, তাই আমার ওপর তোমার এতখানি বিশ্বাস। কিন্তু অশান্তি কিসের রাজা ?

যদিও সেই নির্জন দ্বিপ্রহরে কেউ কোথাও ছিল না তবু রাজা গলার স্বর

অনেক নীচু করে বলল, এবার ফসল তোলার সময় বিরাট দাঙ্গা হবে। আর ক'দিন পরেই শুরু হয়ে যাবে ধান কাটার মরশুম।

দাঙ্গা কেন রাজা? যে যার ক্ষেত তো নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

রাজা বলল, তোমার হিসেবটা খুব সহজ সুবু। পৃথিবীর সব লোকই প্রায় ঐ অঙ্কটা শিখে রেখেছে। কিন্তু দু'চারজন বেয়াড়া লোক আছে যারা ঐ হিসেবটা মানে না। তারা জীবনের খাতায় অন্য রকম অঙ্কের হিসেব কষে।

সুবর্ণা বলল, সত্যি আমি অঙ্কে ভীষণ কাঁচা, আমি তোমার এই হেঁয়ালির কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাজা বলল, বড়লোকের ঘরে জন্মেছ, অঙ্কে এত কাঁচা হলে কি চলে। সম্পত্তি রাখবে কি করে?

বিশ্বাস কর রাজা, আমি অন্তর থেকে বলছি, কোনদিনই আমি ঐশ্বর্যকে ভালবাসতে পারিনি।

তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

কেন জানি না কথাটা শুনে সুবর্ণার কান্না পেল। বুক ঠেলে উঠে এল একটা দুঃখের ঢেউ। সে দু'হাতের পাতায় চোখ ঢাকল। কান্নার দমকে তার সারা শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

রাজা সুবর্ণার চুলে-ভরা মাথার দু'দিকে হাত রেখে বলল, তুমি এখনও সেই সুবুই রয়ে গেছ। একটুও বড় হওনি।

সুবর্ণা ছেলেমানুষের মত রাজার দুটো হাত টেনে নিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে অনুযোগের সুরে বলল, তুমি কেন বললে আমার কপালে দুঃখ আছে। বল কেন বললে?

রাজা অমনি বলল, আচ্ছা, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি ইন্দ্রানী হবে।

রাজার হাত ছেড়ে দিয়ে সুবর্ণা বলল, ইন্দ্রানী হবার লোভ আমাকে দেখিও না রাজা। সাধারণের একজন হয়ে যেন আমি বাঁচতে পারি, এই প্রার্থনাটুকু কর আমার জন্যে।

রাজা হেসে বলল, ভয় ছিল, বড়লোকের মেয়ে ছোটবেলার বন্ধুকে স্বীকার করে কিনা, কিন্তু তোমার কথায় সে ভয় আমার ভেঙে গেল সুবু।

সুবর্ণা বলল, আমি তোমার খোঁজ নিতে যখন এই নির্জন বনে এসেছি তখনই তোমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, সুবুর দিক থেকে কোন পরিবর্তনই ঘটেনি।

রাজা বলল, তোমাকে যত দেখছি, তোমার কথা যত শুনছি ততই হার

মানছি মনে মনে। আমার মায়ের মত তোমার ভেতর আগুন নেই কিন্তু দারুণ একটা সত্যের জোর আছে। সেই জোরে তুমি সাধারণের ভেতরে থেকেও স্বতন্ত্র।

সুবর্ণার মুখে এবার হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, প্রশংসা-বাণী আমি আর শুনতে চাই না, এখন আসল কথাটা বল, দাঙ্গা কেন?

রাজা বলল, চিরদিন মানুষকে বোকা বানান যায় না সুবু। এই যে দিগন্ত ছুঁয়ে সোনালী ফসল ঝলমল করছে, এ সোনা যারা মাটি থেকে তুলল তারা কিন্তু এর মালিক হতে পারল না। হকের ধন তুলে দিতে হল যখের হাতে। এখন আমাদের যুদ্ধ সেই যখেদের সঙ্গে। ওদের আর সোনার কেল্লা বানাবার সুযোগ দেব না।

সুবর্ণা বলল, তুমি কৃষক-বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলছ?

রাজা জোর দিয়ে বলল, এখন ওটা আর সম্ভাবনার সীমায় দাঁড়িয়ে নেই সুবু, সত্যের কোঠায় এসে পৌঁচেছে। যারা এখনও সোনার কেল্লার ভেতর প্রহরী বেষ্টিত হয়ে শুয়ে আছে তারা বুঝতে পারছে না লাল হয়ে গেছে দিগন্ত। সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে তাদের কেল্লার চূড়োয়।

সুবর্ণার গলায় শঙ্কার সুর শোনা গেল, ওরা তো সহজে ছেড়ে-দেবে না রাজা। ওদের অর্থ আর অস্ত্র দুটোই মজুদ আছে, লড়াই ওরা করবেই।

আমরা তো তাই চাইছি সুবু। বিনা লড়াইএ যা লাভ করা যায় তা কৃপার দান। তাতে সাময়িকভাবে হয়ত পেট ভরে কিন্তু অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয় না। ভিক্সনারী থেকে ঐ দান কথাটা তুলে দিতে চাই। যেখানে গরীবের জন্য যত দান আছে তার উচ্ছেদ করতে পারলেই তারা তাদের হারানো সম্মান ফিরে পাবে।

সুবর্ণা বলল, তোমরা কি দল বেঁধে জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইএ নামবে?

একেবারে সে ইচ্ছে আমাদের নেই। আমরা সবাই মিলে আমাদের সোনার ফসল ঘরে তুলব। বাধা পেলেই লড়াই বাধবে।

তোমরা তার জন্যে তৈরী?

বর্ষার মেঘ আকাশে দেখলেই লোকে বর্ষাতি হাতে নেয় সুবু। আমার মানুষদের হাতে তাই ধান কাটার কাস্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে একটি করে লড়াইএর বর্শা।

সুবর্ণা বলল, ওরা যদি বন্দুকের সাহায্য নেয়? তোমাদের হাজার বর্শার পারবে কি ওদের মোকাবিলা করতে?

লড়াই হলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে। আর চরম আঘাত পেলেই মানুষ মরিয়া হয়ে উঠবে। তাদের সংঘশক্তি তখন বেড়ে যাবে শতগুণ। আমরা লড়াইএর শুরুতে তাই চাই। অবশ্য শেষ লড়াই কি রূপ নেবে তা এখুনি বলা যায় না।

সুবর্ণা বলল, আমি একটা দারুণ সময়ে এখানে এসে পড়েছি, কি বল।

হ্যাঁ, সময়টা তোমার পক্ষে বিপদজনক।

একটুও না। বলতে পার উত্তেজনাকর।

লড়াইএর দিনে তুমি কিন্তু বেরুবে না সুবু।

একশোবার বেরোব।

বিপদে জড়িয়ে পড়তে পার।

সুবর্ণা অমনি দু'ছত্র কবিতা আবৃত্তি করল,

'বিপদ আছে জানি আঘাত আছে
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।'

রাজা বলল, উদাত্ত গলায় বিপদকে ভয় পাই না বলে কবিতা আবৃত্তি করা আর সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ান এক কথা নয়।

সুবর্ণা বলল, আমি দুটোকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করব।

রাজা বলল, দেখছি মনের জোর আছে তোমার। শুধু জোর নয়, জোরের সঙ্গে জেদও আছে।

আচ্ছা রাজা, তুমি কি করে ভাবলে আমি ভয় পেয়ে ঘরের ভেতর বসে থাকব!

আমি তা ভাবিনি। আমি শুধু তোমাকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম।

বল মনের থেকে দূরে।

রাজা বলল, এ কথা বলছ কেন?

সুবর্ণা বলল, তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও।

বল।

যে মানুষগুলো তাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করবে তারা তোমার আপনজন?

আমার রক্তের সম্পর্কের চেয়ে তারা কোন অংশে কম নয়।

সুবর্ণা বলল, তারা তোমার আপনজন বলে তাদের তুমি লড়াইএর ভেতর টেনে নিলে আর আমি তোমার কেউ নয় বলেই তুমি বিপদের অজুহাত দেখিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলে!

রাজা বলল, তর্কের দিক দিয়ে তোমার কথাটা হয়ত ঠিক কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। ওরা রক্ত ঝরিয়েছে ফসল ফলাতে, ওরা তাই একমুঠো ফসলের জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে। আর তুমি সাহসী তাই লড়াইএর পাশে এসে দাঁড়াতে চাও, কিন্তু তোমার প্রাণের সঙ্গে ফসল-ক্ষেতের কোন যোগ নেই। তাই বলছিলাম, কৌতূহল এক জিনিস আর মাটির সঙ্গে প্রাণের যোগ অন্য জিনিস। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না স্বুবু।

বেশ তোমার কথাই রাখব। একদিকে জোতদার পূর্বপুরুষের রক্তের টান, অন্যদিকে মাটির মানুষের জন্যে প্রাণের টান নিয়ে আমি লড়াইএর দিন নিজের বুকের মধ্যে লড়াই দেখব।

কথায় কথায় বেলা পড়ে এল। ধানের ক্ষেত থেকে ভরপেট খেয়ে এক দঙ্গল পাখি জোর গলায় আলাপ করতে করতে বনের দিকে উড়ে গেল।

স্বুবর্ণা বলল, আজ উঠি রাজা, আবার কাল দুপুরে আসার চেষ্টা করব।

রাজা বলল, আমার আন্তরিক নিমন্ত্রণ রইল যদিও, তবু তুমি কোন কারণে না এলে আমি দুঃখ পাব না।

স্বুবর্ণা অমনি বলল, আমার জন্যে তুমি দুঃখ পাবে এমন সৌভাগ্যের কথা আমি চিন্তা করতেও পারি না রাজা।

রাজা হেসে বলল, আমি কিন্তু তোমার ভেতর আজ সেই কিশোরী স্বুবুকে খুঁজে পাচ্ছি না। সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ সমালোচক আর পড়ুয়া একটি তরুণীকে দেখতে পাচ্ছি।

স্বুবর্ণা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে বলল, এখন তাকে পাবে কোথায়? তোমার স্বুবু মেয়েটা আট দশ বছর আগেই মারা গেছে। তার জায়গায় এখন জন্ম নিয়েছে যে তরুণী, সে স্বুবু নয় স্বুবর্ণা।

রাজা নীচে নেমে এল। এসে বলল, দেখত আমার মাথার কাটা দাগটা চিনতে পার কিনা?

ঘরের আবছায়ায় কাটা দাগটা এতক্ষণ স্বুবর্ণার চোখে পড়েনি। এখন সে রাজার মুখখানা ধরে ঐ দাগটা ভাল করে দেখতে লাগল।

মুখে অনুশোচনার শব্দ করে বলল, সত্যি, তোমাকে এ দুর্ভোগ আমার জন্যেই পেতে হয়েছিল রাজা। আমি কোনদিন সে কথা ভুলব না।

রাজা অমনি স্বুবর্ণার পান পাতার মত মুখখানা তুলে ধরে বলল, আমিই ভুল করেছিলাম। আমার স্বুবু ঠিক তেমনিই আছে।

তৃতীয় দিন দুপুরে ওরা সেই টুঙ্গি ঘরের ভেতর কথা বলছিল এমন সময় ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত লাফ দিয়ে নেমে গেল রাজা। সুবর্ণা উঁকি দিয়ে দেখল, ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে একটি সাঁওতাল যুবক ছুটে আসছে। রাজা খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। যুবকটি কাছে এলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকল বনের ভেতর। সুবর্ণা বসে আছে তো বসেই আছে। ঘণ্টাখানেক পরে রাজাকে একা ফিরে আসতে দেখা গেল। মাথাটা নীচু। গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে বলে মনে হল।

সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকল। মুখখানা থমথম করছে।

সুবর্ণা বলল, কিছু খারাপ খবর আছে বলে মনে হচ্ছে?

রাজা হঠাৎ চিন্তার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। মুখে একটুখানি হাসির ঝিলিক তুলে বলল, সব খবরই ভাল খবর, অবশ্য তাকে ঠিক মত নিতে পারলে।

সুবর্ণা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সে বলল, বাধা আছে কিছু খবরটা শোনাতে?

রাজা বলল, শত্রুপক্ষের মেয়ের কাছে সব গোপন তথ্য ফাঁশ করে দেওয়া কি ঠিক?

তাহলে বোলো না।

রাজা বলল, খবরটা সত্যিই গুরুতর। আমাদের যে চারখানা গ্রাম এই প্রান্তরটাকে ঘিরে আছে তাদের সব পরিবারই এই প্রান্তরের ধান চাষের সঙ্গে অন্নবিত্তর যুক্ত। এখন জোতদাররা একটি গ্রামের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে হাত করে নিয়েছে। তারা ধান তুলবে জোতদারদের খামারে।

বিস্ময় সুবর্ণার চোখে মুখে, তাহলে কি হবে?

এখনও কিছু ভেবে স্থির করতে পারিনি। বেশ কিছু সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম, আমাদের ঐক্যে ফাটল। তাকে রোধ করতে গেলেই দলছুটদের বোঝাতে হবে। কিন্তু হাতে সময় আমাদের নেই। ফসল কাটবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। অন্য পথ, ঐ বেয়াড়া চাষীগুলোর ফসল আগেভাগে জোর করে তুলে আনা। কিন্তু তাতে ভাঙনটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ওতে আমাদের জোর কমবে, অন্য পক্ষের জোর বাড়বে।

সুবর্ণা বলল, তাহলে উপায়?

রাজা বলল, তাইতো ভাবছি।

সুবর্ণা বলল, যদি তোমরা যে দিনটিতে ফসল কাটার কথা ঘোষণা করেছ তার আগেই তুলে নাও ফসল তাহলে ঐ দলছুটদের প্রেরণায় আর কোন চাষী

অন্ততঃ বেরিয়ে যেতে পারবে না। উপরন্তু যারা জোতদারদের খামারে ধান তোলার কথা ভাবছে, তারা যখন দেখবে সবাই যে যার ঘরে ফসল তুলল, তখন তাদেরও মনের ভেতর ভাঙন ধরতে পারে।

রাজা বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল সুবর্ণার দিকে। তার দৃষ্টি কিন্তু তখন ভাবনার গভীরে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল রাজা। বলল, জানি না সফল হব কিনা, কিন্তু সুবু, তুমি আমার ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

সুবর্ণা বলল, খবরদার আমার ভাবনার ওপর ভরসা রেখ না রাজা। আমি এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। মনে এল তাই বললাম কথাটা। তুমি নিজে ভাব। ভেবে ভেবে উপায় বের কর। যদি আমার কথাটা তোমার মনে লেগে থাকে তাহলে তাকে ভাল করে যাচাই করে নাও। নাহলে বিপদে পড়তে পার।

রাজা বলল, একটা পথ পাবার জন্যে অতিরিক্ত ভাবনা করতে নেই। কিছু চিন্তা আর তার চেয়ে অনেক বেশী প্রেরণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

রাজা কথাটা শেষ করেই দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। সুবর্ণা বলল, বুঝেছি, এখন তোমাকে চাষীদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যেতে হবে। চল, আমরা উঠি। পরে আবার দেখা হবে।

দুজনে এখন দুটো বিপরীত পথ ধরে চলল। বনের পথে ঘরে ফিরে চলল সুবর্ণা। আর রাজা চলল ধানক্ষেত চিরে চিরে দূর গ্রামের দিকে।

আজ বনের আসর ভাঙল বড় তাড়াতাড়ি। ঘরের পথে ফিরে যেতে যেতে সুবর্ণার মনটা ভারী হয়ে উঠল। রাজার দুশ্চিন্তার অংশীদার কখন যে সে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই ভাবতে পারল না।

বসুভিলার কাছ এসে তার দেখা হল কৈলাসের সঙ্গে।

কৈলাস বলল, কোথায় গিয়েছিলে রাঙা মা। বাবু তোমার খোঁজ করছিল।

কেন কৈলাস কাকা? বাবা কোথায়?

বাবু ঐ সামনের গাঁয়ে গেছে। গোবিন্দ রায়েরা লোক পাঠিয়েছিল কিনা।

গোবিন্দ রায় পাশের গাঁয়ের জোতদার না? কিন্তু তিনি হঠাৎ অবেলায় ডাক পাঠালেন কেন বাবাকে?

গোমস্তাবাবু বলছিল, ধান কাটা নিয়ে এবার একটা হাঙ্গামা হতে পারে, তাই মিটিং বসছে রায়বাবুদের কাছারীতে। সব জোতদারের ডাক পড়েছে। আমাদের বাবুও সে পরামর্শে গেছেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিক সময় কি ভাবল সুবর্ণা। সূর্যের দিকে চেয়ে দেখল, পশ্চিমের আকাশে টান নিলেও অস্ত যেতে বিলম্ব আছে। সুবর্ণা বলল, কৈলাস কাকা, এখন আমি একবার তোমাদের মায়া মেমসাহেবের সেবা কেন্দ্রে যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হলেও কিছু ভেব না যেন। সন্ধ্যের আগেই ফিরব। বাবা যদি আগে ফিরে আসে তাহলে আমার জন্যে তাকে চিন্তা করতে বারণ কোর।

উদ্বিগ্ন কৈলাস বলল, আমি না হয় তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসব রাঙা মা।

সুবর্ণা বলল, আমি এখন খুকীটি নই কৈলাস কাকা। বনবাদাড় নয় যে একজনকে সামনে আলো দেখিয়ে আর অন্যজনকে পেছনে লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে আসতে হবে! আমি একা খুব আসতে পারব।

কিন্তু রাঙা মা, বেশী দেরী হলে খেয়া তো বন্ধ হয়ে যাবে।

ওপার থেকে খেয়ামাঝিকে হাঁকডাক করে ওঠাব।

কৈলাস বলল, লোকটা গাঁজা টানে রাঙা মা। তাই সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে কোন কোনদিন ওর ঝোপড়িতে থাকলেও সব দিন থাকে না। গাঁয়ে অন্য গাঁজাখোরদের সঙ্গে মিলে কলকে টানে।

সুবর্ণা হেসে বলল, তাহলেও তোমার কিছু ভাবনা নেই কৈলাস কাকা। আমি সাঁতার জানি। দরকার হলে সাঁতরে পার হয়ে আসব।

কৈলাসের চোখ কপালে উঠল। সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কি জানি মা, কি যে ডাকাত মেয়ে হয়েছ তুমি! বাবু না ফিরে এসে আমাদের ওপর রাগ করে।

বাবা? একেবারে রাগ করবে না। বরং নদী সাঁতরে এলে একটা প্রাইজই হাতে তুলে দেবে।

কৈলাস কি বুঝল কে জানে। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। হাসতে হাসতে দ্রুত পা চালিয়ে পারঘাটের দিকে চলে গেল সুবর্ণা। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ছন্দিত লয়ে নদীর ওপারে পা ফেলে ফেলে সেবাকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে একটি মেয়ে। তার দ্রুত গমনে ছন্দপতন অথবা দেহ সুষমার কোনো হানি ঘটছে না। ধীরে ধীরে এক সময় মেয়েটি মিলিয়ে গেল শাল অরণ্যের কোলে পাহাড়ী খাদের মধ্যে।

মাদার রেবেকার সেবাকেন্দ্রে আসার তারিখ ছিল না আজ। গোপা আর নীলা নামের দুটি নান বেরিয়ে গেছে দুপুরের পর পেছনের টিলার দিকে। ওদিকটাতে শালের বন আর ছোট ছোট টিলা। চাষাভুষোর বাস নেই, কেবল ঘর কয়েক গোয়ালা ঝোপড়ি বেঁধে থাকে। গরুগুলো বনের ভেতর সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘাস পাতা খায়। গোয়ালাব মেয়েরা বেশ খানিক পথ হেঁটে গিয়ে নদী থেকে জল আনে মাথায় কবে পর পব তিন চারখানা ঘড়া বসিয়ে। জলের সঞ্চয় কাছেপিঠে কোথাও নেই। অনেক কষ্ট করে জল আনতে হয়। গোয়ালারা গরু নিয়ে নদীতে চলে যায়। জল খাইয়ে স্নান করিয়ে আনে নদী থেকে।

মেয়েরা ঘুঁটে তৈরী করে। পুরুষরা দই পেতে ছানা কাটিয়ে বড় বড় পাত্রে ভরে দূরের বাজার হাটে বেচতে নিয়ে যায়। এমনি করে ক'ঘর গোয়ালা বহুকাল বাস করে আসছে ঐ অঞ্চলে।

নানেরা যায় ওদের কাছ থেকে খাঁটি দুধটা আনতে। সেবাকেন্দ্রে সিস্টাব, নান আর কাজের দু'চারজন মেয়ে পুরুষ ছাড়া বড় একটা কেউ নেই। কিন্তু সকাল দুপুরে একপাল ছেলেমেয়ের পাত পড়ে। ওরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে পড়তে আসে। সাধারণতঃ আদিবাসীদের ছেলেমেয়ে ওবা। নানেরা ওদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায়। করুণাময় যীশুর গল্প বলে। ওরা সকালেব জলখাবার খায়।

তারপর একেবারে দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ী ফেরে। এখনও পুরোপুরি ইস্কুল ঘর তৈরী হয়নি। সেবাকেন্দ্রের দাওয়ায় বসে ক্লাশ চলে। মাদার রেবেকার ইচ্ছে আছে, একটা স্কুল-বাড়ী তৈরী করবেন এই শান্ত নির্জন নিরুপদ্রব পরিবেশে। এখানে শুধু মামুলী লেখাপড়া শেখান হবে না, হাতেব কাজ করে যাতে ছেলেমেয়েরা কিছু রোজগার কবতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। প্রসূতিবিদ্যা অর্জন করে সার্টিফিকেট পেয়েছে গোপা মেমসাহেব। গ্রামেব কোন কোন উৎসাহী মেয়ে ওর কাছ থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিদ্যেটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। এদিকে পোলট্রি তৈরী হয়েছে। ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছে নীলা মেমসাহেব।

এমনি টুকরো টুকরো কাজের ভেতর দিয়ে দরিদ্র উপায়হীন মানুষগুলোর প্রাণে একটুখানি সুস্থভাবে বাঁচার আশা যদি জাগিয়ে তোলা যায়। মাদার রেবেকার উদ্দেশ্য তাই। যদিও বড় করে কিছু গড়ে তোলায় অর্থবল নেই তাঁর তবু সৎ প্রচেষ্টার একটা মূল্য আছে। এই প্রেরণার বলেই তিনি কাজ শুরু

করে দিয়েছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা সিস্টার মায়া। এত অল্প বয়সে মায়ার নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সিস্টার মায়াকে পাশে রেখে এই কেন্দ্রটি সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

সুবর্ণাকে দূর থেকে দেকতে পেয়ে সিস্টার মায়া এগিয়ে এল। কাছে এসে দুটো হাত বাড়িয়ে সুবর্ণার দুটো হাত ধরে বলল, রোজ তোমার কথা ভাবি। প্রতিদিন আশা করে থাকি তুমি আসবে। কিন্তু বিশ্বাস কর আজই শুধু কাজের ভেতরে ডুবে গিয়ে তোমার কথা ভাবতে পারিনি। আর ঠিক আজই তুমি এসে গেলে।

সুবর্ণা বলল, তুমি যখন আমাকে মনের থেকে দূরে সরিয়ে দিলে তখনই আমি বন্ধুত্বের ছিন্নসূত্রটা জোড়া দেবার জন্যে এগিয়ে এলাম।

মায়া হেসে বলল, মোটেও কিন্তু তা নয়। প্রভু যীশু আমাকে একটি শিক্ষা দিলেন। কোন কিছুর ওপরে খুব বেশী একটা আসক্তি রাখা ঠিক নয়। বরং আসক্তি কেটে গেলে প্রার্থিত বস্তু আপনিই এসে ধরা দেবে।

সুবর্ণা বলল, প্রথম দিনটিতেই তুমি এমন আপনার জন হয়ে গিয়েছিলে যে তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রাণ চাইছিল না। তাই ভাবলাম, দু'দিন পরেই যখন চলে যাব তখন মায়ার ওপর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি।

ওরা হাত ধরাধরি করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল ফ্লোরেন্স সেবা-কেন্দ্রের সীমানার ভেতর।

সুবর্ণা বলল, আশ্চর্য সুন্দর তো এ জায়গাটা। পেছনে টিলা আর শালবন, সামনে উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো প্রান্তর। দূরে সোনালী বালুর পাতের ওপর রুপোলী কাজ করা নদী। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক্ করছে। সত্যিকারের শিল্পী না হলে কেউ এমন জায়গা নির্বাচন করতে পারে না।

মায়া বলল, তোমার ভাল লেগেছ শুনে আমার নতুন করে ভাল লাগছে সুবর্ণা। উঠোনের ঠিক মাঝখানেই দুটো শালের গাছ। বড় বড় ডালে পাতায় অনেক জায়গা জুড়ে ছায়া ফেলেছে। একটি মেয়ে একখানা মাদুর নিয়ে এগিয়ে এল।

সে ঐ শালের ছায়ায় বিছিয়ে দিল মাদুর।

সিস্টার মায়া সুবর্ণাকে তার ওপর বসতে ইংগিত করল।

দুজনে আলোছায়ায় আল্পনা আঁকা মাদুরের ওপর বসে গল্প করতে লাগল। ঘুরে ফিরে গল্পের বিষয়বস্তু এক সময় এসে দাঁড়াল রাজাকে কেন্দ্র করে।

মায়া বলল, সেদিন রাধাপুর গাঁয়ে গিয়েছিলাম রুটিন মাফিক কাজ নিয়ে।

একটি বাড়িতে গিয়ে দেখি ভোরের রোদ গায়ে মেখে ক'টি ছেলে বসে কি যেন আলোচনায় মশগুল। তাদের ভেতর সেই রাজা ছেলেটি বসে আছে। আমাকে দেখে হাসল, কিন্তু ততক্ষণে কথা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। মুখে একেবারে কুলুপ আঁটা।

আমি ওদের পাশ দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমি এসে পড়ায় আপনাদের জরুরী কোন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজা ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা কিন্তু কোনদিন কাউকে ফিরিয়ে দিই না, অন্তর থেকে সবাইকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাই। বসুন না এখানে, অবশ্য আপনার যদি তাড়া না থাকে।

বসলাম ওদের মাঝখানে। ওরা আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আলোচনা চালাতে লাগল। অবশ্য প্রধান বক্তা ছিল সেই রাজা। কথা হচ্ছিল এ মরশুমের ফসল তোলার ব্যাপার নিয়ে।

সুবর্ণা বলল, ওটা কি এমন একটা গোপনীয় আলোচনা নাকি?

মায়া বলল, আলোচনাটা একটু ঘোরাল পথেই চলেছিল। আলোচনা ভাঙলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সত্যি, আপনাদের এ আলোচনার গুরুত্ব অনেক।

আমি সবটুকুই শুনলাম। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন আমার মুখ থেকে এ আলোচনার বিষয়বস্তু দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কানেই যাবে না।

রাজা অমনি বলল, মানুষকে বিশ্বাস করে যদি ঠকি তাহলেও আবার তাকে বিশ্বাস করব। আপনার এ জন্যে আমাদের কোন প্রতিশ্রুতি দেবার দরকার নেই।

সুবর্ণা বলল, ছেলেটি একেবারে আলাদা প্রকৃতির।

মায়া বলল, ও সবার থেকে একেবারে আলাদা ধাতুতেই গড়া।

সুবর্ণা কৌতুকটাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে বলল, ওর কথা শুনে ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

মায়া হাসল। বলল, কিছু মনে করো না সুবর্ণা, তুমি জন্মসূত্রে জমিদার। তাই রাজার সঙ্গে তোমার বনবে না। মুখোমুখি হলেই ও শজারুর কাঁটার মত সব সময়ে তোমাকে কথার খোঁচায় বিঁধতে থাকবে।

সুবর্ণা হেসে বলল, কাঁটার খোঁচা সওয়া যায় কিন্তু কথার খোঁচা সওয়া যায় না।

আমার আলাপে দরকার নেই ভাই। দূর থেকে ওর কথা শুনে ওকে বরং নমস্কার জানাব।

মায়া বলল, বয়েস তো আমাদেরই মত কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি যাদু আছে ওর ভেতর। বিরাট একটা অঞ্চল ওর কথার যাদুতে একেবারে সম্মোহিত।

আমার মনে হয়, যে মানুষ অকৃত্রিম, যে পরের ভাবনাগুলোকে নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে জানে সে সবার হয়েও সবার চেয়ে আলাদা। তোমাদের রাজা ছেলেটি সেই প্রকৃতির।

মায়া বলল, ঈশ্বর ওকে অনন্য প্রতিভা দান করেছেন।

প্রকৃতিতে এখন শীতের মৃদু শিহরণ। সূর্য অনেকখানি গড়িয়ে গেছে পশ্চিমে। পেছনের শালবনের ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে ছুঁয়েছে ফ্লোরেন্স সেবাকেন্দ্রের সীমানা।

সুবর্ণা বলল, আজ তোমার এখানে এসে বড় ভাল লাগল মায়া। পরিবেশ, আলোচনা, সবই মন ভরে দিল। এখন উঠছি ভাই।

মায়া বলল, একটু বস। এই মুহূর্তে ওঠা চলবে না। আমার আশ্রমের সামান্য সেবা না নিয়েই চলে যাবে!

সিস্টার মায়া ভেতরে উঠে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই কিছু ফল আর ছানা নিয়ে এসে হেসে বলল, হয়ত তোমার রুচি এই খাদ্য বস্তুগুলোর অনুকূল নাও হতে পারে কিন্তু এ ছাড়া আমাদের সেবাকেন্দ্রে আর কিছু দেবার নেই ভাই।

সুবর্ণা বলল, তোমার প্রীতি-ভালবাসাই এগুলোর ভেতর স্বাদ এনে দিয়েছে মায়া। আমি জিনিসগুলো খেতে ভালবাসি কি না বাসি সেটা কোন কথাই নয়।

খাওয়া শেষ হলে সুবর্ণা উঠল। মায়া বলল, চল তোমাকে নদীর এপার অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুবর্ণা বলল, তোমার সঙ্গ যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ।

পথে যেতে যেতে মায়া বলল, কবে কলকতা ফিরছ?

সুবর্ণা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, ফসল তোলার কাজটা শেষ করেই হয়ত বাবা ফিরে যেতে চায়। অবশ্য এ বছরই শুধু বাবা এসে পড়েছে। প্রতি বছর গোমস্তারাই এই সব কাজ করে।

মায়াকে একটু চিন্তিত দেখাল। এক সময় বলল, যদি কোন সময় দরকার মনে কর তাহলে আমার কাছে বিনা দ্বিধায় এসে থাকতে পার।

সুবর্ণা বুঝল, মায়া আন্দোলনের ব্যাপারটা সবই জানে শুধু ভেঙে বলল না। ও বলল, শুধু প্রয়োজনে নয় অপ্রয়োজনেও আমি তোমার কাছে থাকতে আসব মায়া। আসব কেবল তোমার সঙ্গ পাবার লোভে।

রাতে বাবার মুখ থেকে এ পক্ষের খবর পেল সুবর্ণা। জোতদার গোবিন্দ রায় ঝানু লোক। লেঠেল সংগ্রহ করে আগেভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছে অনুগত চাষীদের ঘরে। প্রতিটি ঘরে এক একজন করে তীরন্দাজ দাঙ্গাবাজ লোক আত্মগোপন করে আছে। অনুগত চাষীরা সামনের দশ তারিখে ফসল কাটার কাজে নেমে পড়বে, কারণ বার তারিখে অপর পক্ষ ফসল কাটার কথা ঘোষণা করেছে। ওদের আগেই কিছু ফসল জোতদারের খামারে আসা চাই। তাহলে মোকদ্দমা চলার সময় সুবিধে হবে। বলা যাবে, শান্ত চাষীদের ওরা অশান্ত করে তুলেছে। ভয় দেখিয়ে তাদের দলে টানবে চেষ্টা করেছে। না পেরে দাঙ্গা লাগিয়েছে। অবশ্য পুলিসের সঙ্গেও কথাবার্তা সব পাকা হয়ে আছে। ওরা বার তারিখে আসবে।

সুবর্ণা বলল, দশ তারিখে যদি দাঙ্গা বেঁধে যায় দুদল চাষার ভেতর তাহলে শান্তি রক্ষা করবে কে?

গোবিন্দ রায় চাইছে ওদের ভেতর যত ঠোকাঠুকি লাগে ততই আমাদের মঙ্গল।

সুবর্ণা এবার হেসে ফেলল। বলল, গোবিন্দ রায় চাইছে, তুমি তাহলে চাইছ না বাবা?

কে ওসব হাঙ্গামার ভেতর জড়াতে চায় বলতো। নিতান্ত একটা ঝঞ্ঝাটের ভেতর এসে পড়েছি তাই। আর এসেই যখন পড়েছি তখন না গেলে খুব খারাপ দেখায়।

গভীর রাতে সবাই ঘুমে অচেতন। অগ্রহায়ণের কুয়াশায় চরাচর আচ্ছন্ন তার ভেতর দিয়ে, অতি ক্ষীণ আলোয় পথ চিনে চলেছে সুবর্ণা। প্রায় দৌড়ে চলেছে সে। আজকাল রাতে বনের ধারে ঝোপ্‌ড়িতে কাটায় রাজা। এসব সুবর্ণার অজানা নয়। তাই সে চলেছে বনের দিকে।

বন পেরিয়ে কুয়াশার ভেতর সে একটা ছবি দেখে পাথর হয়ে গেল। ঝোপ্‌ড়ির বাইরে দু'টি মূর্তি মুখোমুখি অতি নিকট সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সুবর্ণা তাদের একজনকে চিনতে পারল। সে রাজা। অন্যজন এক নারী মূর্তি। তার সম্পূর্ণ অজানা।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এলে স্বর্ণা বনের দিকে পিছিয়ে এল পায়ে পায়ে।

সে এখন পেছন ফিরে বন চিরে দৌড়তে লাগল। রাজার চরিত্রে কলঙ্ক! রাতে সে মেয়েছেলেদের নিয়ে কাল কাটায়। আশ্চর্য পৃথিবী। ততোধিক আশ্চর্য মানুষের চরিত্র। কাল, কালই বাবাকে বলে সে পালাবে কলকাতা। আর এক মুহূর্তেও সে থাকতে পারবে না এই দম বন্ধ-করা পরিবেশে।

পেছন থেকে শক্ত করে কে যেন স্বর্ণার হাত ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণা চীৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজার বুকে। কান্নায় তার বুক ভেসে যেতে লাগল।

রাজা স্বর্ণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, এমন ঠুনকো বিশ্বাস নিয়ে তুমি রাজার কাছে এসেছ স্বর্ণা। রাজা কি নির্জন দুপুরে তার ছোট্ট ঝোপ্‌ড়িটার ভেতর একটি মেয়ের সঙ্গ দিনের পর দিন পায়নি? সে তরুণী মেয়েটি কি কোনদিন তার বন্ধুকে বিচলিত হতে দেখেছে? সব সুযোগই তো ছিল তার হাতে। সেখানে যদি সে নিজেকে প্রলোভন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে তাহলে আজ সে কিসের মোহে নিজেকে বিলিয়ে দেবে স্বর্ণা?

স্বর্ণা রাজার বুকে তার মুখখানা ঘষতে ঘষতে আকুল হয়ে বলতে লাগল, আমাকে ক্ষমা কর রাজা। আমি একেবারে ছোট হয়ে গেলাম তোমার কাছে। রাজা দু'হাতে ধরে সিধে দাঁড় করাল স্বর্ণাকে। তারপর তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে বলল, ঈর্ষা না থাকলে মেয়েদের শোভার আর বাকী রইল কি। মেয়েদের ঈর্ষা পুরুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, স্বর্ণা।

স্বর্ণা অমনি দু'হাত দিয়ে রাজার বিস্তৃত বুকে আঘাত হেনে উপভোগ্য প্রতিবাদটুকু জানাতে লাগল।

রাজা ঝোপ্‌ড়িতে টেনে আনল স্বর্ণাকে। পাশে বসিয়ে বলল, এখন শুনতে চাও মেয়েটির কথা?

না। আমার মনে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এখন আর কোন সন্দেহ বা ভাবনা নেই।

তবু শোন। অন্ততঃ মেয়েটিকে জেনে রাখা ভাল। ও আমাদের প্রতিপক্ষের মেয়ে। এমন আগুনের শিখার মত দহন শক্তি আমি কম মেয়েরই দেখেছি। ও সদ্য বিয়ে করেছে। যে চাষারা জোতদারের ঘরে ধান তুলে দেবার জন্যে জোট বেঁধেছে, তাদের মোড়লের ছেলের বউ এ মেয়েটি। যেদিন থেকে শুনেছে, দল ছেড়ে ওরা জোতদারদের টোপ গিলেছে, সেদিন

থেকেই ওর মনে জ্বলে উঠেছে আগুন, ও সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জানিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

কিন্তু রাজা, ঘরের বউ হয়ে ও এত রাতে এখানে আসতে পারল কি করে?

ঈশ্বরই সে সুযোগ দিয়েছেন। মোড়লের বাড়িতে দাঙ্গাবাজ তীরন্দাজরা রয়েছে অনেকগুলি। নিজের ঘরটিকে সুরক্ষিত করে তারপর অন্যদের ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছে লেঠেলদের। এখন ঘর ভর্তি জোয়ান পুরুষ। সোমত্ত বউএর পাছে নজর কাড়ে তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে পাশেই ওর বাপের বাড়ীতে। সেখানে ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই। মাও এককালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিসের লাঠি খেয়েছিল। এখন তাই ওর পক্ষে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা খুব একটা অসুবিধের ব্যাপার নয়।

সুবর্ণা বলল, আশ্চর্য মেয়ে তো। আমি এ মেয়েটিকে কত ছোটই না ভেবেছিলাম।

রাজা বলল, এখন ওর কথা থাক, তুমি এত রাতে কি খবর নিয়ে এসেছ তাই বল?

ওরা দশ তারিখে ফসল কটা শুরু করছে। পুলিস অবশ্য আসছে বার তারিখে তোমাদের ফসল কাটার দিনে।

রাজা বলল, দশ তারিখে ওরা ফসল তুলবে। আমরাও যে দু'দিন আগে ঐ তারিখেই ফসল কাটব ভেবেছিলাম।

গত সন্ধ্যায় ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজা। সেই মত প্রস্তুত হচ্ছে।

রাজা বলল, আমাকে তাহলে আজ রাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর সে সিদ্ধান্তের কথাটাও জানিয়ে দিতে হবে সবাইকে আজ রাতেই।

চঞ্চল পায়ে ওরা নেমে এল ঝোপ্‌ড়ির বাইরে। পরস্পর ছুটে চলল ভিন্ন পথে।

কয়েকটা আগুনের তৈরী অজগর দিগন্তের বিভিন্ন দিক থেকে অন্ধকারের বুকে এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সারা প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল প্রজ্জ্বলিত আলোর শিখা। ঐ আলোয় শুরু হয়ে গেল ক্ষিপ্র হাতে ফসল তোলার কাজ। সারা মাঠ জুড়ে অন্য কোন শব্দ নেই। শুধু কাস্তের হিস্‌ হিস্‌ শব্দ বাতাসকে সহস্র সহস্র নাগের ছোবল দিয়ে চলেছে।

ভোর হল, বেলা বাড়ল, কর্মে বিরত দেখা গেল না। চতুর্দিকে একটা থমথমে ভাব। একদল ফসল কাটে, অন্যদল বয়ে নিয়ে যায়। মেয়েরা আসছে।

খাবাব দিয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের মাঝখানে। কাজ চলেছে, যেন কেউ চাবি ঘুরি য়ে দিয়ে মাঠ জুড়ে বিরাট যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়েছে।

তিন দিন তিন রাত চলল এই ফসল তোলাব কাজ। দশ দিনের কাজ শেষ হয়ে এল মাত্র এই ক'টি দিনে। মাঠ ফাঁকা হয়ে এল। কিন্তু শেষ দিনের বাতে শুরু হয়ে গেল লড়াই। কৃষ্ণা দশমীর চাঁদ তখন অস্পষ্ট আলো বিছিয়ে দিযেছে ফসল তোলা প্রান্তরে। কৃষকরা শপথ নিয়েছে আজ রাতেই শেষ কববে তাদেব ফসল তোলাব কাজ।

জোতদাবদেব লোকেরা তৈরী। গোবিন্দ বাযেব নাযেব বর্শাধাবা জোযানটার কানে কানে ফিস্ ফিস্ কবে বলল, শুধু চোখ বাখবি মোড়লেব ব্যাটাব ওপব। অন্য কোন দিকে নয়, বুঝলি উজবুক। সুযোগ বুঝেই মোডলেব ব্যাটাকে পেছন থেকে এ ফোঁড ও ফোঁড় করে দিবি। বায়বাবু তোকে টাকায় মুড়ে দেবে, বুঝলি শালা।

গোবিন্দ বায় কেবল ডাকসাইটে জোতদাবই নয়, নারী-প্রেমিকও বটে। সুযোগ পেলেই মেয়েমানুষেব সঙ্গ করা তাব একটা অভ্যাস। এতে নাকি মন চাঙ্গা থাকে, দিলখানা দবিয়ার মত দিশাহাবা হযে যায।

অনেকদিন লোকটাব চোখ ছিল তাব দলভুক্ত মোডলের ছেলেব বউটাব দিকে।

মেয়েটাব বিয়েব আগে থেকেই গোবিন্দ বায় টোপ ফেলেছিল, কিন্তু সে টোপ গেলেনি মেয়েটা। তাবপর বিয়ে হযে গেল। এখন মাছ গভীর জলে। এই একটা সুযোগই মাত্র এসেছে পথেব কাঁটাটাকে সবিয়ে দেবার। দেখা যাক্ কি হয। অতি বিশ্বস্ত সডকীওযালার ওপর ভার পড়েছে কাজটা হাসিল কবে দেবাব জন্যে। সবাই জানবে মারদাঙ্গায় প্রাণ গিয়েছে মোডলের ব্যাটাব। কেউ ভ্রমেও অনুমান কবতে পারবে না গোবিন্দ রায়ের পেয়াবের মোড়লের ব্যাটা, জোতদার গোবিন্দ রায়ের ষডযন্ত্রেই নিহত হয়েছে।

হৈ হৈ করে সবাই ছুটেছে। হাতে বর্শা আর তীর ধনুক। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে ও-পক্ষের মানুষগুলোর ছায়া ছায়া দেহ।

ধান কাটতে কাটতে কাস্তে হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে রাজার দলের লোকেরা।

তিন দিন দু'রাত্রি তাদের নিরুপদ্রবে কেটেছে। তৃতীয় রাতও নির্বিঘ্নে কাটতে চলেছিল কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

এগিয়ে এল রাজা। হাতে সড়কী। ইস্পাতের মত ঝকঝকে নমনীয়

দেহটা যেন ধনুকের মত টংকার তুলে সবার সামনে ছিটকে এসে দাঁড়াল। বজ্রের মত গর্জে উঠল রাজা। কি ভীষণ সে আওয়াজ! সারা মাঠের মানুষের বুকে যেন বিঁধে গেল সে শব্দ। সমুদ্রের তরঙ্গের মত গর্জন করতে করতে জোতদারের ভাড়াটে দাঙ্গাবাজ মানুষগুলোর দিকে তেড়ে আসতে লাগল দিক্ দিগন্তের কৃষকরা। তিন দিক থেকে বলয় রচনা করে এগোতে লাগল তারা। জোতদারদের পক্ষের কৃষকরা তীরন্দাজদের পেছন পেছন এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা আন্দাজ করতে পারেনি, রাজারাম মণ্ডল এতখানি শক্তি মাঠের ভেতর সঞ্চয় করে রেখেছে। জনসমুদ্রকে এগিয়ে আসতে দেখেই তারা কোলাহল করে পিছু হঠতে লাগল। কিন্তু সামনে তীরন্দাজ, মাঝে লাঠিসোটা হাতে কৃষক আর তাদের পেছনে সড়কীওয়ালারা। এইভাবে জোতদারদের সাজান ব্যূহের মাঝখানে ভাঙন ধরতেই একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেল। কৃষকরা চরের দিকে আর্ত কোলাহল তুলে পালাচ্ছে দেখে সামনের তীরন্দাজরা ঘাবড়ে গেল। তারা সামনের দিকে ধনুক উঁচিয়ে পিছু হটতে লাগল। ভীষণ বেগে কালো স্রোতটা প্রায় সামনে এসে পড়েছে, এমন সময় শত শত শাঁখ আর রামশিঙা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল। শব্দে দৃশ্যে সে এক ভয়াবহ প্রাণ কাঁপান অবস্থা।

পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। এখন আর দাঙ্গাবাজ, কৃষক বলে আলাদা কেউ নেই। সবাই ছুটে পালাচ্ছে প্রাণ নিয়ে। সড়কীওয়ালাদের ভেতর যারা তাড়ি গিলে এসেছিল, তারা কিছু সময় ঠায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিল। কিন্তু পলায়মান কৃষকদের ধাক্কায় তারা ভূমিশয্যা নিতে বাধ্য হল। তারপর কাদামাটি ঝেড়ে দলবলের সঙ্গে এক সময় আত্মরক্ষার তাগিদে পিছু হঠতে লাগল।

বিনা রক্তপাতে লড়াই শেষ। রাজার নির্দেশ, আঘাত না পেলে আঘাত হানবে না। একপক্ষ রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছে, অন্যপক্ষ তার অগণিত মানুষ নিয়ে স্থির চিত্রের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ভোর হল। আকাশে রক্তের ঢেউ তুলে দেখা দিল অগ্নি গোলক। বিজয়ী পক্ষের বিস্মিত দলনায়ক তাকিয়ে দেখল, সামনের উঁচু ডাঙার ওপর একটি মৃতদেহ পড়ে। আর তার একটু দূরে অন্য একটি মৃতদেহ মোড়লের খামার-বাড়ীর সামনে লুটিয়ে পড়ে আছে।

ক'দিন ধরে চলল পুলিশী জুলুম আর ধরপাকড়। গোবিন্দ রায়, মোড়লের

ছেলের হত্যাকাণ্ডটা রাজারাম মণ্ডলের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। কারণ মোড়লের ব্যাটার বউ বিরুদ্ধ সাক্ষী দিয়ে বলল, সে নিজের চোখে দেখেছে তাদের দলের ভাড়াটে সড়্‌কীওয়ালা তার স্বামীর বুকে সড়্‌কী চালিয়েছে। কেন যে চালিয়েছিল নিজের দলের মানুষের উপর তা সে জানে না। তবে এমনও হতে পারে তাড়ি খেয়ে মানুষগুলো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সে যখন স্বামীকে লুটিয়ে পড়তে দেখল সড়্‌কীরওয়ালার সড়্‌কীর ঘায়ে তখন একজনের হাত থেকে টাঙিটা কেড়ে নিয়ে সে ছুটল তার পেছন পেছন। কাছে গিয়েই মোক্ষম কোপ বসিয়ে দিলে।

না, হত্যাকাণ্ডটা অপরপক্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া গেল না। কিন্তু তাতে একদিক থেকে আশাভঙ্গ হলেও অন্য দিক থেকে গোবিন্দ রায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সড়্‌কীওয়ালাটা বেঁচে নেই সুতরাং কথাও ফুটে বেরুবার পথ নেই।

মিঃ বোস সুবর্ণাকে আর এক মুহূর্তও বসুভিলায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। দাঙ্গার রাতে মিঃ বোস মেয়ের ঘরে ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে পেছন ঘুরে গিয়ে দেখছিলেন, দরজা খোলা, কিন্তু সুবর্ণা নেই! তিনি পাগলের মত নদীর ধারে পায়চারি করছিলেন আর ঘন ঘন শুনতে পাচ্ছিলেন উদ্বেলিত জনতার আস্ফালন।

মেয়েকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়ে যে তিনি ঠিক কাজ করেন নি সে কথা তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল।

প্রায় রাত ভোর করে এল সুবর্ণা। দূর থেকে এত ভোবে বাবাকে নদীব ধারে পায়চারি করতে দেখে সে বুঝে নিল যে সে ধরা পড়ে গেছে। তাই সে আর কোনকিছু গোপন করার চেষ্টা করল না। বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমাকে বড় ভাবনায় ফেলে দিয়েছি বাবা, কিন্তু মাঝ রাতে ভীষণ একটা গোলমালের আওয়াজ শুনে ঘরের ভেতর স্থির থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে গেলাম। দাঙ্গা কোনদিন দেখিনি তাই দাঙ্গাটা স্বচক্ষে দেখার বড় ইচ্ছে হল। তোমাকে জানাইনি। জানালে তুমি তো আর যেতে দেবে না, তাই চুপি চুপি চলে গেছি পেছনের দরজা খুলে।

মিঃ বোস মেয়ের ওপর রাগ করতে গিয়েও পারলেন না। সদ্য মা মরা মেয়েটিকে রূঢ় কথার আঘাত দিতে তাঁর প্রাণ চাইল না। তিনি শুধু বললেন, এতখানি বিপদের ঝুঁকি নেওয়া তোমার ঠিক হয়নি সুবু।

গোমস্তার ওপর জোতদারের দায়িত্বভার দিয়ে তিনি মেয়েকে নিয়ে চললেন শহরে। সুবর্ণার সমস্ত মন পড়ে রইল এই শালবনে, সুবর্ণরেখার তীরে, আর একটি সংগ্রামী মানুষের সুখদুঃখকে কেন্দ্র করে।

বাসস্ট্যাণ্ডের যত কাছাকাছি আসছিল সুবর্ণা, একটা শ্লোগানের আওয়াজ তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

কাছে এসে দেখল লোকে লোকারণ্য। লাল পতাকা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। স্ট্যাণ্ডে বাস দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে জটলা। সুবর্ণা দেখল, একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রাজা। তার হাতে হাতকড়া, গলায় মালা। তাকে ঘিরে শত শত কৃষকের জয়ধ্বনি। পুলিসের গাড়ী আসবে থানা থেকে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে, তাই অপেক্ষা করছে সবাই।

চোখাচোখি হল তার সঙ্গে রাজার। একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলে গেল রাজার মুখে চোখে। সে তার হাতকড়া পরানো হাতখানা তুলে ধরল। কেউ কিছু বুঝল না। আবার শুরু হয়ে গেল জয়ধ্বনি।

পাবলিক বাস ছাড়ল যথাসময়ে। জনতাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল বাসখানা। যাবার সময় বাসের বাইরে হাত বের করে রুমালখানা সামনে নেড়ে চলল সুবর্ণা।

॥ ৩ ॥

কৈলাস বাইরের বাগান থেকে চেঁচিয়ে বলল, রাঙা মা, ঐ যে নদী পেরিয়ে মায়া মেমসাহেব আসছে।

সুবর্ণা ঘর থেকে উঠে এল বাইরে। পায়ে পায়ে বাগান পেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনের রাস্তার ওপর। দূর থেকে তাকে দেখে হাত নাড়তে লাগল মায়া মেমসাহেব। সুবর্ণাও হাত তুলে জানাতে লাগল উত্তপ্ত আমন্ত্রণ।

কাছে এলে দুজনে বাঁধা পড়ল দুজনের বাহু বন্ধনে। কে বলবে প্রায় দু'যুগ পার করে দেখা হল দুজনের।

সুবর্ণা মায়া মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। বলল, আমার মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন তুমি আমাকে ফ্লোরেন্স সেবাকেন্দ্র থেকে গল্প করতে করতে নদীর ধারে এগিয়ে দিয়ে গেলে।

মাদার মায়া বলল, স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠলে সময়ের গতি বিপরীতমুখী হয়ে যায় সুবর্ণা।

তুমি এখন নিশ্চয় মাদার হয়েছ ?

সুবর্ণার কথায় হেসে মাথা নাড়ল মায়া মেমসাহেব। বলল, শুধু নিয়মমাফিক মাদার নয়, সেবাকেন্দ্রে এখন অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আমার।

একদিন যাব তোমাব সেবাকেন্দ্রে।

নিশ্চয় যাবে। সেবাব দাঙ্গাহাঙ্গামাব ভেতবে চলে গেলে, এবার এসো আমাদের ওখানে। না, পরিদর্শনের জন্যে ডাকছি না, ক'দিন একসঙ্গে থাকার জন্যেই ডাকছি! অতিথিনিবাস একটি তৈরী হয়েছে। এখন তো আর আক্কেল নেই, একা একা তোমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে নতুন পরিবেশে ক'দিন কাটাবে চল। হয়ত ভাল লাগবে তোমার।

সুবর্ণা বলল, তোমার সঙ্গের লোভেই যাব। হ্যাঁ, শোন, মাদাব বলে সবার সামনে তোমাকে খাতির করতে হবে না ?

একটুও না। মাদার রেবেকা মাবা যাবার পর এই ফ্লোরেন্স সেবাকেন্দ্র পবিচালনাব পুবো দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে। এখন আমি মাদার। সবাই আমাকে মাদার বলে ডাকে, সমীহ করে। কিন্তু সুবর্ণা, আমি তো মানুষ। আমাবও তো বন্ধুব সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্প করতে ইচ্ছে করে।

সুবর্ণা বলল, তুমি ছকে বাঁধা মাদার হয়ে যাওনি, তাই তোমাকে দেখে আজ বড় ভাল লাগছে মায়া। আমি নিশ্চয়ই গিয়ে তোমার কাছে কাটিয়ে আসব।

তুমি বিয়ে করেছ বলে তো মনে হচ্ছে না। কোন চিহ্ন দেখছি না তোমার মাথায়।

তোমার অনুমান ঠিক।

সংসার কবলে না কেন ?

আমার মত আর পথের সঙ্গে আর একজনের মত আর পথের মিল খুঁজে পেলাম না বলে।

হাসল মায়া মেমসাহেব। হঠাৎ বলল, রাজাকে মনে পড়ে তোমার ?

একটা বিদ্যুতের শক্ খেল যেন সুবর্ণা। বলল, পড়ে বইকি, তোমার কাছে ওর কত গল্প শুনেছি।

মায়া বলল, তার কথা পরে কিছু শুনেছ ?

সুবর্ণা উৎসুক গলায় বলল, কই না তো, কেমন আছে সে ?

ভাল, খুব ভাল। এ যন্ত্রণার সংসার থেকে সে বিদায় নিয়েছে।

মুহূর্তে বুকখানা যেন গুঁড়িয়ে গেল সুবর্ণার। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে

রইল মায়া মেমসাহেবের মুখের দিকে। সে শেষবার এখান থেকে চলে যাবার পর দুটো যুগ প্রায় পার হয়ে গেছে। জীবনের স্রোত তার প্রবাহের পথ পরিবর্তন করেছে। বহু নতুন জনতা আর জনপদের মুখ দেখেছে সে। বার বার ইচ্ছা জেগেছে মনে উৎসমুখের দিকে ফিরে যেতে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বোধহয় তা সম্ভব হয়ও না। এখান থেকে রাজাকে শেষবার দেখে যাবার পর কলকাতা ফিরে ক'দিন সে প্রায় নাওয়া খাওয়া ঘুম ভুলে রাজার কথা ভেবেছে। তাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে, অন্ততঃ তার একটুখানি খবর পাবার জন্য সে কাতর হয়ে পড়েছিল, কিন্তু খবর সংগ্রহের কোন সূত্রই সে আবিষ্কার করতে পারেনি। তারপর আশ্চর্য সময়ের লীলা। নতুন নতুন বন্ধু এসেছে, নতুন নতুন কাজের পাকে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। জীবনের পুরোনো স্রোতে জমে উঠেছে পলি।

কিন্তু আশ্চর্যভাবে তার কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দিনগুলি তাকে ঘিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যখন তার কাছে এসেছে নতুন জীবনে প্রবেশের প্রস্তাব। সে পারেনি নতুন সংসার রচনার খেলা খেলতে। বরং সে অভ্যস্ত জীবনের ভেতরেই ঘুরে ফিরবে, একক জীবনের বাঁধনহীন সুখ অনুভব করবে, তাতেই তার পরিতৃপ্তি।

কখন যে জল গড়িয়ে পড়েছে তার চোখের কোণ দিয়ে তা সে লক্ষ্য করেনি। মায়া মেমসাহেব তার বিহ্বল ভাবটুকু লক্ষ্য করে বলল, সত্যিই, রাজা অসাধারণ ছিল সুবর্ণা। এখানে থাকার জন্যে তাকে আমি অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সুবর্ণা নিজেকে এবার সংযত করে নিল। সে বলল, কি করে সে মারা গেল মায়া? বয়সে তো তার এমন কিছু হয়নি।

না, বয়েসের জীর্ণতা তাকে তিলে তিলে ক্ষয় করতে পারেনি। প্রভুকে সেজন্যে আমি ধন্যবাদ জানাই। সে মারা যায় এক ধরনের ছলনার শিকার হয়ে।

সুবর্ণা অস্থির হয়ে উঠল, একটুখানি স্পষ্ট করে বল মায়া।

মায়া মেমসাহেব বলল, তুমি কি কাগজে খবরটা পড়ে দেখনি? ঐ যে একদল বন্দীকে মুক্তি দেবার নাম করে রাত্রে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্জন জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা পালাতে থাকলে পেছন থেকে গুলি করে তাদের মারা হয়। একজন তাদের ভেতর প্রাণে বেঁচে যায়। পরে তার কাছ থেকেই রাজার মৃত্যুর খবরটা জানতে পারি।

সুবর্ণা বলল, রাজা কি উগ্রপন্থী ছিল? আমি তো জানতাম সে শুধু কৃষক-আন্দোলন নিয়েই মেতে উঠেছিল।

মায়া মেমসাহেব হাসল। হেসে বলল, তুমি কি চাও মানুষ এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবে? তার চিন্তা, আর চেষ্টা, তার পরিকল্পনা পাল্টাবে না।

আমি সে কথা বলছি না মায়া। আমি শুধু জানতে চাইছি তার কথা। তার ভেতর যে একটা আগুন ছিল তা আমরা দেখেছি। সেই আগুনটা হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় কখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সে খবরটুকুই আমার অজানা।

মায়া বলল, তার জীবন প্রতি মুহূর্তে একটা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলছিল। আমি নিজের সেবাকেন্দ্রটি গড়ে তোলার কাজ করতাম ঠিক, কিন্তু দারুণ কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। শেষে এমন হল, ওর ভাগ্যের সঙ্গে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, অনেকখানি জড়িয়ে পড়লাম।

সুবর্ণা বলল, কি রকম? অবশ্য যদি তোমার বলতে কোন বাধা না থাকে।

মায়া বলল, তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছে কোন কথাই বলতে আমার বাধা নেই। একমাত্র ঈশ্বর আর বন্ধুর কাছেই মনের সব কথা খুলে বলা যায়।

একটু থেমে মায়া মেমসাহেব বলল, প্রতিদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু মোটামুটি ঘটনাটুকু তোমার কাছে লুকোবো না, বরং তোমাকে বলে আমি কিছুটা শান্তি পেতে চাই।

এরপর দীর্ঘ সময় নিশ্ছিদ্র নীরবতা। মায়া মেমসাহেব কিভাবে কথাগুলো বলবে তাই বুঝি মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিল। আর সুবর্ণা কম্পিত বুকে অখণ্ড আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল কথাগুলো শোনার জন্য।

মায়া মেমসাহেব কথা শুরু করল, এক সময় মনের ভেতর দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। সে সময় আমি গভীরভাবে ভাবছিলাম, সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ওর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাব।

সুবর্ণা বলল, রাজার কি তাতে সম্মতি ছিল মায়া?

সে আমার মনের কথা জানতে পারেনি সুবর্ণা। তবে সে ঐটুকু জানতে পেরেছিল, আমি তার কাজের একজন সমর্থক। তারপর শোন। রাজাকে তুমি কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখে গিয়েছিলে। তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও নানা জালে জড়িয়ে, আইনের প্যাঁচে ফেলে জেলে ঠেলে দিয়েছিল এখানকার জোতদারেরা। সাতটি বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

মিথ্যে করে একটা মানুষকে আইনের জালে জড়িয়ে ফেলল দেখে আমার মনটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠল। জোতদারদের বাড়ী তাই ঘৃণায় আমি আর চাঁদা চাইতে যেতাম না। বহু দূর দূর গ্রামে যেতাম সামান্য কিছু চাঁদার আবেদন নিয়ে। কিন্তু সাধারণ চাষাভূষো আমার ভিক্ষের ঝুলি ভরে দিত। গরীব মানুষগুলির সামান্য দান আমি অসামান্য মর্যাদা দিয়ে বয়ে আনতাম। সারা পথ আমার চোখ শুকনো থাকত না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটল। আমি সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় মাঠ পেরিয়ে আসছিলাম খেয়াঘাটের দিকে, দেখলাম একটি মেয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। সে কথা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছিল না।

আমি মেয়েটিকে বললাম, যে কোন কারণেই হোক তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, একটু শান্ত হও, তারপর তোমার কথা বল। আমার এখুনি চলে যাবার কোন তাড়া নেই।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগল। ও অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে যেতে চাইবে অথচ পারবে না, তাই আমি ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম।

মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমাকে আমি দেখেছি।

মেয়েটি বলল, ও পাড়ায় মোড়ল গুণধর মাঝির ছেলের বউ আমি।

বললাম, ও, এবার চিনতে পেরেছি। তুমি তো ভীষণ সাহসী মেয়ে। বছর তিনেক আগে দাঙ্গার সময় তুমি তোমার স্বামীর হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছিলে না?

ও সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, তোমার খবর সে সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমি তোমার আর একটা পরিচয় জানি।

ও আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে বললাম, তুমি রাজা মণ্ডলকে চেন?

ও মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, রাজার মুখে তোমার সবরকম সাহায্যের কথা শুনেছি। আর ও জেলে যাবার আগের দিন ওর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিল, দরকার হলে তোমাকে যেন আমি দেখি।

শুনেই মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, প্রথম প্রথম ও পাড়ায় গিয়ে তোমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পাইনি। বিশেষ করে তোমার মোড়ল শ্বশুরমশাইটি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছেন।

মেয়েটি বলল, আমি অনেকদিন মায়ের সঙ্গে গাঁ ছেড়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি। জোতদার গোবিন্দ রায়ের ভয়ে গাঁয়ে টিকতে পারিনি।

বললাম, কি রকম? আমি তো জানি সে সময় তোমার সাহসিকতার জন্য গোবিন্দ রায় তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। ঐ পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে আমাকে কাছে টানতে চেয়েছিল লোকটা। আসলে আমি গোপন খবর পেয়েছি, ঐ গোবিন্দ রায়ই আমাকে পাবার লোভে ঐ সড়্‌কীওয়ালাকে দিয়ে দাঙ্গার গোলমালের ভেতর আমার স্বামীকে হত্যা করে। আমি লোকটাকে কুপিয়ে মেরে ফেলায় সব প্রমাণ লোপ পায়। কিন্তু ওদের পুরোনো নায়েব একদিন মাতাল গোবিন্দ রায়ের জুতোর মার খেয়ে যখন কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন মায়ের সঙ্গে তার পথে দেখা! গোবিন্দ রায়ের সব গোপন খবর লোকটি মনের ক্ষোভে মায়ের কাছে বলে দিয়ে যায়। কিন্তু জানলেও করার কিছু ছিল না। আর তাছাড়া আমার মোড়ল শ্বশুর একমাত্র টাকা চেনে। ছেলের বউএর মান-সম্মান ঐ টাকার কাছে কিছু নয়। জোতদার গোবিন্দ রায় টাকার খেলা জানে। যে জন্যে রাজাকে শেষ অব্দি সে জেলে ঢোকাতে পারল।

আমি বললাম, এখন হঠাৎ করে তুমি কি বিপদে পড়লে তাই বল? আর এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কি ভাবেই বা সাহায্য করতে পারি?

মেয়েটি বলল, আমি মায়ের কাছে থাকতাম। মা গরীব হলেও তার মনের তেজ ছিল খুব বেশী। সহসা তাকে এড়িয়ে আমাকে কেউ বিরক্ত ক'রতে আসতে পারত না। কিন্তু ক'মাস হল মা মারা গেছে। আমি এখন সবদিক থেকে অসহায় হয়ে পড়েছি।

আর্থিক অসুবিধের কথা বলছ?

তা তো আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আত্মরক্ষা। আমি বড়লোক নই যে আমার কোঠাবাড়ী থাকবে। মাটির ঘরে সামান্য দরজায় আগন্তুকদের কি করে ঠেকিয়ে রাখি বলুন! বিছানার পাশে ধারাল কাটারিখানা নিয়ে শুই, কিন্তু সব সময় তো কাটারি হাতে ধরে জেগে থাকা যায় না।

ইতিমধ্যে কোন বিপদ কি তোমার ঘটেছে?

মেয়েটি বলল, আমাকে কোন দিক থেকে জব্দ করতে না পেরে এখন গোবিন্দ রায় আর আমার শ্বশুর মিলে একটি পরিকল্পনা করছে।

বললাম, কি রকম?

শ্বশুর গাঁয়ে বিচার বসিয়ে বলেছে, এ মেয়ে একা থাকে। এর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। এ শুধু আমার কলঙ্ক নয়, সারা গাঁয়ের কলঙ্ক। হয় ওকে আমার বাড়ীতে আমার কড়া নজরের ভেতর থাকতে হবে, নয়তো ওকে চলে যেতে হবে আমাদের গাঁ ছেড়ে। গাঁয়ে বসে মোড়ল-বাড়ীর মুখ পোড়ান চলবে না।

শ্বশুরের বিচার শুনে নিজের রায় নিজেই ঘোষণা করলাম। বললাম, আমি এ গাঁয়ে মোড়লের বাড়ীতে বাস করার চেয়ে রোদ বৃষ্টিতে গাছের তলাকেও অনেক নিরাপদ আর সুখের বলে মনে করি। আমার মায়ের সামান্য বাড়ীখানা আমি গাঁয়ের পাঠশালা তৈরীর জন্যে দান করে দিয়ে গেলাম।

কথাগুলো বলে আমি আর দাঁড়াইনি। ছুটে বেরিয়ে এসেছি খোলা মাঠে। আসতে আসতে প্রথমে আপনার মুখখানাই মনে পড়ল। আর আশ্চর্য! আমি দূরে তাকিয়ে দেখলাম, আপনিই চলেছেন। তাই ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এসেছি।

সুবর্ণা, সেদিন ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু সেবাকেন্দ্রে স্থান করে দিতে পারলাম না। পথে আসতে আসতে মনে হল, মাদার রেবেকা থাকলে আমি মেয়েটিকে আশ্রয় দেবার কথা জিজ্ঞেস করে নিতাম, কিন্তু তিনি যখন নেই তখন একজন সামান্য সেবিকা হিসেবে মেয়েটিকে আশ্রমে স্থান দেবার অধিকারও আমার নেই, তাছাড়া ওর ব্যাপারটা ছিল একটু জটিল ধরনের। আমরা ওকে আশ্রয় দিলে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে আর তার ফলে প্রভাবশালী লোকেদের বিরূপ দৃষ্টি পড়বে আমাদের এই সেবাকেন্দ্রের ওপর।

আমি একটা উপায় চিন্তা করে বের করলাম। আমাদের সেবাকেন্দ্রের পরে টিলা আর শালবনের ভেতর একদল গোয়ালার বাস, তুমি জান? আমি ওকে সেখানে নিয়ে গেলাম। ওদের বুঝিয়ে একটুখানি আশ্রয়ের জন্যে রাজী করালাম।

ওরা আমাকে ভালবাসত। আমি ঐ সহজ সরল মানুষগুলির সাধ্যমত উপকার করার চেষ্টা করতাম। শীতের সময় ওদের আমি একবার অনেকগুলি কম্বল দিয়েছিলাম। সে কথা ওরা বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলত।

তাই মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে ওরা দ্বিধা করল না। কথাটা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেজন্যে তারা নিজেরাই সাবধান হয়ে রইল।

এক শুক্রবারে মাদার রেবকা এলেন। আমি নিভৃত ঘরে মেয়েটির সম্বন্ধে আলাপ করলাম। ওকে আশ্রমে রাখার বিষয়েই আমি আলোচনা করছিলাম। মাদার আলোচনার মাঝখানেই ধৈর্য হারিয়ে বললেন, এত অল্প বয়সে তোমাকে আশ্রমের গুরুদায়িত্ব দেওয়া ঠিক হয়নি, তুমি আবেগের দ্বারা চালিত হও। পরিস্থিতি বিচার করে চলার ক্ষমতা তোমার নেই। শুধু এখানে নয়, ঐ গোয়ালাদের আশ্রয়ে মেয়েটিকে নিয়ে তুলতে কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে।

আমি মুখোমুখি কোন প্রতিবাদ করলাম না। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে পারিনি। কেবল মনে হয়েছিল, সত্যকে কি পরিস্থিতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবে গ্রহণ করতে হবে। আমি ভাবলাম, এ সময়ে যদি রাজা এখানে থাকত তাহলে আশ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার অর্জনের আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম। অন্যায়ের প্রতিবাদের যতগুলো পথ আছে সব ক'টাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতাম।

পরের দিন সকালে মাদার আমাকে ডেকে বললেন, আমি তোমার উন্নত মনের প্রশংসা নিশ্চয়ই করব মায়া, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই পরামর্শও দেব, পৃথিবীতে প্রতিটি পা ফেলবে অনেক চিন্তা আর বিবেচনার পর।

আমি তখনও কিছু প্রতিবাদ করলাম না। মেয়েটি গোয়ালাদের ওখানেই রইল।

মাদার না থাকলে আমি দু'টি নানকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ মেয়েটির কাছেই যেতাম। আমরা শালবনে ঘুরে ঘুরে গল্প করতাম। পৃথিবীটাকে কি করে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করতাম।

সাত বছর জেল খেটে বেরিয়ে এল রাজা। আমার সঙ্গে প্রথম তার দেখা হল, তোমাদের বসুভিলার সামনে ঐ শাল জঙ্গলটার ধারে। আমি নদীর তীর ধরে আসছিলাম। হঠাৎ বনের দিক থেকে বাজখাঁই গলায় একটা হাঁক শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। দুপুর, চড়া রোদ্দুরে একটা লোক দাঁড়িয়ে। কালো গোঁফ দাড়িতে সারা মুখ ঢাকা। মোটা কাপড়ের একটা পাজামা আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী পরা। ওকে আদপেই চিনতে পারিনি।

নীচের থেকে বললাম, আমাকে ডাকছেন?

ও বলল, এখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি কি আছে যে তাকে ডাক দেব।

আমি বনের দিকে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম, যদি কোন বদ লোক হয় তাহলে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবই বা কি করে।

কিন্তু এসব অঞ্চলে দু'চার ঘর জোতদার ছাড়া সাধারণ মানুষরা চিরদিনই সৎ আর ভদ্র।

কাছে যেতেই লোকটি বলল, চেহারার পরিবর্তন হয়েছে তাই না চিনতে পার, কিন্তু গলার হাঁকটা শুনে তোমার চেনা উচিত ছিল।

আমি খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেললাম। সেই মুহূর্তে কেন জানি না আশ্রমবাসিনী হয়েও আবেগে আমি কথা বলতে পারলাম না। আমার দুটো চোখ ঝাপ্সা হয়ে এল।

রাজা বলল, এই দুপুরের বাসে নেমেছি। পথে প্রথম তোমার সঙ্গেই দেখা।

বললাম, আমার সৌভাগ্য।

ও হঠাৎ বলল, সে কি! কোথায় জেল-ফেরৎ আসামীকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে, তা না বলছ আবার সৌভাগ্য।

বললাম, তুমি চিরদিনই আমাদের এ অঞ্চলের রাজা। শুধু নামে নয়, প্রত্যেকটি মানুষের মনে।

ওর গলার স্বর গাঢ় হল। বলল, সিস্টার, সত্যি ওরা আজও আমাকে মনে রেখেছে?

বললাম, আজকাল আমি বহু দূর দূর গাঁয়ে যাই রাজা। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরেই আমি ঘুরে বেড়াই। সেখানে এমন দিন যায় না যেদিন কোন প্রসঙ্গে তোমার কথা না ওঠে। তারা আজও তাদের রাজাকে সত্যিকারের হৃদয়ের রাজা বলে মনে করে।

আমি ওদের জন্যে কিছু করতে পারলাম না সিস্টার! সাত বছর জেলের ভেতর বসে বসে শুধু ওদের কথাই ভেবেছি। কোন সমাধানে আসতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে দেশের এই নড়বড়ে পুরোনো কাঠামোর তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের মুক্তি নেই। ওটা যতটা না আশ্রয় দেবে তার চেয়ে মাথায় পড়ে যাবার সম্ভাবনাটাই ওর বেশী!

তখন শেষ বৈশাখের ঠা ঠা রোদ্দুর। আমরা বনের ভেতর গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এক সময় কথা বলতে বলতে ও আমাকে বন পেরিয়ে নিয়ে গেল একটা ঝোপ্ড়ির কাছে। চাষের সময় ক্ষেত পাহারা দেবার জন্যে এ ধরনের ঘর তৈরী করে কৃষকরা।

ও হঠাৎ আমাকে ফেলে ছুটে গেল ঝোপ্‌ড়িটার একেবারে কাছে। বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে এক মুখ হাসি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচে। বলল, ঠিক বলেছ সিস্টার, ওরা আমাকে একটুও ভোলেনি। এই দেখ, সাত বছর ওদের চোখের বাইরে রয়েছি তবু ওরা কি যত্ন করে আমার ঝোপ্‌ড়িটাকে বাঁশ খড় দিয়ে ছেয়ে রেখেছে।

আমি দেখলাম, হাসতে হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ও হাত দিয়ে মুছে ফেলল চোখ।

বললাম, আমার ঝুলিতে দুটো শশা আছে, খাবে? একেবারে কচি শশা। গাঁয়ের একটি মেয়ে ফেরার পথে আমার ঝুলিতে ভরে দিয়েছে।

ও দারুণ আগ্রহে আমার হাত থেকে শশা নিয়ে খেতে লাগল।

সেদিন আমরা দু'ঘণ্টা ঐ ঝোপ্‌ড়ির ভেতর বসে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম সেদিন একটি পরিণত যুবকের অসাধারণ সংযমের শক্তি। ও আমাকে প্রথম থেকেই সিস্টার বলে ডাকত। সত্যি, ও সেদিন সেই নির্জন ঝোপ্‌ড়ির ভেতর আমাকে ওর বোনের মর্যাদাই দিয়েছিল।

সুবর্ণা, সেদিন আমি একটি সমস্যার সমাধান করতে পেরে দারুণ তৃপ্তি পেয়েছিলাম। আমি ওকে অনেক বলে রাজী করালাম সুভদ্রাকে বিয়ে করতে। সুবর্ণা উৎসুক গলায় বলল, সুভদ্রা কে মায়া?

ঐ যে মেয়েটিকে আমি গোয়ালাদের ওখানে রেখেছিলাম।

তারপর শোন, গোপনে বিয়ে করে সুভাদ্রাকে নিয়ে ও চলে গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে। বলে গেল তোমার কথা, এই অঞ্চলের মানুষের কথা কোনদিনও ভুলব না সিস্টার। সময় হলে আমি ঠিক ফিরে আসব এখানে।

যাবার সময় ও বলল, গ্রামের কোন মানুষের কাছেই আমার এই আসার খবরটা দিও না যেন।

ও শালের বন পেরিয়ে টিলাগুলো পার হয়ে লোকের দৃষ্টির আড়ালে সুভদ্রাকে নিয়ে চলে গেল।

সুবর্ণা বলল, আশ্চর্য! গ্রামে ফিরেও গ্রামে রইল না।

মায়া বলল, ওর চরিত্রই আলাদা, সুবর্ণা। তোমার ভাবনা বা বিচারের বাইরে।

সুবর্ণা বলল, তারপর এতগুলো বছর পরে তুমি ওর মৃত্যুর খবর পেলে?

না, তার অনেক আগে ও এসেছিল এখানে। সঙ্গে সুভদ্রা আর তার

কোলে একটি ছেলে। ও কিন্তু ডেরা বেঁধেছিল ঐ গোয়ালাদের ওখানেই। সেখানে ও আত্মগোপন করে থাকত।

আত্মগোপন কেন মায়া ?

মায়া বলল, আমি তখন মাদার পদ পেয়েছি। সমস্ত সেবাকেন্দ্রের ভার তখনআমার ওপর। আমি ওদের আমার অথিতিশালায় থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। ওরা কিন্তু আমার সেবাকেন্দ্রে থাকাটা নিরাপদ বলে বিবেচনা করল না। তখন ওরা অন্যভাবে দেশের চেহারা বদলের পরিকল্পনা করছে।

আমি কোনদিন গিয়ে দেখতাম সম্পূর্ণ অপরিচিত কতকগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাজা কি-সব যেন বুঝিয়ে চলেছে। বক্তৃতার বহর নেই। দেয়ালে একটা বড় হাতে আঁকা মানচিত্র। তার ওপর আঙুল চালিয়ে বিভিন্ন স্থানের অবস্থানগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমাকে দেখে একবার শুধু হাসত। সিস্টার বলে রসিকতা করত না। বিশেষ কোন কথাও বলত না। এমন গভীরভাবে ডুবে থাকত নিজের কাজে।

সুবর্ণা বলল, সুভাদ্রার অবস্থাও কি তাই ?

বরং আরও কঠিন। সে বেচারা রান্না করত এতগুলো আগন্তুকের। কিন্তু কোন উপকরণই প্রায় সে হাতের কাছে পেত না। আমি সাহায্য করতে চাইলে সে বলত, আমাদের দলে নিয়ম হল, যা কষ্ট করে জোটাতে পারব তা উপস্থিত সবাই মিলে ভাগ করে খাব। তুমি দিদি আমাকে আর কত সাহায্য করতে পারবে।

শেষটায় আমি আর সাহায্যের কোন রকম চেষ্টাই করতাম না।

রাজার ছেলেটা ধূলোয় কাদায় গড়াগড়ি দিত। আছাড় খেয়ে ঠোঁট কাটত, কোন ভ্রূক্ষেপই নেই ওদের। গোয়ালার মেয়েগুলো ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে দুধ আর ভাত খাইয়ে দিত।

সেবার শীতকাকালে ফসল কাটার সময় এক কাণ্ড হল। চারদিকে রটে গেল, জোতদারকে এক মুঠো ধান দেওয়া হবে না। কারণ জমি জোতদারের নয়, চাষার। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সবাই এককাট্টা। মনে হল, যেন একটা অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে সব কিছু চালাচ্ছে।

যে দুজন জোতদার পুলিসে খবর পাঠিয়েছিল তাদের একজন পথে আর অন্যজন ঘরের ভেতর খুন হয়ে গেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একটা দাবানল যেন বনের অনেক সঞ্চিত আবর্জনা দগ্ধ করতে করতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তখন আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে উগ্রপন্থীদের সম্বন্ধে নানা রকম সংবাদ পাচ্ছিলাম। তাদের কাগজের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি শুধু দেখতাম রাজা আর তার দলের ছেলেরা কি কৃচ্ছ্রসাধন করে তাদের কাজ করে চলেছে। আমি প্রভু যীশুর ভক্ত উপাসিকা। তুমি বুঝতেই পারছ সুবর্ণা, আমি হিংসায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু আমি ওদের পথকে মনে মনে মেনে নিতে না পারলেও ওদের নিষ্ঠাকে বার বার নমস্কার জানিয়েছি।

প্রচণ্ড শীতের রাতেও আমি জানলা খোলা রেখেই শুই। সেদিনও শুয়েছিলাম। হঠাৎ কার একটা চাপা গলার ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আশ্রমের এক প্রান্তে শালবনের দিকে আমার শোবার ঘর। আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আবছা চাঁদের আলোয় শালগাছের তলায় চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে কোলে রয়েছে বাচ্চা।

আমার চিনতে ভুল হল না। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, সুভদ্রা, তুমি একা এত রাতে?

সুভদ্রা বলল, আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাবার জন্যে তৈরী। কালই পুলিস আসবে এই শালবন আর টিলার দিকটা সার্চ করতে। এখানে ওদের সঙ্গে একটা ফাইট দেওয়া যেত কিন্তু গোয়ালাদের বসতি আর সেবাকেন্দ্র থাকার জন্যে তা আর সম্ভব হবে না। তাই অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি।

একটু থেমে মুখটা নীচু করে বলল, রাজা বলে পাঠিয়েছে সে কোনদিন তোমার কাছে কিছু চায়নি। আজ তার একটি অনুরোধ আছে, তুমি তার শিশুটির ভার নাও। যদি কোনদিন আমরা ফিরে আসি তাহলে আমাদের সন্তানের মুখ দেখব আবার, না হলে সে তোমার আশ্রয়ে চিরদিন থাকবে।

ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে বললাম, রাজার ছেলে সমস্ত নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমার কাছে বেড়ে উঠবে। তোমরা নিশ্চিন্তে তোমাদের লক্ষ্যের পথে যেতে পার।

দীর্ঘ বিবৃতির পর থামল মায়া মেমসাহেব।

সুবর্ণা বলল, তারপর?

মৃদু হেসে মায়া বলল, তারপর দুজনে দু'জায়গায় ধরা পড়েছিল। একজনের পরিণতি তুমি জান। আর অন্যজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ পেয়েছিল বিচারে।

ছেলেটি এখন কোথায়?

আমার কাছেই আছে। দশ বছরের ছেলে, একেবারে বাবার মুখ বসানো।

প্রকৃতিও প্রকাশ পাচ্ছে বাবার মত। রাজা ওকে দেখলে চমকে উঠত। ঠিক যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

চুপচাপ বসে রইল স্বুবর্ণা মায়ার মুখের দিকে চেয়ে।

এবার মায়া মেমসাহেবের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, আর একটি খবর আছে। আর সেই খবরটা দিতেই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি।

অবাক হয়ে মায়া মেমসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল স্বুবর্ণা।

অনুমান কিছু করতে পার?

স্বুবর্ণা মাথা নাড়ল।

মায়া মেমসাহেব বলল, করা সম্ভবও নয়। আমি ক'দিন কলকাতায় ছিলাম, হয়ত তুমি শুনেছ। সেখান থেকে একটি খবর সংগ্রহ করে এনেছি। স্বুভদ্রা কাল সকালে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। আমি জানি সে আগে আমার কাছেই আসবে। সময় হিসেব করে দেখেছি, বিকেল চারটের আগে সে পৌছতে পারবে না।

তুমি কি করে অনুমান করলে যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ামাত্র সে তোমার কাছেই চলে আসবে?

মায়া মেমসাহেব বলল, মা হলে বুঝতে। ওর ছেলে যে আমার কাছে বাঁধা। তার টানেই আসবে।

পরের দিন দুপুরের ঠিক পরেই আকাশ ছেয়ে ফেলল কালবোশেখীর মেঘ। ঝড়ের মাঝেই যাত্রীদের নিয়ে স্ট্যাণ্ডে ছুটে এল শেষ বাস। যাত্রীরা নেমে দৌড় দিল গন্তব্য পথের দিকে। ধীর স্থির পায়ে বাস থেকে নামল স্বুভদ্রা। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটি ব্যাগ। এগিয়ে গেল মায়া মেমসাহেব। পেছনে স্বুবর্ণা। স্বুভদ্রা আশা করেনি স্ট্যাণ্ডেই মায়া মেমসাহেবকে দেখতে পাবে বলে। সে মায়ার হাতখানা জোরে চেপে ধরে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মায়া বলল, একে তুমি চিনবে না, এ আমার এক পুরোনো বান্ধবী। স্বুবর্ণা।

মায়ার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে স্বুবর্ণার হাত জড়িয়ে ধরে স্বুভদ্রা বলল, চিনব না মানে। রামের সীতাকে চিনব না।

মায়া মেমসাহেব কথার অর্থভেদ করতে না পেরে শুধু চেয়ে রইল। ধূলোর ঝড়ের ভেতর চোখের জল মুছতে লাগল স্বুবর্ণা।

ওরা এক সময় ঝড় মাথায় নিয়ে এসে পৌঁছল ফ্লোরেন্স সেবাকেন্দ্রে। এসেই থমকে দাঁড়াল প্রবেশ পথের সামনে। দশ বছরের ছেলে বিপ্লব ইটের ওপর ইট সাজিয়ে তৈরী করেছে এক শহীদ বেদী। তার ওপর চুন দিয়ে লিখেছে, 'শহীদ রাজা'।

সুবর্ণা অবাক হয়ে দেখল, বেদীটা অশ্চর্য এক আয়না হয়ে গেছে। তাতে ফুটে উঠেছে অবিকল কিশোর রাজার প্রতিচ্ছবি। ওরা তিনজন স্থির চিত্রের মত সেই বেদীর দিকে চেয়ে রইল। ততক্ষণে ঝড় থেমে গিয়ে আকাশ থেকে নমে আসতে শুরু করেছে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিধারা।

আবর্ত

এলোমেলো হাওয়া বইছিল, মাঝে মাঝে ঝাপ্টা মেরে বৃষ্টি। পুরো দুটো দিন সূর্যের মুখ ঢাকা। তাল তাল মেঘ মত্ত হাতির মত আকাশ জুড়ে ভাঙচুর করছে।

ক্যাপ্টেন টিবাও, ফাদার ম্যানরিক আর অভিজাত মুসলিম মহিলাটিকে নিয়ে নৌকোখানা ভোরবেলাতেই খাঁড়ির মুখে এসে পৌছাল। এখন খাঁড়ি ধরে ধরেই দিয়াঙ্গা থেকে রামু পৌছতে হবে। শুধা মরশুমে সমুদ্রপথে দুটো জায়গায় দূরত্ব মাত্র তিরিশ ক্রোশ, কিন্তু এ সময় সমুদ্র ঠেলে এগিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্গোপসাগর উথালপাথাল। রাতদিন ফুঁসছে আর গজরাচ্ছে ছোবল বসাচ্ছে চাটগাঁয়ের ল্যাজে। কর্ণফুলির এপারে চাটগাঁ, ওপারে দিয়াঙ্গা। সবটাই আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দিয়াঙ্গার শাসনকর্তা থাকেন চাটগাঁয়ে। আরাকানরাজ থিরি থু-ধম্মার নিযুক্ত শাসক দিয়াঙ্গা শাসন করেন নামে মাত্র। আসলে পর্তুগীজ হার্মাদদের দাস-ব্যবসার একটি প্রধান ঘাঁটি দিয়াঙ্গা। হুগলী থেকে পুব বাংলার নদীভাসা অঞ্চল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চাটগাঁ, আর ওদিকে পুরো সুন্দরবন এলাকা পর্তুগীজ হার্মাদদের দাস সংগ্রহের স্বর্গরাজ্য। দিয়াঙ্গা থেকে দাসেরা চালান যায় ভারত ভূখণ্ডের পশ্চিমে গোয়া থেকে পুবে আরাকান অব্দি। অবশ্য গোয়া থেকে দাস-ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত দাসদের ইউরোপের বাজারেও নিয়ে যায় চড়া মূল্যে বিক্রির জন্য।

আরাকানরাজ পর্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাৎসরিক একটা লভ্যাংশ পেয়েই খুশি থাকেন। তিনি জানেন বিরাট মোগল শক্তি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলার পূর্বাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে তাদের থাবা। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোগলদের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী। একদিন ওরা চাটগাঁর ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু নৌশক্তিতে দুর্বার পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়াই করা এত সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং সীমান্ত রক্ষার কাজে পর্তুগীজদের নিযুক্ত করে আরাকানরাজ খুবই আত্মতৃপ্ত ছিলেন। করুক না হার্মাদরা লুঠতরাজ আর দাস সংগ্রহের কাজ মোগলদের রাজ্য থেকে। পর্তুগীজদের ওপর মোগলরা যত চটবে ততই মঙ্গল আরাকানের।

কিন্তু রাজনীতির এই অঙ্কে হঠাৎ একটা ভুল দেখা দিল, আর সেই ভুল

সংশোধনের জন্য দিয়াঙ্গা থেকে ঐ নৌকোটির এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে আরাকানের রাজধানী ম্রাউক-উর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

ফাদার ম্যানরিক নৌচালকদের বললেন, খাঁড়ির গা ঘেঁষে রামু পৌঁছতে কত সময় লাগবে বলে মনে কর?

হালে বসেছিল যে সে ভেবেচিন্তে বলল, আড়াই থেকে তিন দিনের কম নয়।

ক্যাপ্টেন টিবাও বলল, তোমরা সাতজন মাল্লা আছ, চার দিনও লাগতে পারে।

মাঝি বলল, চেষ্টা করব তিন দিনের ভেতর পৌঁছতে, তবে সব কিছু নির্ভর করছে আল্লার মর্জির ওপর।

আল্লার নাম শুনে গুলনার বেগম একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মুখ নামাল। তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। লম্বা ছইয়ের শেষপ্রান্তে বসেছিল সে। কেউ তার ভাবান্তর লক্ষ্য করল না।

ক'দিন আগে গুলনারকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন ফাদার ম্যানরিক। দিয়াঙ্গার গীর্জাতেই দীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জলদস্যু ডিয়াগো-ডা-সা তার দস্যুতার শ্রেষ্ঠ আহরণ এই নারী রত্নটিকে দিয়াঙ্গায় রাখতে সাহস পায়নি। ঢাকার শাসনকর্তা খবর পেলেই বাজের মত উড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যেতে পারে, এই আশঙ্কা। ওরা এখন অপহৃতা গুলনারের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ফলাফল না ভেবেই বিপুল বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে দিয়াঙ্গার ওপর। তাই আগে থেকেই সাবধান হতে চায় ডিয়াগো-ডা-সা। ক্যাপ্টেন টিবাওএর জিম্মায় মহিলাটিকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে আরাকানে। ওখানকার ধনী পর্তুগীজদের কাছে গুলনারকে বিক্রি করে নিশ্চয়ই কম দাম সে পাবে না। এমন রূপবতী খানদানী নারীকে লাভ করার জন্য ধনীরা নিলামে মুঠো মুঠো স্বর্ণমুদ্রা ছড়াতেও ইতস্তত করবে না।

নৌকোটা এলোমেলো বাতাসে বাঁক নিয়ে পুব মুখে ছুটল। বৃষ্টির চিকের ভেতর দিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে তীরভূমি। ডাঙার কাছাকাছি এলেই হু হু করে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ম্যানরিক জানতে চাইলেন, কিসের শব্দ?

অভিজ্ঞ টিবাও উত্তর দিলেন, বর্ষায় ভরা নদীনালার জল সমুদ্রে এসে পড়েছে, তারই শব্দ।

প্রকৃতির এই আবছায়ায় নৌকো চালানোই দুষ্কর, কিন্তু মাঝিদের

অতিরিক্ত একটা করে চোখ আছে। ওরা জলের রেখাহীন পথ শত দুর্যোগের ভেতরেও কেমন যেন দেখতে পায়।

মধ্যাহ্নের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে এল। সূর্য কিন্তু তেমনি অদৃশ্য। মাল্লারা ডাঙার কাছে নৌকো ভিড়িয়ে কাদামাটিতে নোঙর করল। অদূরে কতগুলো গাছের জটলা। মাঝিরা রান্নার আয়োজন করতে ওদিকেই চলে গেল। কোন রকমে আগুন জেলে কিছু চাল ডাল সব্জি ফুটিয়ে নিতে পারলে হয়।

ফাদার ম্যানরিক তাঁর একটি মুহূর্তকেও বৃথা অপচয় হতে দিতে চান না। ক্যাপ্টেন টিবাও সবে জর থেকে উঠেছেন। এখনও ক্লান্তি তাঁর শরীরে। শুধু দিয়াঙ্গার পর্তুগীজদের কথা ভেবেই তাঁকে ম্যানরিকের সঙ্গী হয়ে আরাকানে যেতে হচ্ছে এ দুর্যোগে। তিনি দিয়াঙ্গার আরাকানী শাসনকর্তার চোখ এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছেন নৌকাযোগে। এখন ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুজে এসেছে।

ম্যানরিক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মেয়েটির দিকে। ছইয়ের একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে মেয়েটি বসেছিল। তার চোখ দুটো বন্ধ ছিল। গালে জলের দাগ। পোশাকের যে অংশটুকু ছইয়ের বাইরে ছিল তা বৃষ্টির ছাটে ভিজে গিয়েছিল। সেদিকে হুঁস ছিল না মেয়েটির।

ফাদার ম্যানরিক এই নতুন দীক্ষিতা মেয়েটিকে বাইবেলের মহান বাণী শোনাবার জন্য এগিয়ে এসে দেখলেন, মেয়েটির চোখ বন্ধ। অনেক সময় গভীর কোন ভাবনার ভেতর তলিয়ে গেলে মানুষের চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ম্যানরিক তাই পরীক্ষা করে নেবার জন্য অনুচ্চ গলায় বললেন, তোমার পোশাকগুলো দেখছি বৃষ্টির জলে একেবারে ভিজে গেছে।

মেয়েটির চোখ দুটো খুলে গেল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবতীর অপার রহস্যময় দুটো চোখ পলকহীন চেয়ে রইল ম্যানরিকের মুখের দিকে।

ভেতরের দিকে সরে এসে বস। বৃষ্টি এখনও একেবারে থেমে যায়নি। তাছাড়া বাইরের পাটাতনও ভেজা।

মেয়েটি সসঙ্কোচে পোশাক আশাক যদ্দুর সম্ভব সামলে নিয়ে ভেতরের দিকে সরে এসে বসল।

দীক্ষার পরে গুলনারের নতুন নামকরণ হয়েছে 'সারা'।

ফাদার ম্যানরিক বলতে লাগলেন, আমাদের ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর। প্রভু বলেছেন, 'Look unto me, and be ye saved all ends of the earth : for I am god, and there is none else.'

ম্যানরিক হুগলীর অগস্টিনিয়ান মঠে থাকার সময় দু'চারজন কর্মচারীর কাছ থেকে তাদের হিন্দুস্থানী ভাষাটা শিখে নিয়েছিলেন। তিনি গুলনারের কাছে তারই ভাষায় ঈশ্বরের বাণীর অর্থ বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

শেষে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, প্রভু মানুষের চোখের সবটুকু জল মুছিয়ে দেবেন। মৃত্যু, দুঃখ, কান্না, যন্ত্রণা, কোন কিছুই আর থাকবে না। অতীত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটু থেমে ম্যানরিক বললেন, প্রকৃতিস্থ হও সারা. তোমার নবজন্ম হয়েছে।

ভাষাহীন চোখে গুলনার ম্যানরিকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ম্যানরিক অক্লান্ত। বিধর্মীদের নিজধর্মে দীক্ষিত করার মত আর কিছু পুণ্যকর্ম আছে বলে তিনি মনে করেন না। দাস-ব্যবসায়ীরা যখন হতভাগ্য মানুষগুলোকে জাহাজের অন্ধকার খোলের ভেতর থেকে টেনে এনে জাহাজঘাটায় তোলে তখন ফাদার ম্যানরিক তাদের প্রবোধ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন। সব আপনজনদের হারিয়ে দলে দলে মেয়ে পুরুষ যখন চোখের জলে বুক ভাসায় তখন ম্যানরিক তাদের চার্চে নিয়ে গিয়ে নতুন ধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁরই জাতের মানুষ এমন নিষ্ঠুর কাজ করছে বলে তিনি কিন্তু মনে মনে দুঃখিত কিংবা অনুতপ্ত হন না। বিধর্মীরা যে খৃষ্টান হয়ে যথার্থ সত্যধর্মের সন্ধান পাবে এই তৃপ্তিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ম্যানরিক গুলনারের মুখোমুখি বসে কতক্ষণ বাইবেলের সত্যধর্ম প্রচার করে চললেন। গুলনার কিছু একটা হয়তো শুনল, বাকী সব তার উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার স্রোতে কোথায় ভেসে চলে গেল।

ম্যানরিক নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে যাবার আগে বললেন, যখন পার্থিব কোন যন্ত্রণা তোমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করবে তখন ঈশ্বরপুত্র যীশুর সীমাহীন যন্ত্রণার কথা স্মরণ কোরো। তিনি সমস্ত মনুষ্যজাতির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

ম্যানরিক স্বস্থানে ফিরে গেলেন। গুলনার ভারাক্রান্ত প্রকৃতির দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল।

রান্না খাওয়ার পাট চুকতে কেটে গেল অনেকখানি সময়। শুরু হল যাত্রা। ছ'জন দাঁড়ি অবিরাম দাঁড় টেনে চলেছে। দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, শনশন হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কখনো খাড়ি থেকে দূরে কখনো কিনারার কাছে বরাবর চলেছে

নৌকো। ছইয়ের মাঝ-বরাবর দড়ি দিয়ে কালো রঙের একটি পর্দা টাঙানো। প্রয়োজন মত পর্দাটি ফেলে রাখা কিংবা একদিকে সরিয়ে দেওয়া যায়। এখন পর্দাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। এপারে ম্যানরিক আর টিবাও বিশ্রাম নিচ্ছেন, ওপারে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে গুলনার। রাতজাগা চোখে ঘুম নেমেছে তিনজনেরই।

গলুইয়ের একপ্রান্তে দক্ষ মুসলমান মাঝিটি স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্যের দিকে মুখ করে হাল ধরে বসে আছে। সে গুলনারকে প্রথমদিনই দেখেছে জাহাজ-ঘাটায়। তখন সে ক্যাপ্টেন ইমানুয়েলের জাহাজ নোঙর করে সবে উঠে এসেছে ডাঙায়। ডিয়াগো-ডা-সা'র জাহাজ ভিড়ল। পঁচিশ বছর আগে সে যেমন জাহাজের খোলের ভেতর থেকে উঠে এসে আলোর প্লাবনে চোখে কিছুক্ষণ আঁধার দেখেছিল, তারই মত হতভাগ্যরা ডিয়াগোর জাহাজ থেকে ডাঙায় উঠতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় হাত ধরে অতি সন্তর্পণে নামান হল গুলনারকে। ড্রামের তালে তালে স্বর মিলিয়ে বিউগল বাজান হল। শেষে উল্লাসধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে কয়েকবার তোপধ্বনি করা হল। এমন একটি সফল অভিযানের জন্য এটুকু আনন্দপ্রকাশ যে অপরিহার্য।

কিন্তু মেয়েটি দিয়াঙার হর্ষোৎফুল্ল খৃষ্টান বাসিন্দাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিল। শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছিল তার মুখে। মাঝি আইনুলের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, মেয়েটি এ দুনিয়ার নয়, বেহেস্তের কোন হুরী, পথ হারিয়ে হঠাৎ নেমে এসেছে দিয়াঙায়।

তারপর এই দুর্যোগের দিনে তার মালিক ইমানুয়েলের আদেশে সে এই সম্মানীয় যাত্রীদের নিয়ে চলেছে আরাকানরাজের আর এক মহাল রামুতে।

গুলনার ঘুমিয়ে আছে। তার আধখানা মুখ দেখতে পাচ্ছে আইনুল। পাতায় ঢাকা আধখানা পদ্ম যেন। দেখলেই বোঝা যায় মস্তবড় খানদানী পরিবারের মেয়ে। হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তার যে যে দুশমনরা বেহেস্তের গুল-বাগিচা থেকে সেরা ফুলটি ছিঁড়ে এনেছে তাদের কথা আলাদা। সংসারে জন্মেছে তারা ভিখারী, হয়ে, ভাগ্য তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। যেখানে যাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই রুজিরোজগার। কিন্তু এ মেয়ে তো তা নয়। এ যে বাদশার ঘর আলো করে থাকবার জন্য জন্মেছে।

আইনুলের বুকখানা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। একটা পুরনো ক্ষততে ঘা

লেগে রক্ত ঝরতে লাগল। তাকে যখন হার্মাদরা ধরে আনে তখন তার কুঁড়ে ঘরেও এক বছরের একটা মেয়ে তার বিবির কোলে ঘুমিয়েছিল। সে ভোর রাতে ঘর থেকে নদীর ধারে বেরিয়ে এসেছিল। নৌকো নিয়ে ব্যাপারীর সওদা আনতে যাবার কথা ছিল গঞ্জে। কিন্তু সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হল।

আজ এই মেয়েটিকে দেখে পঁচিশ বছর পরে আইমুলের নিজের মেয়েটির কথা মনে পড়ল। সে এখন নিশ্চয়ই এত বড়টি হয়েছে। সাদি হয়ে গেছে তার। কাজকর্ম করছে ক্ষেত খামারে। আল্লা সুখে রাখুন তাকে। কিন্তু এত বড় ঘরের মেয়েটি কি দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে চলেছে সঙ্গে। নিশ্চয়ই সাদি হয়েছে মেয়েটির। কার হারেম আলো করেছিল কে জানে। সহসা পিতৃস্নেহের একটা ঢেউ বুক ঠেলে বেরিয়ে এল আইমুলের। সে ঢেউ পাটাতনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে।

পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে। সূর্য দেখা না গেলেও ঝড়ের মেঘে তার নিভে আসা আগুনের রঙ লেগেছে।

একটা মেঘ ঝড়ো হাওয়ায় টাল খেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বুকে তার শেষসূর্যের রক্তলেখা। মনে হচ্ছে নিষ্ঠুর কোন শিকারীর তীরে বিদ্ধ হয়ে একটা বিপুলকায় বিহঙ্গ মহাশূন্য থেকে রক্তক্ষরণ করতে করতে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসছে।

সে রাতের মত তীরে বাঁধা হল নৌকো। মাঝি আইমুল বর্ষায় বিঁধে দুটো মাছ ধরেছিল। সে নিজেই আমিষ রান্না করে সবাইকে খাওয়াল।

মাঝি আইমুল বাঙলাদেশের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই সে জলের পোকা। নৌকো চালনায় সে একেবারে পাকাপোক্ত। তাই পঁচিশ বছরের ক্রীতদাস জীবনে সে পেয়েছে দক্ষ মাঝির সম্মান। ক্যাপ্টেন ইমানুয়েল দাস হিসেবে তাকে কিনে নিলেও নিজে কিন্তু অধিকাংশ দিয়াজাবাসী পর্তুগীজের মত দাস-ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত নন। গোয়া, মালাবার, দক্ষিণ-ভারত আর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ নিয়ে তাঁর যাতায়াত। প্রধানত মশলা আর মুক্তো নিয়ে সিংহল থেকে আরাকান তিনি বিক্রি করে বেড়ান। তাঁর জাহাজের প্রধান সঙ্গী আইমুল।

এই দুর্যোগের আবহাওয়ায় হঠাৎ গত সন্ধ্যায় তার ডাক পড়ল খ্রীষ্টিয় মঠে। ইমানুয়েলই মিশনের লোকের মারফৎ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মঠে তখন বসেছিলেন ফাদার ম্যানরিক, ক্যাপ্টেন টিবাও আর ইমানুয়েল।

ইমান্থয়েলই কথা বললেন, তোমাকে একবার রামু যেতে হবে আইনুল।

রামু! আবহাওয়া বড় দুর্যোগে ভরা।

সেজন্যেই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি আইনুল।

ক'জন যাবেন?

তিনজন।

তাহলে ছোট নৌকোখানাই নিতে হবে। সমুদ্রপথে যাওয়া যাবে না, খাঁড়ি ধরেই যেতে হবে।

অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপারটা, আর আজ মাঝরাতেই রওনা হতে হবে।

ক'জন মাল্লা নেব?

তোমার যে কজ'ন দরকার।

ছ'জন আরাকানী হলেই চলবে।

যাবার পথে একেবারে ডেকে নিয়ে যাও। আর মালপত্র সব মিশনের লোক নৌকোয় তুলে দিয়ে আসবে। তোমরা রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে একেবারে নৌকোয় চলে যাও।

আইনুল সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। ইমান্থয়েলের দিকে চেয়ে বলল, খাঁড়ি দিয়ে যেতে হবে, জঙ্গল পড়বে। বন্দুক একটা থাকলে ভাল হয়।

ক্যাপ্টেন টিবাও বললেন, বন্দুক একটা আমার সঙ্গে থাকবে, জোড়া বন্দুকের দরকার নেই।

ইমান্থয়েল বললেন, ব্যাস্, সব ব্যবস্থাই পাকা, এবার তুমি আসতে পার।

আইনুল চলে গেল।

ইমান্থয়েল পঁচিশ বছর ধরে আইনুলকে দেখছেন। বুদ্ধি, পরিশ্রম আর বিশ্বস্ততার এমন সমন্বয় তাঁর জীবনে আর একটিও তিনি দেখেন নি। তাই আইনুল তাঁর কাছে আজ আর একজন ক্রীতদাস নয়, একান্ত বিশ্বস্ত একজন অনুচর। দুর্যোগ, দুর্দিনে পরামর্শদাতা এক সঙ্গী। ক্রীতদাস আইনুলের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে ইমান্থয়েল নৌকোয় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন।

পঁচিশ বছর ক্রীতদাস জীবন পূর্ণ হবার পর ইমান্থয়েল এই তো সেদিন আইনুলকে বলেছিলেন, তোমার এত দিনের অক্লান্ত সেবায় আমি মুগ্ধ হয়েছি আইনুল। ব্যবসায়ে তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু তুমি মুক্তি চাইলে আমি এখুনি রাজি। দেশে নিরাপদে যাতে ফিরতে পার সে ব্যবস্থা আমি

করে দিতে পারি। অর্থের অভাব হবে না। জমি জিরেত কিনে শেষ জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে।

আইনুল বিনীত হাসি হেসে বলেছিল, কিন্তু সাহেব, ফিরতে গেলে আমার একটা জিনিস যে চাই।

ইমানুয়েল সাগ্রহে জানতে চাইলেন, কি চাই বল? তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

আমার যৌবন সাহেব।

ইমানুয়েল একজন ক্রীতদাসের মুখে কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সত্যিই তো, আইনুল পঁচিশটা বছর সমুদ্র চষে তাঁর রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, কিন্তু পরিবর্তে সাগরের লোনা জলে তিলে তিলে বিসর্জন দিয়েছে তার যৌবন। যে যৌবনকে পার্থিব কোন মূল্যেই আর কেনা যাবে না।

আইনুল বুঝতে পারল ইমানুয়েল আহত হয়েছেন। তাই সে প্রবোধ দেবার ছলে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমি মস্করা করছিলাম সাহেব। আসল কথাটা কি জানেন, দেশে গেলেও আমি আর টিকতে পারব না। সমুদ্দুরে ঘুরলে নেশা ধরে যায়, সমুদ্দুর ছেড়ে বেশিদিন আর কোথাও থাকতে পারব না। তাছাড়া···।

ইমানুয়েল পুরো কথাটা শোনার জন্য আইনুলের মুখের দিকে তাকালেন।

আইনুলের মুখে এবারও হাসি, আমাদের আর কোনদিন কেউ দেশ গাঁ, ঘরবাড়ি থেকে কেড়ে নিয়ে আসবে না এ কথা কি আপনি দিতে পারবেন সাহেব?

এবারও ইমানুয়েল এই সহজ সত্যটির জবাব দিতে না পেরে সামান্য ক্রীতদাসের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

আইনুল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এ মানুষটিকে ছেড়ে সে কোনদিন কোথাও যাবে না।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু আগে নৌকোটা ডাঙার দিকে ভেড়ার চেষ্টা করছে এমন সময় সামাল সামাল রব উঠল। আচমকা একটা ঘূর্ণি ঝড় সমুদ্রের জলরাশিকে স্তম্ভের আকারে ঘোরাতে ঘোরাতে তেড়ে এল। আইনুল হাল ধরে দাঁড়িয়ে বেঁকে ঘুরিয়ে চলল আর সমানে হাঁকতে লাগল, জোরে, আরও জোরে।

সবাই এই মুহূর্তে অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি মূক পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কিন্তু জীবনে বহু বিপদের মুখোমুখি যে দাঁড়িয়েছে তাকে সহসা বিচলিত করা বড় শক্ত। ঢেউয়ের চরিত্র আইনুলের অচেনা নয়। সে তার নৌকোকে আশ্চর্য দক্ষতায় ঢেউয়ের চূড়ায় তুলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তীরের দিকে নিয়ে চলল।

একটা খাঁড়ির খাঁজে নৌকোটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আইনুল লাফিয়ে নামল ডাঙায়। তিন চারজনে মিলে একটা লোহার শেকলে নৌকোটা বেঁধে তীরের গাছপালার সঙ্গে সেটাকে জড়ালে। কাজ শেষ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলস্তম্ভটা আছড়ে পড়ল, আর বিপুল জলরাশির ওপরে কলার মোচার মত ভেসে উঠতে দেখা গেল নৌকোটাকে। আইনুল তার সঙ্গীদের গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে নিতে বলেই চেন আঁকড়ে নৌকোর দিকে এগোতে লাগল। বাতাস আর ঢেউ সেই মুহূর্তে মনে হল আইনুলকে কুটোর মত উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এসব মহা দুর্যোগের মুহূর্তে কি যেন এক অদৃশ্য শক্তি ভর করে আইনুলের ওপর। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত আইনুল শুধু শেকল ধরে ধরে এক সময় নৌকোয় উঠে এসে হাল আঁকড়ে ধরল। এতগুলো প্রাণ তাকে বাঁচাতে হবে, নিজের প্রাণের মায়া করলে আর সব ক'টি প্রাণকেই ক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতে হয়।

জলস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে এল। নৌকো নেমে খাঁড়ির খাঁজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কেবল নৌকোর তলায় কিছু জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মাঝে মাঝে ব্যর্থ আক্রোশ প্রকাশ করে যাচ্ছে।

ভেতরের জিনিসপত্র সব ভিজে তালগোল পাকিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন টিবাও ভেজা পোশাকেই হাতের বন্দুকটা ওপরে তুলে ধরে রেখেছেন। ফাদার ম্যানরিক কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তিনি নতুন দীক্ষিতা মেয়েটিকে বাইবেলের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মুখে নোয়ার অক্ষত নৌকোটির গল্প শুনিয়ে চলেছেন। গুলনার নির্বিকার। প্রকৃতির এই ঝড় আর জলস্ফিতি নাড়া দিতে পারেনি তাকে। জীবনের যে ঝড় তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে তার ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপের কাছে এ ঝড় বড়ই অকিঞ্চিৎকর। গুলনার তাই নিরুদ্বিগ্ন। এক সময় তার মনে হয়েছিল এই উত্তাল জলের মধ্যে নিজেকে স'পে দিয়ে সে অনন্ত অতলে তলিয়ে যাবে। তার সব দুঃখ, সব অপমানের অবসান ঘটবে। কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গে প্রকৃত কাজের সংযোগ ঘটাতে পারেনি সে। পরমুহূর্তেই তার পঁচিশ বছরের দেহটার ওপর প্রচণ্ড আকর্ষণ বা মায়া জন্মেছিল। নিজের দেহ বিসর্জনের ভাবনা চলে

যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ধরনের নির্ভার অবস্থায় সে বসেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ পাদ্রী সাহেবটি বাইবেলের গল্প শোনাতে এগিয়ে এসেছিল তার দিকে।

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরে দু'টি রাত আর একটি দিন ঐ খাঁড়ির ভেতরেই নৌকোটা বাঁধা রইল। আইমুলের তত্ত্বাবধানে নৌকোর ছোটখাট ভাঙা অংশগুলোর মেরামত কাজ চলল। ক্যাপ্টেন টিবাও আর ফাদার ম্যানরিক তিনটি আরাকানী মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে ডাঙায় নেমে নদীর তীর বরাবর পাখি শিকার করে বেড়াতে লাগলেন।

আইমুল কাজের ফাঁকে ফাঁকে নৌকোয় একাকী বসে থাকা বিষণ্ণ মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াত। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা যেত গুলনারের চোখেমুখে আপনজনকে কাছে পাবার স্বস্তি আর আনন্দ।

আইমুল আকাশের দিকে চেয়ে বলে, আজ মাঝে মাঝে সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে, তুমি মা ভেজা পোশাকগুলো শুকিয়ে নিও। নাহলে অসুখ করবে। প্রাণটাকে যখন আমরা শেষ করে দিতে পারব না তখন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে থাকতে হবে মা।

কাল সকালে অবশ্যই নৌকো ছাড়তে হবে। ফাদার ম্যানরিক আর ক্যাপ্টেন টিবাও বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কবে যে আরাকানের রাজধানীতে পৌছতে পারবেন তা ঈশ্বরই জানেন। রাজার যুদ্ধজাহাজগুলো দিয়াঙার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলে আর করবার কিছু থাকবে না।

পরের দিন ভোরবেলা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নৌকো বেরুল রামু লক্ষ্য করে। মাল্লারা ক্যাপ্টেন টিবাওয়ের অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে জান লড়িয়ে দাঁড় টানতে লাগল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা আর সম্ভব হল না। একটা পাহাড়ী নদীর পাশে এসে সন্ধ্যা ঘনাল।

নদীর মুখটা ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। দূরে রামুর শাসনকর্তার কাঠের প্রাসাদের চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সমুদ্র আর নদী-মোহানার এটুকু পথ বড় বিপজ্জনক। ছোটখাট কয়েকটা চর উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে চর এড়িয়ে নৌকো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অন্ধকারে ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো সোজা গিয়ে যদি চরের মাটিতে সিঁধিয়ে যায় তাহলে তলা ফুটো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর যদি নাও ভাঙে তাহলেও বসে গেলে আর এক বিপদ। ভাটার পর জোয়ারের জলের ধাক্কায় নৌকোটা যদি সহজে না ওঠে তাহলে সমুদ্রের জল নৌকোটাকে ডুবিয়ে তার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। অতএব

সে রাতের মত নদীর মুখে জঙ্গল থেকে হাত কয়েক দূরে নোঙর ফেলা হল।

ক্লান্ত মাল্লাদের সঙ্গে সকলেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে নৌকোর ভেতর শুয়ে পড়ল।

রাতে আইনুলের জিম্মায় বন্দুক রেখে ক্যাপ্টেন টিবাও নিশ্চিন্তে নিদ্র যান। ইমানুয়েল বলেছেন, আইনুল একশোভাগের ওপর বিশ্বাসী। বেইমানী তার রক্তে নেই।

তাই আইনুলই রাতের পাহারাদার। সে হালে ঠেস দিয়ে গলুইতে পা ছড়িয়ে ঘুমোয়। পাশে পড়ে থাকে বন্দুক। সামান্য কুটোটি পড়লেও আইনুল সজাগ হয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে হাত তার বন্দুকের ওপর চলে যায়। আরও একটি দিশি অস্ত্র তার পাশে থাকে, সেটি হল বর্শা। ক্ষীপ্র হাতে জলে ভাসমান মাছকে সে বর্শা গেঁথে তুলতে পারে। তাই বর্শাটা তার সারা সময়ের সঙ্গী। আইনুল চোখ বন্ধ করে হালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইল কতক্ষণ। মেয়েটির ওপর সত্যিই তার মায়া পড়ে গেছে। রামুতে পৌছে যে যার পথে চলে যাবে, আর কোনদিন সে মেয়েটিকে দেখতে পাবে না। এই ক'টা দিন না দেখা হলেই বুঝি ভাল ছিল। কোথায় গিয়ে কার হাতে পড়বে, কোন্ দাসী-হাটে বিক্রি হবে, তার ঠিকানা কে জানে। এই মুহূর্তে আইনুলের মনে হল, মেয়েটি ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পেলে তার বুকখানা ভেঙে যাবে।

এমনি এলোমেলো সব চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ল আইনুল। এরই ভেতরে তার তন্দ্রা এসে গেল।

আইনুলের সামনাসামনি ছইয়ের ভেতর শুয়ে আছে মেয়েটি। তার পরেই পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওপারে সাহেব আর মাল্লারা ঘুমে অচেতন। গুলনার ঘুমুবার আগে অনেক চোখের জল ফেলেছিল। একটা বিভীষিকা তাকে পেয়ে বসেছিল। এরপর সে কোথায় কার হাতে গিয়ে পড়বে। কোন নরখাদকের ভোজ্য হতে হবে তাকে! কেন সে এই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার সব অসম্মান, সব জ্বালা জুড়োতে পারছে না! এই সব নানা চিন্তায় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কতক্ষণ কাঁদল। শেষে সামনে হেলান দিয়ে বসে থাকা আইনুলের দিকে চেয়ে মনে কিছুটা ভরসা পেল। এই দয়ালু মানুষটিই তাকে বলেছে, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে, তাহলেই অনেক দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। হায়, এই মানুষটির স্নেহের ছায়ায় সে যদি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত।

এই সব ভাবনার ভেতর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গুলনার।

জোয়ার এসেছে সম্ভবত। দু-একবার ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দে নৌকোটা সামান্য দুলে উঠল। ওতেই ঘুম ভেঙে গেছে আইনুলের। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই নৌকোটা একদিকে কাৎ হল। অন্ধকারে কি যেন একটা নৌকোর ভেতর এসে পড়ল। ছইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই কালো যমদূতটা। আইনুল পাঁচ ফলার বর্শাটি মুহূর্তে হাতে তুলে নিল। বন্দুক ছুঁড়লেই আহত হবে গুলনার। পলকের মধ্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঐ বর্শাখানা আইনুল গেঁথে দিল জানোয়ারটার পেছনে। গুলনারের ওপর থাবা পড়বার আগেই প্রবল গর্জনে রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বাঘটা লাফিয়ে ঘুরেই আইনুলের দিকে থাবা ছুঁড়ল। তারপর মানুষ আর জানোয়ার দুটিতে জড়াজড়ি করে পড়ল নদী মোহানার জলের মধ্যে। শব্দ, ধ্বস্তাধ্বস্তি আর গর্জনে ঘুম ভেঙে গেছে নৌকারোহীদের। প্রথমে দিশেহারা হয়ে গেলেও কিছু একটা অঘটন ঘটেছে ভেবে নিয়ে সকলে চিৎকার আর হাঁকডাক শুরু করে দিলে। অন্ধকারে সকলে সকলকার নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু সবার সাড়া পাওয়া গেলেও আইনুলের কোন সাড়াই মিলল না। ক্যাপ্টেন টিবাও হালের কাছে এসে দেখলেন, বন্দুকটা তেমনি পড়ে আছে, আইনুল নেই। এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে জলের ওপর হাল ধরে উঠে আসার চেষ্টা করছে আইনুল ভাই।

দু-একজন সাহসী মাল্লা হাত ধরাধরি করে ন্যমল হালের প্রান্তে জল ছুঁয়ে। তারা অনেক কষ্টে নৌকোয় তুলল আহত আইনুলকে।

মশাল জ্বালা হল। আইনুল ধুঁকছে। তার পিঠের একটা অংশের খানিকটা মাংস ঝুলে পড়েছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান দিয়ে। নৌকোর সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে আইনুল যে বাঘের শিকার হয়েছিল, সে কথাটা জানতে পেরে টিবাও আইনুলের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে যেদিক দিয়ে বাঘ উঠেছিল, সেদিকের প্রথম শিকার ছিল গুলনার।

নিজের পোশাক ছিড়ে গুলনার আইনুলের চুঁইয়ে পড়া রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগল। কাটা ছেঁড়ায় লাগাবার জন্য গাছগাছালি থেকে তৈরি এক ধরনের মলম আরাকানী মাল্লাদের কাছেই ছিল। হাঙর, কামোটের কামড় থেকে ঐ মলমই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। গুলনার ধীরে ধীরে অতি যত্নে সেই মলম লাগিয়ে দিল আইনুলের ক্ষতস্থানে। হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। সবাই নৌকোর ছইয়ের ভেতর ঢুকল। ক্যাপ্টেন টিবাও শেষ রাতটুকু হাতে বন্দুক নিয়ে পাহারায় কাটালেন। গুলনারের কোলে মাথা রেখে আইনুল আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ে রইল। গুলনার চোখের জল ফেলে আইমুলের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। একটি অসুস্থ শিশুকে যেন উদ্বেগে আকুল জননী আগলে রেখেছে।

ভোর হতেই মাল্লারা রামুর উদ্দেশ্যে নৌকো ছেড়ে দিলে। মাল্লাদের ভেতর প্রবীণ আরাকানীটি হালে গিয়ে বসল। এদিকে আইমুল জ্বরে প্রায় বেহুঁস। মাথাটা ঘন ঘন জলের হাত দিয়ে মুছে নিচ্ছিল গুলনার। ফাদার ম্যানরিক সুযোগ খুঁজছিলেন। মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখন তাকে বিপদ আর পাপের ভয় দেখিয়ে অনেক সময় ধর্মান্তরিত করা যায়। ম্যানরিক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্যটা জেনে এসেছেন। কিন্তু আইমুল এতটাই বেহুঁস যে তাকে ঠিক এ সময়ে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বোঝানো বাতুলতা মাত্র।

ধীরে ধীরে নৌকো এসে রামুতে ভিড়ল। ক্যাপ্টেন টিবাও আর ম্যানরিক জানতেন রামুর শাসনকর্তা দিয়াঙার শাসনকর্তাকে আদৌ পছন্দ করেন না। দুজনেই আরাকানরাজের আত্মীয়, তাই দুজনেই মনে মনে পরস্পরকে ঘৃণা ও ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

ফাদার ম্যানরিক, ক্যাপ্টেন টিবাও আর সম্ভ্রান্ত মহিলা গুলনারের জাহাজঘটায় আগমন সংবাদ নিয়ে একটি মাল্লা শাসনকর্তার প্রাসাদের দিকে চলে গেল। ফাদার ম্যানরিক অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে শাসনকর্তার উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে দিলেন।

যথাসময়ে দেখা গেল তিনটি শিবিকাসহ শাসনকর্তার পথ-প্রদর্শক এসে গেছে।

ফাদার ম্যানরিক ও ক্যাপ্টেন টিবাও অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিলম্ব না করে এখুনি যাত্রা করা দরকার। নৌকো থেকে মালপত্র শিবিকায় তোলা হল। কিন্তু আইমুলের মাথাটি কোলে নিয়ে এখনও যে বসে আছে মমতাময়ী মেয়েটি।

ফাদার ম্যানরিক গুলনারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, সারা, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। রামুর শাসনকর্তা আমাদের তিনজনের জন্যে তিনখানা শিবিকা পাঠিয়েছেন।

কিন্তু ফাদার, এই আহত মানুষটিকে একা নৌকোয় ফেলে কি করে যাই?

শাসনকর্তাটি অসন্তুষ্ট হলে আরাকানে পৌঁছনোর ব্যাপারে অসুবিধে হতে পারে। ওঁর সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তুমি চিন্তিত হয়ো

না সারা, ওর সঙ্গী মাল্লারাই ওকে ভাল করে তুলবে। জলদি চলে এস আমার সঙ্গে।

ফাদার ম্যানরিক নৌকো থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আইহুলের ব্যাপারে মাল্লাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। গুলনার ধীরে ধীরে নিজের বালিশের ওপর আইহুলের মাথাটা নামিয়ে রাখলে। আইহুল এ সময় চোখ মেলে তাকাল। দু'টি চোখই তার লাল। সে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল গুলনারের মুখের দিকে। চিনতে পেরেছে। সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে, অতি ধীরে বলতে লাগল ক'টি কথা।

আমরা এখন রামুতে এসে গেছি, তাই না?

হ্যাঁ, চাচাজী।

তোমাকে তো এখন চলে যেতে হবে মা।

গুলনার মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কাঁদিস নারে মা, আল্লার কাছে চলে যাবার আগে পর্যন্ত তোর এ বেটা তার আম্মাজানকে মনে রাখবে।

ফাদার ম্যানরিক বাইরে থেকে সারা সারা বলে ডাকতে লাগলেন।

আইহুল বলল, আয় মা, আর দেরি করিসনে। তোর আমার ইচ্ছা বলে তো কিছু নেই, ওদের ইচ্ছাই এখন আমাদের পূরণ করতে হবে। যাবার সময় পেছনের টান রাখিস না মা। আল্লা চাইলে আবার কখনও দেখা হয়ে যাবে।

গুলনার অসুস্থ মানুষটির মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আল্লার কাছে ওর জন্য নিরাময় প্রার্থনা করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল।

তিনজন তিনটি শিবিকায় আরোহণ করলে শিবিকা-বাহকেরা দ্রুততালে হাঁক পাড়তে পাড়তে রামুর শাসনকর্তার প্রাসাদ লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

॥ দুই ॥

ফাদার ম্যানরিক আর ক্যাপ্টেন টিবাওয়ের আরাকানের রাজধানী অভিমুখে যাত্রার একটি পশ্চাদপট আছে। আরাকানের রাজধানী ম্রাউক-উয়ের পর্তুগীজ পল্লী থেকে সমুদ্র অতি নিকটে। একদিন কর্মরত কয়েকজন পর্তুগীজ দেখতে পেল আরাকানরাজের সমুদ্রগামী প্রায় পাঁচশো জাহাজ একসঙ্গে একঠাঁই এসে মিলেছে। তারা সমুদ্রের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে যুদ্ধের মহড়া শুরু করে দিয়েছে।

পর্তুগীজরা ভাবল, এমন ঘোর বর্ষায় যুদ্ধের আয়োজন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। পর্তুগীজ কিংবা আরাকানী জাহাজগুলি বছরের সব ঋতুতেই সমুদ্রে চলাচল করতে পারলেও বর্ষাকালটা যুদ্ধের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তাই এই অসময়ের মহড়া পর্তুগীজদের ভাবিয়ে তুলল। তারা কারণ অনুসন্ধানে লেগে গেল।

রাজধানী ম্রাউক-উ পাহাড়, প্রান্তর, নদী আর সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। প্রায় দুর্ভেদ্য এই রাজধানীর প্রাসাদটিও দুর্ভেদ্য। একটি পাহাড়ের ওপর প্রাসাদটি অবস্থিত। প্রাসাদের চারধার দুর্গের মত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পর পর তিনটি প্রাচীর বৃত্তাকারে প্রাসাদটিকে বেষ্টন করে আছে। কেবল রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী ছাড়া অন্য কোন মানুষের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। পাহাড়ের ঠিক নিচেই রাজার সমূহ কার্যালয় অবস্থিত। সেখানেও বিচারালয় রয়েছে। কেবল চরম দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরাই মহারাজের কাছে শেষ বিচারের আর্জি নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বিদেশী কোন দূত কিংবা দর্শনপ্রার্থী বিশেষ অনুমতিপত্র সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে প্রবেশের অধিকার পায়।

এহেন সংরক্ষিত এলাকার বাইরে থেকে একটি মাত্র শিবিকার প্রবেশের জন্য অনুমতি-পত্র স্বয়ং মহারাজের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে। সেই শিবিকাটিতে এক পর্তুগীজ রমণী মাঝে মাঝে প্রাসাদের রানীমহলে আসা যাওয়া করে। এই রমণী সঙ্গে আনে মূল্যবান সব মুক্তা। তার স্বামী মুক্তা ব্যবসায়ী। কিন্তু পুরুষের কোন প্রবেশাধিকার নেই অন্দরমহলে। তাই স্বামীর কাছ থেকে মুক্তা নিয়ে মহিলাটি বিক্রি করে যায় প্রাসাদের রানীনিবাসে। মহারাজ থিরি-থুধম্মা তাঁর ব্রহ্মদেশীয় রানীটিকে বড়ই ভালবাসেন। ঐ রানীটিই আবার মুক্তার সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী। তিনি নিজে মুক্তা নির্বাচন করে দেন প্রাসাদের অন্যান্য মহিলাদের। তাছাড়া তাঁর বিবাহের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য তিনি ঐ তিথিতে প্রতি বছর রাজাকে কোন দুর্মূল্য বস্তু উপহার দেন। কোন বছর রত্নখচিত তরবারী, কোন বছর বা অতি মূল্যবান মুক্তার মালা। কোনবার গজদন্ত নির্মিত ক্ষুদ্র প্যাগোডা, কোনবার বা শুক্তির শুভ্র অংশ দিয়ে নির্মিত অপূর্ব পেখমধারী ময়ূর। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে রানী বর্মামুলুক থেকে এনেছিলেন এক দক্ষ কারিগর। তাকে প্রাসাদ নগরীতে সপরিবারে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন তিনি। সেই কারিগরই রাজপ্রাসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিকার।

পর্তুগীজ মহিলাটি তীক্ষ্ণধী। নানা ধরনের গল্প রচনা করতে সে ওস্তাদ। গল্প শুনিয়ে সে রানীর মন জয় করে নেয়, তারপর কথার সূত্রে টেনে বের করে রাজ্যের অনেক গুপ্ত খবর।

রানী এবারও তাঁর বিবাহ-তিথি যথারীতি পালন করবেন শ্রাবণী পূর্ণিমায়। মুক্তা ব্যবসায়ী মহিলাটি রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে শিবিকারোহণে প্রবেশ করল। রানীমহলে তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

প্রথা অনুযায়ী সে প্রথমে ঢুকল ব্রহ্মদেশীয় রানীর ঘরে। এই ঘরেই আহ্বান জানানো হয় রানীমহলের অন্যান্য বিশিষ্ট মহিলাদের। যতক্ষণ ডাক না আসে ততক্ষণ কারু প্রবেশের অধিকার নেই।

রানী পর্তুগীজ রমণীটিকে দেখে উল্লসিত হলেন। বললেন, আমি প্রতিদিনই তোমার পথ চেয়ে আছি। তুমি তো জান, শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিটি আমার কাছে কত প্রিয়।

জানি মহারানী।

তুমিই তো আমার প্রিয় জিনিসগুলি বরাবর সংগ্রহ করে এনে দাও। কোথায় সিংহল থেকে গজদন্ত, মান্নার থেকে শুক্তি আর মুক্তো। তাই দিয়েই তো আমি মহারাজের উপহার তৈরি করি। এবার বড় চিন্তায় পড়েছিলাম তোমার বিলম্ব দেখে।

আমি আপনাকে খুশি করে দেবার মত জিনিস এনেছি মহারানী, কিন্তু ঐ একটিমাত্র জিনিসই আজ আমার কাছে আছে, আর কিছু নেই।

কই, দেখি দেখি কি এনেছ?

তার আগে আমার এখানে আসতে যে বিলম্ব হল তার কারণটুকু বলে নিই।

বেশ, তাই আগে শুনি।

আমার স্বামী যে জাহাজ নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, সে কথা আপনার অজানা নয়, মহারানী।

তোমার স্বামী যে বড় রত্ন ব্যবসায়ী সে কথা মহারাজও জানেন।

মহারানী, আপনি এ কথা হয়তো জানেন না যে আমার স্বামী আপনাদের এই মিলন-তিথিটিকে কি গভীর মর্যাদার সঙ্গে মান্য করেন।

শুনে বড় পরিতৃপ্ত হলাম।

কিন্তু মহারানী, এবার আপনার এখানে আসতে বিলম্ব হবার জন্য আপনি যতখানি চিন্তিত ছিলেন তার চেয়ে আমি কম চিন্তিত ছিলাম না।

কি রকম ?

আমার স্বামী যেখানেই থাকুন বর্ষা শুরু হবার আগে তিনি এসে আপনার জন্য তাঁর সংগৃহীত জিনিসটি দিয়ে যাবেনই। কিন্তু এবার তিনি রাজধানীতে ঢুকতে গিয়ে বড় বিপদে পড়েছিলেন।

কেন, কি বিপদ ?

তিনি তাঁর জাহাজ নিয়ে আসতে গিয়ে দূর থেকে দেখলেন, শত শত যুদ্ধ জাহাজ রাজধানীকে ঘিরে রয়েছে। তিনি এ পরিস্থির জন্য তৈরি ছিলেন না, তাই কিছুটা ভয় পেয়ে জাহাজ নিয়ে দূরে সরে গেলেন।

-তারপর ?

তারপর মহারানী, মনে তাঁর একদিকে উদ্বেগ, অন্যদিকে অশান্তি। উদ্বেগের কারণ, এতগুলি যুদ্ধ-জাহাজের সমাবেশ, আর অশান্তির কারণ, আপনার জন্য সংগ্রহ করে আনা বস্তুটি যথাসময়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না।

এখন তাহলে এলেন কি করে ?

শুধু মহারানীর সম্মান রাখবার জন্যই বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে।

জাহাজ নিয়ে আসতে পারলেন তো ?

কি করে তা সম্ভব, মহারানী ! বহু দূরে এক খাঁড়ির মধ্যে জাহাজটি রেখে তিনি দু'দিনের পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন। তার আগে বেশ কয়েকদিন জাহাজ নিয়ে ঘুরেছেন সমুদ্রের মধ্যে। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল যথা সময়ে আপনার জিনিসটি আপনার হাতে পৌছে দেওয়া যাবে কিনা।

তোমার স্বামীর কষ্টের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিও।

এরপর নিজে উঠে গিয়ে মবারানী তাঁর ঘরের দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এলেন। পর্তুগীজ মহিলাটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুচ্চে বললেন, মহারাজ দিয়াজার শাসনকর্তার কাছ থেকে গোপন সংবাদ পেয়েছেন, সে জন্যই এই যুদ্ধ-জাহাজের সমাবেশ।

আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন মহারানী, কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে কি ?

তুমি অনেকদিন আসছ প্রাসাদে, তোমাকে অবিশ্বাস করার কারণ আমি দেখি না। তবুও সাবধান করে দিচ্ছি, আমি যা বলব তা যেন দ্বিতীয় কানে না যায়।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মহারানী। আরাকানের কোন বিপদ, আমাদেরও বিপদ।

তবে শোন, একজন মুসলিম মহিলাকে নাকি দিয়াঙ্গার দস্যু ডিয়াগো-ডা-সা মোগলদের এলাকা থেকে অন্য সব দাসেদের সঙ্গে ধরে এনেছে। পরে জানা গেছে বাংলাদেশের মোগল শাসনকর্তার সে খুব আপনার জন। তাই পাছে মোগলদের সঙ্গে দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদের যুদ্ধ বাধে সেজন্য আগেভাগে নাকি পর্তুগীজরা গোপনে ঢাকায় লোক পাঠিয়ে জানিয়েছে, ঐ মুসলিম মহিলাটি দিয়াঙ্গায় আছে এবং আরাকানের শাসনকর্তা তাকে আটকে রেখেছে। এই মিথ্যা খবর দিয়ে তারা নাকি এ কথাও লিখেছে যে মোগলরা যদি সসৈন্যে দিয়াঙ্গা অধিকারে আসে তাহলে পর্তুগীজরা আরাকানীদের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে মোগলদের সঙ্গেই যোগ দেবে।

এ কথা দিয়াঙ্গার শাসনকর্তা কি করে জানলেন মহারানী ?

পর্তুগীজদের যে দূতটি গোপনে সংবাদ বহন করে মোগলদের কাছে যাচ্ছিল তাকে আরাকান শাসনকর্তার চর ধরে ফেলেছে। সে খবর দিয়াঙ্গা থেকে মহারাজের কাছে গোপন দূত মারফৎ শাসনকর্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই মহারাজ দ্রুত নৌবহর পাঠিয়ে পর্তুগীজদের দিয়াঙ্গার ঘাঁটি ভেঙে দিতে চান। অবশ্য পর্তুগীজ মশলা কিংবা রত্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই।

এখনও তাহলে নৌবহরটি আরাকানের সমুদ্রে রয়েছে কেন ?

হঠাৎ প্রকৃতি একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। প্রচণ্ড ঝড় সমুদ্র তোলপাড় করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে সমস্ত নৌবহরটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই জ্যোতিষীর গণনায় ঠিক হয়েছে শ্রাবণী পূর্ণিমা পার করে প্রতিপদ থেকে যে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হবে, সেই সময়ে যুদ্ধযাত্রা করলে জয়লাভ সুনিশ্চিত। আর তুমি এ কথাও জান, ঐ সময় প্রায় এক সপ্তাহকাল প্রকৃতি অনেকখানি শান্ত থাকে।

কিন্তু মহারানী, সেই শুভক্ষণটি আসতে এখনও তো প্রায় মাসাধিকাল বাকী।

তাতে মহারাজের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি জানেন, মোগলরা জলযুদ্ধে অক্ষম, আর তারা বিপুল বাহিনী নিয়ে এ বর্ষায় নদীনালা ডিঙিয়ে দিয়াঙ্গায় আসবে না। তাদের আসার আগেই বিশ্বাসঘাতক দাস-ব্যবসায়ীদের নৌবহর তিনি ধ্বংস করবেন।

আপনার কাছে সব কিছু শুনে আমার ভয় ভাঙল, মহারানী। এখন অনুগ্রহ করে দেখুন আমার স্বামীর বহুকষ্টে সংগ্রহ করে আনা জিনিসটি আপনার পছন্দ হয় কিনা।

অতি যত্নে হাতির দাঁতের কারুকার্যখচিত একটি কৌটো খোলা হল। মহারানী সবিস্ময়ে দেখলেন, তার ভেতর একটি দর্শনীয় মুক্তা। আকারে এবং গুণগত মানে মুক্তাটি যে তুলনাহীন তা মহারানীর অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধরা পড়ল। তিনি দরদাম না করে ঐ মুক্তার জন্য পর্তুগীজ মহিলাটিকে তার আশাতীত অর্থ দিলেন। একটি কারুকার্যখচিত স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ের মাঝখানে এই মুক্তা শোভা পেলে মহারাজের অঙ্গুলিতে তা অত্যন্ত দর্শনীয় হয়ে উঠবে।

মহারানীর কাছে বিদায় নিয়ে মহিলাটি শিবিকায় আরোহন করেই বাহকদের অত্যন্ত দ্রুতবেগে পর্তুগীজ পল্লীর দিকে যাবার নির্দেশ দিলে। নিগ্রো দাস-বাহকেরা পাখির মত শিবিকাটিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

রাতে পর্তুগীজদের গোপন পরামর্শসভা বসল। এই মুহূর্তে দিয়াঙ্গায় লোক পাঠিয়ে ওখানকার পর্তুগীজদের সজাগ করে দিতে হবে। রাজধানীতে বসবাসকারী বহু পর্তুগীজের আত্মীয়স্বজন দিয়াঙ্গায় বসবাস করছে। তাদের বিপদ মানে নিজেরই বিপদ।

সেই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এক অতি দুঃসাহসী পর্তুগীজ দিয়াঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দশ দিনে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদীনালা পেরিয়ে সে হাজির হল দিয়াঙ্গায়। কিন্তু যাদের সাবধান করে দেবার জন্যে সে এত বিপদ ও শ্রম স্বীকার করে এল তাদের ভেতর একজন ক্যাপ্টেন টিবাও ছাড়া আর কেউই ছিল না। পর্তুগীজ দস্যুদের সব ক'টি জাহাজ প্রায় পক্ষকাল আগে বেরিয়ে গিয়েছিল সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখানকার খাঁড়িতে খাঁড়িতে জাহাজ ঢুকিয়ে তারা চাষের কাজে নিযুক্ত কৃষক আর মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত জেলেদের ধরে ধরে জাহাজের খোল বোঝাই করছিল। আরাকানে চাষের কাজে আর গোয়াতে মাছের কাজে এদের বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা পাওয়া যায়।

ব্রাউক-উ থেকে আগত পর্তুগীজ দূতটি দেখা করল ফাদার ম্যানরিকের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন টিবাও অসুস্থ ছিলেন। সবেমাত্র জ্বর থেকে উঠেছেন, দুর্বলতা

কাটেনি। তবু ফাদার ম্যানরিকের ডাকে চার্চে চলে এলেন। ইমানুয়েলের মশলাপতির কারবার, এই ঝড়ের দিনগুলিতে তাঁর জাহাজ বন্দর ছেড়ে কোথাও যায় না। তিনিও ফাদারের ডাকে এসে পড়লেন। দুজন বৃদ্ধ, যারা অনেক আগেই শারীরিক অপটুতার জন্য ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরাও এলেন।

পরামর্শ সভায় ইমানুয়েল বললেন, আরাকানরাজ দিয়াঙ্গায় আমাদের অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। আমরা তার পরিবর্তে মোগলদের আক্রমণের বিরুদ্ধ সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য করব, তার কোন বাধ্যবাধকতাই নেই। অবশ্য ব্যবসায়ের সামান্য যে মুনাফা রাজার প্রাপ্য তা রাজার প্রতিনিধি দিয়াঙ্গার শাসনকর্তাকেই দিয়ে দেওয়া হয়। এতে শাসনকর্তার ক্রোধের কারণ কি ঘটল! তিনি কেনই বা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে গালগল্প বানিয়ে রাজার কাছে গোপন পত্র দিয়ে দূত পাঠালেন।

ক্যাপ্টেন টিবাও বললেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন ইমানুয়েল, এক সময় দিয়াঙ্গার শাসনক্ষমতা নিয়ে রামুর শাসনকর্তার সঙ্গে দিয়াঙ্গার শাসনকর্তার বিবাদ বাধে। তখন আমরা রামুর শাসনকর্তাকেই দিয়াঙ্গায় চেয়ে ছিলাম। দুজনেই রাজার আত্মীয়। তবু রাজা এই শাসনকর্তাটিকেই এখানে বহাল রেখে দিলেন।

ম্যানরিক বললেন, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ মুসলিম মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই দিয়াঙ্গার শাসনকর্তা গল্পটি বানিয়েছেন। আর এই সুযোগে দিয়াঙ্গার পর্তুগীজদের শায়েস্তা করতে চান।

এক বৃদ্ধ বললেন, ইমানুয়েল, তোমার জাহাজখানা পাঠিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের পর্তুগীজ জাহাজগুলোকে খবর দেওয়া হোক। তারা যত সত্বর সম্ভব দিয়াঙ্গায় ফিরে আসুক, না হলে বালবাচ্চা নিয়ে এখানে আমাদের মরতে হবে।

ক্যাপ্টেন টিবাও বললেন, সব জাহাজই বিভিন্ন খাঁড়ি আর নদী-নালার ভেতর ঢুকে বসে আছে। একটা জাহাজের পক্ষে এ দুর্যোগে সবাইকে খবর দেওয়া অসম্ভব।

অন্য বৃদ্ধটি স্থির ও বিবেচক। তিনি বললেন, ফাদার ম্যানরিক বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি ঐ মুসলিম মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে আরাকান রাজার কাছে যান। এই শাসনকর্তার পাঠানো কাহিনীটি যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত তা বুঝিয়ে বলুন তাঁকে। আর ঐ মুসলিম মহিলাটিকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আসুন। তিনি যা ব্যবস্থা করার তাই করবেন।

ম্যানরিক বললেন, এ পরামর্শ যুক্তিসম্মত। তবে আমার সঙ্গে যদি ক্যাপ্টেন টিবাও যান তাহলে এই দৌত্যকর্মটি জোরাল হয়। দাস-ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হিসেবে একজন ক্যাপ্টেন রাজদরবারে উপস্থিত হবেন, এতে আমাদের বক্তব্যের সততা সম্বন্ধে রাজার বিশ্বাস বাড়বে।

টিবাও বললেন, এ সময় অসুস্থতা কোন অজুহাতই নয়, আমি ফাদারের সঙ্গে ম্রাউক-উ যাবার জন্য প্রস্তুত। ইমানুয়েল তাঁর দক্ষ সারেঙ আইনুলকে দিয়েছিলেন। দু'জন আরাকানী মাল্লা এই বিশিষ্ট যাত্রীদের নৌকোয় করে নিয়ে এল আরাকানের রাজধানীর পথে রামুতে। এরপর ঐ তিনজনকে যেতে হবে দুর্গম, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে ম্রাউক-উ। একেবারে ভয়ংকর পদযাত্রা।

তিন

রামুর শাসনকর্তার কছে ফাদার ম্যানরিক সব কথাই খুলে বলবেন। এবং দিয়াঙ্গার শাসনকর্তার বিবাদের সময় দিয়াঙ্গার পর্তুগীজরা যে তাঁকেই চেয়েছিলেন তাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলবেন না। আর এতদিন পরে যে তারই প্রতিশোধের একটা সুযোগ নিতে চাইছেন দিয়াঙ্গার শাসনকর্তা, এটি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান রামুর শাসনকর্তাকে অন্তত বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কাজ হল। রামুর শাসনকর্তা ফাদার ম্যানরিকের দৌত্যের সাফল্য আন্তরিকভাবে কামনা করলেন। তিনি বললেন, আপনারা তিনটে প্রাণী হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ আরাকানের অরণ্য পেরিয়ে যেতে পারবেন না। পথও আপনাদের কাছে অচেনা। আপনারা তিন চারদিন আমার গৃহসংলগ্ন অতিথিশালায় অপেক্ষা করুন, আমি যাত্রার সব আয়োজন করে দেব।

একদল বন্দী দাসকে পাঠানো হচ্ছিল আরাকানে। সেই পঞ্চাশজন দাসের সঙ্গে দশজন বন্দুকধারী পাহারাদারও চলল। ফাদার ম্যানরিক, ক্যাপ্টেন টিবাও আর গুলনারের জন্য একটি হাতির ব্যবস্থা করা হল। অন্য একটি হাতিও চলল সঙ্গে এতগুলো মানুষের খাবারদাবার নিয়ে।

প্রথমদিন সন্ধ্যার আগে রামুর সমতল-সীমানা পেরিয়ে পুরো দলটি এসে পৌছল একটি পাহাড়ের পাদদেশে। রাতের মত সেখানেই বিশ্রামের আয়োজন করা হল।

সারা পথই বৃষ্টিতে পিছল। সারি দিয়ে চলেছিল হতভাগ্য বন্দী দাসেরা।

পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের সব পুরুষ, নারী। বরিশাল, নোয়াখালি, সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চল থেকে ধরে আনা হয়েছে এদের। কেউ চাষের কাজে ক্ষেত চষবার সময় ধরা পড়েছে, কেউ বা হাটের থেকে ফেরার পথে। আর ঘরে ফেরা হয়নি। ওদের ভেতর সন্ত বিয়ে করা একজোড়া স্ত্রী-পুরুষ আছে। তারা ছোট্ট শালতিখানা বেয়ে মেলা দেখতে এসেছিল। নতুন বিয়ে, দুজনেই আনন্দে ডগমগ। মেলা ভাঙে ভাঙে, এমন সময় প্রবল একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। মানুষজন যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে, আর আতঙ্কে চীৎকার করছে, হার্মাদ, হার্মাদ।

ওরাও দুজনে ছুটছিল, কিন্তু নদীর কাছ বরাবর এসে বউটা পায়ে কাপড় বেধে পড়ে গেল। ছেলেটা তাকে ফেলে প্রাণের ভয়ে পালাতে পারল না। তার হাত ধরে যখন টেনে তুলল তখন দেখলো সামনে তলোয়ার উঁচিয়ে কালান্তক যম দাঁড়িয়ে আছে। ফিরিঙ্গীর নৌকোতে বোঝাই হয়ে তাদের ভাসতে হল অনির্দিষ্টের পথে। ওদের শালতিখানা তীরের কাছে মালিকদের করুণ পরিণতি দেখে যেন ঢেউয়ের ওপর আছাড় খেতে লাগল।

হাতি থেকে আরোহীরা নেমে পড়েছে। অন্য হাতির পিঠ থেকেও মালপত্র রাতের মত নামানো হল। সবাই একটা গাছের তলায় জড়োসড়ো হয়ে বসল। এত পথ কাদা ঘেঁটে, জলা পেরিয়ে আসার ফলে সবাই ক্লান্তি আর ক্ষুধায় ভেঙে পড়েছে। হাতির থেকে হাওদা নামিয়ে তাঁবুর মত টাঙানো হল। তার ভেতর ঢুকে পড়ল ম্যানরিক, টিবাও। গুলনারকে ডেকে ফাদার তাঁবুর একটি নির্দিষ্ট কোণায় আশ্রয় নিতে বললেন। বন্দুকধারী পাহারাদাররা হাওদার কানাতের আড়ালে আড়ালে আশ্রয় নিল। সবার নজর কিন্তু বন্দীদের দিকে। ওরা গাছের তলায় জটলা করে বসে আছে। কিছু সময়ের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ওদের শেকল।

সামনে আগাছামুক্ত ক্ষেত। যতদূর দেখা যায় ঐ একই রকম চেহারা। কাছেপিঠে গ্রামের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হল না। ক্ষেতের একপাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। বর্ষায় আর পাহাড়ের ঢলে নদীটা পূর্ণ। মনে হয় অনেক দূর গ্রামাঞ্চল থেকে নৌকো বোঝাই করে এই নদীপথেই ক্রীত-দাসদের নিয়ে আসা হয়। সারাদিন ক্ষেতের কাজ করে সন্ধ্যার আগেই তারা আস্তানায় ফিরে যায়।

ঝড়জল শুরু হয়ে গেল সন্ধ্যার মুখে। এ অবস্থায় খোলা জায়গায় আগুন জেলে রান্না করা প্রায় অসম্ভব। ক্লান্ত ভেঙে পড়া মানুষগুলো সে চেষ্টা আর

করল না। ঠেসাঠেসি করে গাছের তলায় বসে রইল। ঝড় ক্রমাগত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি কমে আসছে। ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে পাহাড়ের ওপরে। বিশাল বিশাল গাছ যেন ডানা মেলে পুরো পাহাড়টাকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ডাল-পাতা ভেঙে ছিঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে এসে পড়ছে।

এর ভেতর ক্যাপ্টেন টিবাও শুকনো কিছু রুটি বের করল। যৎকিঞ্চিৎ হলেও বন্দীরা তার ভাগ পেল। তারপর ঐ ঝড়ের ভেতরেই শ্রান্ত মানুষগুলো মড়ার মত ঘুমের কোলে নেতিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল গুলনারের। সে তাঁবুর কোণাটা ঈষৎ ফাঁক করে দেখল, বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো প্রবহমান মেঘের স্রোত উপচে ফেনার মত ঝরে পডছে ভেজা পৃথিবীর বুকে। গাছের বড় বড় পাতার কোণ গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে তাঁবুর ওপর। ওই তো মানুষগুলো শুয়ে আছে। বর্ষার অরণ্যে যেমন করে শুয়ে অথবা দাঁড়িয়ে থাকে জন্তু-জানোয়ারগুলো। কারা দু'টিতে যেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু আড়াল রচনা করে বসে আছে। বিশ, চব্বিশ বছরের দু'টি নর-নারী। গুলনার অবাক হয়ে ভাবল, ওরা কি প্রেম নিবেদন করছে। অথবা দুজনেই দুজনের অতীত জীবনের কথা পরস্পরের কাছে বলে কেঁদে ভাসাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের ভারটাকে কিছুটা লাঘব করে নিচ্ছে।

ভোরবেলা বাঁধাছাঁদা শেষ করে পর্বত আরোহণ শুরু হল। হাতির ওপর যারা বসে যায় তারাও পাথর ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগল। কোথা থেকে শুরু হয়ে গেল ঝাপটা বৃষ্টি। সবাই ভিজে গেল মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি। তবু ওঠার বিরাম নেই। ক্লান্তি ধুইয়ে দিচ্ছিল জলের ধারা। হাতি দুটো উঠছে। এতবড় দেহখানা কিন্তু নড়বড় করছে না। মানুষের চেয়েও যেন ওরা অনেক বেশী সাবধানী। অন্তত তাই মনে হচ্ছিল গুলনারের। পা পিছলে যাচ্ছিল, গাছ থেকে ঝুলে পড়া একটা মোটা লতা ধরে নিজেকে সামলে নিল।

পাহাড়টার উচ্চতা কম নয়। ওপরে উঠতে হাঁফ ধরে যায়। সবাই ওপরে উঠে এসে পাথরের চাঁইগুলোর ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। এখন ওদের অবাক লাগছে। সত্যি অবাক লাগবারই কথা। নিচে সপাসপ বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দিলে কিন্তু ওপরে শুকনো।

ফাদার ম্যানরিক বললেন, কাল রাতে সবাই প্রায় উপোস দিয়ে আছে, এখন পাহাড়ের ওপর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হোক।

ক্রীতদাসেরা রান্নার কাজে লেগে গেল। ক্যাপ্টেন টিবাও-এর মৃদু প্রতিবাদ সত্ত্বেও গুলনার রান্নার কাজে যোগ দিতে গেল। কিন্তু গুলনার যে মুসলমান থেকে খৃষ্টান হয়েছে সে খবর বন্দীরা রামু থেকেই পেয়ে গেছে। তাই গুলনার সহযোগিতার হাত বাড়ালে কয়েকজন হিন্দু তাকে সম্মানীয় নারীর অজুহাতে রান্নার কাজে যোগ দিতে বারণ করল। বুদ্ধিমতী গুলনার বুঝল সম্মান দেখানোর অজুহাতে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। কারণ আরও কয়েকজন বন্দী নিশ্চিন্তে দূরে বসেছিল। তারা যে তারই আপন জাতের লোক, এ সত্য বুঝতে গুলনারকে বেগ পেতে হল না। মনে মনে হাসল গুলনার। বড় করুণ সে হাসি। রান্নার ধকল নিজেরা সইবে তবু বেজাতের হাতের অন্ন ছোঁবে না! ক্রীতদাসের আবার জাত!

কাল শেষ রাতে যাদের গাছে হেলান দিয়ে বসতে সে দেখেছিল তারা তার কাছে সকরুণ বিনয়ের হাসি হাসছে। খাবার সাজিয়ে তারাই সযত্নে পরিবেশন করছে ফাদার ম্যানরিক আর ক্যাপ্টেন টিবাওকে। অনুরোধ করে গুলনারকেও বসান হয়েছে তাদের সঙ্গে। ঐ যুবক-যুবতীই সবাইকে পরিবেশন করছে। বন্দী দাসেরা বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা গাছের আড়ালে খেতে বসেছে। তাদেরও পরিবেশনের ভার নিয়েছে ওরা দু'টিতে। মেয়েটির মাথায় সিঁদুরের চিহ্ন আঁকা। এক ফাঁকে গুলনার ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, ওরা স্বামী-স্ত্রী, ধরা পড়েছে একসঙ্গে!

খাবার পরে শুরু হল চলা। এখন হাতির পিঠে বসেছে ম্যানরিক আর টিবাও। হাওদাখানা গুটিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়েছে। গুলনার এবার হাতির পিঠে বসে যেতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। সে বন্দীদের সঙ্গেই হেঁটে যাবে। ম্যানরিক আর টিবাওকে সে জানিয়েছে, পায়ে হেঁটে গেলেই সে আরাম পাবে বেশি।

গুলনার বিশিষ্ট বন্দী। সবাই ভুলে গেছে যে সে তাদেরই দলের একজন। দিনের বেলা বন্দীদের গলায় হাসুলীর মত একটি করে লোহার বেড়ি পরান থাকে। ঐ বেড়ি থেকে তিন-চার হাত লোহার শেকল ঝোলে। ঐ শেকলের অন্য প্রান্তটি আবার লাগান থাকে আর একজন বন্দীর হাসুলীতে। রাতে সাধারণত শেকল খুলে দেওয়া হয়। পালাক্রমে পাহারা দেয় দাস-ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত দক্ষ সেপাইরা। বন্দীদের যাত্রার আগেই হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, পালাবার চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যু। গুলি খেয়েই শুধু মৃত্যু নয়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালাতে গেলেই বাঘের পেটে মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া হয় রামু নয় ব্রাউক-উ-তে পৌঁছতে হবে তাকে। বিদেশী দাসকে সকলেই সনাক্ত করে আবার ধরে ফেলবে। সুতরাং পরিণতি যখন একই তখন পালানোর চেষ্টা না করাই উচিত। তাছাড়া পলাতক ধরা পড়লে তার শাস্তি ভয়ঙ্কর।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। হাতিরা চলার পথে ডালপালা ভেঙে পথ করে নিচ্ছে। একজন পথপ্রদর্শক এগিয়ে চলেছে, মাঝে চলেছে দুটি হাতি, পেছনে পুরো দলটি।

এখন গুলনারের স্বাধীনতা অনেক বেড়েছে। সে সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। সবার দুঃখের সঙ্গে তার দুঃখ মিলে বুকের পাষাণ-ভার খানিকটা লাঘব হয়েছে। কে বলবে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আমীর আলির একমাত্র কন্যা আজ ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রির জন্য দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

চতুর্থ দিন অপরাহ্নে ওরা এসে পৌঁছল একটি দুর্গম পাহাড়ের সানুদেশে। সামনে একসারি পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে। আশ্চর্য। একটি মানুষ কিংবা গৃহস্থালির সামান্য কোন উপকরণও সেখানে নেই। সম্ভবত পাহাড়ী জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে আসে তারাই সাময়িক বিশ্রামের জন্য এগুলি তৈরি করে রেখেছে। গরমের দিনগুলোতে কাঠ কেটে নামিয়ে নিয়ে গেছে, এখন বর্ষা নামতে তারা চলে গেছে দূর গাঁয়ে। পাহাড় অতিক্রম করে এপারে আসার সময় ওরা দেখেছে বড় বড় গাছের কাটা কাণ্ডের শেষ অংশটুকু উঁচু আসনের মত মাটির খানিক ওপরে জেগে আছে।

সে রাতের মত ওদের আশ্রয়ের অভাব হল না। গাছের ডালপাতা সংগ্রহ করে আনল ওরা। কয়েকটা আগুনের কুণ্ড জ্বালান হল। নিজেদের ভেজা পোশাক-পরিচ্ছদ আগুনের তাপে শুকিয়ে নিল বন্দীরা। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে হাওয়া দেয় তাতে শীতের কামড় আছে। আগুন পুইয়ে ওরা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল।

সব কুঁড়েতেই গুলনারের অবাধ গতি। সে প্রতিটি কুঁড়েতে ঢুকে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। এক একবার ফাদার ম্যানরিক আর টিবাওয়ের তাঁবুতে গিয়ে তাদের সুবিধে-অসুবিধের কথাগুলো জেনে নিয়ে সেইমত ব্যবস্থাদি করে আসছিল।

আজ বন্দীরা গুলনারের কাছে খুলে বলছিল তাদের প্রাণের কথা। স্বামী-স্ত্রীর শলাপরামর্শ করে মেলায় যাওয়া এবং সেখানে হার্মাদদের হাতে

ধরা পড়ার কাহিনী শুনল সে। একটি ছোট্ট ছাউনির ভেতর রাতের মত আশ্রয় নিয়েছিল তারা। সেই ধরা পড়ার আগের রাতটিতে নিজের গাঁয়ের কুঁড়েতে পাশাপাশি শুয়েছিল দুজনে। পরের দিন মেলায় কেমন করে কাটাবে তারই হিসেব-নিকেশে কেটে গিয়েছিল তাদের রাত। আর এতদিন পরে আজ তারা দুজনে একঘরে একটা রাত কাটাবার সুযোগ পেল।

গুলনার বলল, আমাদের সকলের ভেতরে এখনও তোমরাই ভাগ্যবান। এখনও রোজ দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছ।

হঠাৎ মেয়েটি গুলনারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। গুলনার পা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটিকে প্রবোধ দেবার গলায় বলল, কাঁদছ কেন? তোমরা তো সুখেই আছ।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দিদি, তুমি আমাদের বাঁচাও।

ম্লান হাসি হাসল গুলনার। সন্ধ্যার ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না। মুখে বলল, আমি তোমাদেরই মত বন্দী বোন, বল, আমি কি করে তোমাদের বাঁচাতে পারি?

যুবকটি বলল, আমরা দেখেছি আপনাকে সাহেবরা বেশ খাতির করেন, আপনি যদি আমাদের জন্যে ওঁদের একটু বলেন।

আমি তো ওঁদের হাতেই বন্দী ভাই। তবে ওঁরা যে কোন কারণেই হোক আমাকে দিনের বেলা চলার সময় শেকল দিয়ে সবার সঙ্গে বেঁধে রাখেন না।

মেয়েটি এবার অন্যভাবে একটি অনুরোধ জানাল, দিদি, আমরা জানি কপাল আমাদের ভেঙেছে, আমাদের চিরদিনই কেনা গোলামের কাজ করতে হবে। ঘরে আমরা এ জন্মে আর ফিরতে পারব না। শুধু একটা অনুরোধ যদি আপনি করেন।

বল; কি অনুরোধ করব?

আমাদের যেখানে যার কাছে ওরা বিক্রি করুন, যেন দুজনকে এক মালিকের কাছেই বিক্রি করেন। আমরা প্রাণ দিয়ে মালিকের কাজ করব।

গুলনার সহানুভূতির গলায় বলল, আমি নিশ্চয়ই বলব বোন, তবে ওঁরা যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন।

গুলনার ওদের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দেখল, রান্না চেপেছে। বিরাট অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে এখন সবাই গোল হয়ে বসেছে। নিজেদের ভেতরে কথা

বলছে। গুলনার বুঝল, প্রতিটি কথাই দীর্ঘশ্বাসে ভরা। সে ধীরে ধীরে ওদের মাঝখানে এসে বসল। এখন প্রতিটি বন্দীই গুলনারকে শুধু সমীহই করে না, আপনজন বলেও ভাবতে শুরু করেছে। তার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলে মনের ভার লাঘব করতে চায়।

গুলনার আসায় আলোচনাটা থেমে গিয়েছিল, এখন আবার শুরু হল।

একটি স্বাস্থ্যবান শ্যামবর্ণ সুদর্শন যুবক কথা বলছিল। মুখে চোখে তার মার্জিত বুদ্ধির ছাপ। সে বলছিল, চতুষ্পাঠীতে পড়াতে যাবার পথে সে ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ সন্তান সে, কিন্তু ধরা পড়ার পর নৌকোতে নিয়ে আসবার সময় তার পৈতে আর শিখা কেটে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কে যেন বলল, বউ ছেলেপিলে আছে?

না, আমি এখনও দার পরিগ্রহ করিনি।

ভীড়ের ভেতর থেকে আর একটি মুসলমান যুবক হাহাকার করে উঠল। সবাই সচকিত হয়ে তাকাল তার দিকে। সে নিজের বুকে এবার করাঘাত করতে করতে বলল, আমার অল্পদিন সাদি হয়েছে ভাইসব, আমি সবে জানতে পেরেছিলাম মনিরা আমার বাচ্চা ধরেছে পেটে। হায় হায়, বাচ্চাটা আর কোনদিন তার আব্বাজানের মুখ দেখতে পাবে না।

একটু থেমে অবিবাহিত ব্রাহ্মণ যুবকটির দিকে চেয়ে বলল, ভাই, তুমি কত পুণ্য করেছ, তাই বউ ছেলের জন্ম তোমাকে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে হবে না।

গুলনার দেখেছে একটি অষ্টাদশী হিন্দু মেয়ে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলে ব্রাহ্মণ যুবকটিকে। তার জলপান, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা সেই করে দেয়। পথ চলতে দুজনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। অনুচ্চে কথা বলতে বলতে যায়। মেয়েটিকে হাত ধরে টেনে যুবকটি পাহাড়ে উঠতে সাহায্য করে। গুলনার লক্ষ্য করেছে, মেয়েটির চোখে ভাল লাগার ঘোর। সে বিশ্রামের সময় কারণে অকারণে চেয়ে থাকে ছেলেটির মুখের দিকে। মনে হয় ব্রাহ্মণ যুবকটিও এই মিষ্টি মুখের মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছে।

গুলনার ভাবে, দুঃখই জাতি-ধর্ম ভুলিয়ে দেয়, দুঃখই মানুষকে এক করে।

এবার গুলনার আগুনের চারদিকের জটলা থেকে উঠে পড়ে। আচ্ছা, সেই বছর চোদ্দ বয়সের করুণ-মুখ কিশোরটি কোথায়, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না? গুলনার ঠিক লক্ষ্য করেছে, পথ চলার সময় ছেলেটির পিঠে সে যখনই হাত রেখেছে তখনই ছেলেটির ঠোঁট কেঁপে উঠেছে আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

গুলনার পায়ে পায়ে প্রতিটি ছাউনির ভেতর ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল। একেবারে শেষ প্রান্তের ছাউনিতে ছেলেটির দেখা মিলল। মনে হল সে ছাউনির এক কোণায় গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে।

ভরত না?

ছেলেটি ছাউনির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। মুখে বলল, হ্যাঁ গো দিদি, আমি ভরত।

গুলনার বলল, এখন আর চিনিয়ে দিতে হবে না। চল, আমরা ভেতরে বসে গল্প করি।

দুজনে ভেতরে এসে বসল। গুলনার জানতে চাইল, হ্যাঁরে ভরত, কে আছে তোর বাড়িতে?

অন্ধকারে না দেখা গেলেও ভরতের চোখে জল এসে গেল। সে কতক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, আমার বাবা নেই দিদি। খালি মা আর একটা বোন।

আবার অশ্রুর বান টেনে নিয়ে বলল, হ্যাঁরে ভরত, আর একটা দিদি আছে না তোর?

ভরত মনের দিক থেকে ভেঙে পড়লেও সে নির্বোধ নয়। গুলনারকে জড়িয়ে ধরে বলল, হ্যাঁ দিদি, এই তো তুমি রয়েছ।

আবেগে কতক্ষণ দুজনে কথা বলতে পারল না। এক সময় ভরত বলল, আচ্ছা দিদি, যারা আমাদের ধরে এনেছে তারা কি কোনদিন আমাদের ঘরে যেতে দেবে না? ওরা সবাই বলছিল।

এই কিশোরটির মুখের ওপর এই মুহূর্তে জীবনের নিষ্ঠুর-নির্মম সত্যটি বলতে বাধল গুলনারের। সে শুধু বলল, জীবনে আশ্চর্য অনেক কিছুই তো ঘটে, কে বলতে পারে মানুষ ঘরে ফিরবে কি ফিরবে না।

কিছু হয়তো বুঝল, কিছু হয়তো বুঝল না ছেলেটি। গুলনারের হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি খুব ভাল, তুমি আমাকে কোথাও ছেড়ে যাবে না বল?

গুলনারের চোখে জল। অস্ফুটে বলল, কাউকে কোনদিন কেউ ছেড়ে যেতে চায় রে।

হঠাৎ ছেলেটি তার ময়লা কাপড়ের ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে গুলনারের হাতে দিয়ে বলল, এটা মুনিয়ার জন্তে হাট থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, দিদি, ওকে আর দিতে পারলাম না। আমাদের হাটুরে নৌকোটা

ঘিরে ফেলে ওরা আমাদের টেনে তুলল ওদের জাহাজে। নৌকা থেকে অনেক লোক জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। উঃ, তারপর কি হল জান, ক'জনকে দুম দুম করে গুলি ছুঁড়ে মেরে ফেলল। তারা তলিয়ে গেল নদীর জলে। ওরা তখন ভয় পেয়ে সকলে উঠে এল ওদের জাহাজে।

অন্ধকারে গুলনারের একটা হাত নিয়ে নিজের হাতে ঠেকিয়ে বলল, এই দেখ দিদি, আমার হাতের এখানটায় এখনো ফুলে রয়েছে।

গুলনার হাত বুলিয়ে দেখল, ছোট মাংসের একটা পিণ্ড দলা পাকিয়ে আছে। উদ্বেগের গলায় বলল, তোর হাতেও গুলি লেগেছিল নাকি রে?

না দিদি, গুলি নয়। ওরা আমাদের জাহাজের খোলে পুরে হাত ফুটো করে বেতের সরু ছিলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সবাইকে এমনি করে একসঙ্গে বেঁধেছিল। আর তিনদিন ভাতের মুখ দেখিনি। ওপর থেকে অন্ধকার খোলের ভেতর কয়েক মুঠো করে চাল ছড়িয়ে দিত, মুর্গীগুলোকে যেমন করে চাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

গুলনার ওর হাতের ফুলো জায়গাটায় নিজের হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, একদিন সব কষ্টের শেষ হয় রে, কোন কষ্টই চিরকাল থাকে না। দেখবি তোরও কষ্টের শেষ হবে।

সত্যি বলছ দিদি?

তাই তো হয় রে।

গুলনার ভরতের ছোট্ট টিনের কৌটোটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল কি আছে রে এর ভেতর?

ভরত বলল, রামুতে সমুদ্রের ধারে চার পাঁচটা রঙিন ঝিনুক কুড়িয়ে পেয়েছি। যখন বাড়ি ফিরব তখন মুনিয়াকে এই কৌটো আর রঙিন ঝিনুকগুলো দেব। সে একটা কৌটোর জন্যে কতদিন আমার কাছে কেঁদেছে।

তাই দিও ভরত, ও বড় খুশি হবে।

হঠাৎ ভরতের ভাবান্তর হল। সে ফুঁপিয়ে উঠল।

গুলনার বলল, কি হল আবার?

আমার মা আমাকে দেখতে না পেয়ে ঠিক জানবে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। আমি বাবুদের গরু চরিয়ে যে ক'টা পয়সা পেতাম সব মার হাতে তুলে দিতাম, দিদি। মা বড় কষ্টে ঘুঁটে বেচে, লোকের বাড়ি মুড়ি ভেজে আমাদের খাওয়া পরার যোগাড় করত। কত কষ্ট পাচ্ছে আমার মা।

বাবাকে মনে পড়ে তোর?

পড়ে, তবে খুব ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে। জঙ্গলে মৌচাক ভাঙতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল গুলনারের। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলল, আল্লা, এই দুঃখী ছেলেটার কষ্ট দূর করে দাও মেহেরবান।

শেষ রাতে আকাশের অনেকখানি এলাকা মেঘমুক্ত হয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পূব আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ঘুম থেকে জেগে উঠল সবাই। একটানা চেঁচিয়ে চলেছে রাতের পাহারাদার। তালপাতার ছাউনির ভেতর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।

সর্বনাশ, একপাল হাতি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে। তারা তাড়া খাওয়া জন্তুর মত প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে। তাদের পায়ের আঘাতে গড়িয়ে ছিটকে নেমে আসছে বড় বড় পাথর।

মহা ত্রাসের সৃষ্টি হল নিচের মানুষগুলোর ভেতর। যে যেদিকে পারল প্রাণভয়ে দৌড়তে লাগল। দুটো পোষা হাতির মাঝখানে গুড়িসুড়ি মেরে বসে রইল ফাদার ম্যানরিক আর ক্যাপ্টেন টিবাও।

গুলনার ভরতের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে যাচ্ছিল তার চালার দিকে, ফাদার ম্যানরিক দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে আনলেন।

জঙ্গলের শুরু যেখানে সেখানটাতেই ছিল ভরতের আস্তানা। সে ত্রাসে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল! তারপর একটা শ্যাওলাধরা টিলার আড়ালে আত্মগোপন করল।

হাতির পাল পাহাড় থেকে নেমে সামনের সমতল জলার দিকে ছুটে চলল। যাবার পথে তছনচ করে দিয়ে গেল বাঁশ আর তালপাতার ছাউনি।

মানুষগুলো কতক্ষণ লুকিয়ে রইল গাছ আর পাথরের আড়ালে। সূর্য উঠল মেঘের ফাঁকে। বৃষ্টি থেমে আছে গতদিন অপরাহ্ন থেকে। ওরা একে একে পোষা দুটো হাতি লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। সবাইকে গুণে গুণে লোহার শেকল পরাতে লাগল রক্ষীরা। কিন্তু সে কই? সবার ছোট সেই কিশোর ভরত কই? সে যেখানেই গা ঢাকা দিক, এখনও ফিরে আসছে না কেন!

বেলা বাড়ছে। রক্ষীরা তার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। সে কি এই সুযোগে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল নাকি!

চিন্তিত হলেন ক্যাপ্টেন টিবাও। কারণ রামুর শাসনকর্তা, গুলমার ছাড়া সব ক'টি দাসকেই পর্তুগীজদের কাছ থেকে কিনে আরাকান-রাজ থিরি-থু-ধম্মার কাছে পাঠাচ্ছিলেন। এটা ছিল রাজার আশু অভিষেকের জন্য ভেট। আর এই ক্রীতদাসদের রাজার কাছে পৌছে দেবার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেন টিবাওএর ওপর। তাই মহা চিন্তায় পড়লেন টিবাও। রক্ষীদের আঁতিপাতি করে খোঁজার নির্দেশ দিলেন।

পালালেও কতদূর পালাতে পারবে। ছোট ছেলে, অজানা জঙ্গল এলাকায় তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। রক্ষীরা জঙ্গল চুঁড়ে খুঁজতে লাগল। কেবল একজন স্থির বিশ্বাস বুকে নিয়ে বসে রইল, ভরত তাকে না বলে পালাবে না। কিন্তু সে কই—সূর্য যে এখন মধ্য গগনে।

অভিজ্ঞ এক রক্ষী বহুক্ষণ মাটিতে কি যেন পরীক্ষা করে দেখছিল। হাতিরা যে দল বেঁধে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড় থেকে নেমে পালাল তার নিশ্চয়ই একটা কোন কারণ আছে। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বিষাক্ত কাঠপিঁপড়ে, ক্যাপ্টেন!

টিবাও বললেন, এর অর্থ?

আজ ভোরে ওদের তাড়া খেয়েই হাতির পাল জলার দিকে নেমে গেছে। জলে গা ডুবিয়ে ওদের কামড় ছাড়াবে। এই দেখুন, ওদের পায়ের চাপে মাটিতে কিছু লাল পিঁপড়ে মরে পড়ে আছে।

রক্ষীর এই অনাবশ্যক আবিষ্কারে ক্যাপ্টেন টিবাও আদপেই খুশি হলেন না। তিনি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উৎসাহী রক্ষীটি হঠাৎ পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। পিঁপড়েরা কোন পথে হাতিদের তাড়া করে নিয়ে এসেছিল তারই সন্ধান করতে লাগল সে। নিচে দাঁড়িয়ে সবাই তার অদ্ভুত ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করতে লাগল।

এক সময় পাহাড়ী অরণ্যে রক্ষীটি ঢুকে পড়ল। এদিকে বেলা বাড়ছে দেখে বন্দীরা মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থায় লেগে গেল। ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া গেলেই দ্বিপ্রহরের আহারের পর ওরা বেরিয়ে পড়বে।

কতক্ষণ পরে সবাই অবাক হয়ে দেখল, রক্ষীটি চিৎকার করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। সে একদিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে।

নিচে নেমেই সে অন্য রক্ষীদের ডাক দিয়ে ভরত যেখানে বনের ভেতর টিলার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে ছুটল। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন টিবাওএর নাম ধরে সে ডাক পাড়তে লাগল।

ক্রীতদাস শুরু করে থেকে সকলেই ছুটল সেদিকে।

একটি কংকাল পড়ে আছে। তার পাশে আধময়লা একখানা কাপড়।

সকলে আতঙ্কে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। হতভাগ্য ভরত, যে টিলার আড়ালে হাতির ভয়ে আত্মগোপন করেছিল সেটি আসলে ছিল মাংসাশী পিঁপড়েদের আস্তানা। ঐ পিঁপড়ের একটি দলই পাহাড়ের ওপরে উঠে হাতিদের তাড়া করেছিল। অন্য একটি দল, যারা বাসায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল তারাই কিশোরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'টি প্রহর যেতে না যেতেই তাকে নিঃশেষ করে ফেলে।

গুলনার কান্না থামিয়ে এগিয়ে গেল টিলার দিকে। দূরে দাঁড়িয়ে সবাই হা হা করে বারণ করতে লাগল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন গুলনার টিলার কাছ থেকে তুলে আনল ভরতের সেই অকিঞ্চিৎকর কৌটোটি। রাখালের কাজ করে পয়সা জমিয়ে সে ছোট বোন মুনিয়ার জন্য এ কৌটোটি কিনেছিল, কিন্তু বোনের হাতে উপহারটুকু তুলে দেবার আগেই সে ধরা পড়েছে।

গুলনার খুলে দেখল রামুর সমুদ্রতীর থেকে বোনের জন্য কুড়োনো রঙিন ঝিনুক ক'টা তার ভেতর রয়েছে। ভরতের আশা ছিল সে একদিন নিশ্চয় তার বাড়ি ফিরে যেতে পারবে আর তখনই সে তার ছোট বোনটির হাতে তুলে দিতে পারবে এই সব মূল্যবান উপহার।

নির্বাক নিস্তব্ধ দলটি এগিয়ে চলেছে। যেন একটি শোক-মিছিল। সামনের সমতল জলাভূমি পেরিয়ে ওরা একটি পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছল। তখনও বেলা ছিল, তাই সামনের পাহাড়টি ডিঙিয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মেঘ জমছিল পাহাড়ের মাথায়। ওরা কিছু পথ চড়াই ভেঙে উঠে বুঝতে পারল অজস্র নুড়ি আর পাথরে পূর্ণ এই পাহাড়। হাতির ওপর থেকে নেমে ক্যাপ্টেন টিবাও আর ফাদার ম্যানরিক নুড়ি-পাথর থেকে পতন বাঁচিয়ে সাবধানে উঠতে লাগলেন। হাতিগুলো ঠিক যেন ছাগলের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দলটি যত উপরে উঠছিল বায়ুর বেগ ততই বেড়ে চলেছিল। ওরা যখন একেবারে পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছল তখন শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি ওরা পাহাড়ের ওপরে নেমে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠায় কিছু পথ নেমেই থামতে হল। এখন ওদের চারদিকেই জঙ্গল।

বাঘের ভয়ে গাছের ওপর তোলা হল ম্যানরিক আর টিবাওকে। গুলনার উঠতে না চাওয়ায় বন্দীদের সঙ্গেই সে থেকে গেল। রক্ষীদের একজন গাছের

ওপর আর অন্য দুজন দুটো হাতির পিঠে চেপে পালাক্রমে পাহারা দিতে লাগল। মাঝে মাঝে রক্ষীরা ড্রাম পিটিয়ে বিউগল বাজিয়ে বুনো জন্তুদের তফাতে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। এরই ভেতর প্রায় সবাই আচ্ছন্নের মত ঘুমের কোলে এলিয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছে বন্দী সেই স্বামী-স্ত্রী আর ঐ ব্রাহ্মণ যুবকটির সঙ্গে তার ছায়া-সঙ্গিনী তরুণীটি। আর একজনও স্থির পাথরের স্তূপের মত অন্ধকারে বসে আছে। সে জেগে কি ঘুমিয়ে তা বোঝার উপায় নেই।

গুলনার নিশ্চল নিস্পন্দ বসেছিল, কিন্তু তার মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। কখনো দিল্লী, কখনো ঢাকায় সে বিচরণ করছিল। কৈশোর থেকে যৌবনের অজস্র কথাকাহিনী 'হাজার এক রজনী'র আশ্চর্য আখ্যায়িকার মত তার চারদিকে অভিনয় করে চলেছিল।

আব্বাজানের সঙ্গে কিশোরী গুলনার চলেছে দিল্লীর পথে, লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আমীর আলির একমাত্র কন্যা যেন আধফোটা একটি বসোরাই গোলাপ। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে নজরানা দিতে চলেছেন নবাব। দিল্লীতে তখন উপস্থিত ছিলেন বাংলার সুবাদার কাসিম আলি খান। ঢাকায় ছিল তাঁর রাজধানী। আমীর আলির বাল্যবন্ধু ছিলেন কাসিম আলি খান। দিল্লীতে বেশ কয়েক বছর বাদে দু'বন্ধুর দেখা হয়ে যাওয়ায় দুজনেই খুব খুশি হলেন। কিশোরী গুলনারকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে কাসিম আলি এমনি অভিভূত হলেন যে তিনি তাকে তাঁর বিবির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের খাস কামরায়। কাসিম আলির বিবি ছিলেন নূরজাহানের বোন। সেই কিশোরী গুলনার তাঁর সঙ্গে নূরজাহানের খাসমহলে প্রবেশের অধিকার পেল।

নূরজাহানকে তসলিম করে যখন গুলনার উঠে দাঁড়াল তখন তার সৌন্দর্য আর সহবৎ দেখে ভারী খুশি হলেন সম্রাজ্ঞী। তিনি তাঁকে হাত ধরে টেনে এনে পাশে বসালেন। নানা কথা জিজ্ঞেস করে এমনই প্রীত হলেন যে ভগ্নী আফরোজ বেগমকে বললেন, এর সাদির উপযুক্ত সময় হলে আমাকে খবর দিও। আমি এর সুপাত্রের ব্যবস্থা করে দেব।

আঠারো বছর বয়সে নূরজাহানের কাছে গুলনার সাদির উপযুক্ত হয়েছে বলে খবর এল। নূরজাহান তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেন নি। তিনি পাত্র নির্বাচন করেই রেখেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামী শের আফগানের বন্ধু ছিলেন মোবারক আলি। ঢাকার গ্রামাঞ্চলে তাঁর জমিদারী ছিল, আর ছিল এক সুদর্শন ও রণবিদ্যা বিশারদ পুত্র। নূরজাহান তারই সঙ্গে গুলনারের বিবাহের

ব্যবস্থা করে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে বলে সুবাদার কাসিম আলির অধীনে তাকে চার হাজারী মনসবদার করে দিলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে গুলনার এল সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা বাংলায়। রাজধানী ঢাকায় স্বামীর সান্নিধ্যে থাকত গুলনার, কিন্তু স্বামী ইউসুক যখন রাজকার্যে বাইরে যেত তখন সে এসে থাকত তাদের গ্রামাঞ্চলের জমিদারীতে। এত সবুজ আর প্রকৃতির অকাতর দানে সমৃদ্ধ এমন একটি অঞ্চল গুলনারের সৌন্দর্যপিপাসু মনের কাছে একটা সম্পদ ছিল। ছোট্ট একটি নদী গ্রামের সীমানা ছুঁয়ে বয়ে গিয়েছিল। গুলনার তার অন্দরমহলের ঝরোকা দিয়ে দেখত ঐ নদীটিকে। পাল তুলে নৌকা যেত, মেঘ হলে সাদা সাদা বকের পাতি ঐ নদীর চর থেকেই ডানা মেলে আকাশের বুকে উড়ে যেত। শরৎকালে নদীর চরে সাদা কাশের সে কি সমারোহ। দূর থেকে গুলনারের মনে হত তাকে যেন জ্যোৎস্না রাতের পরীরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক এক সময় গুলনার ছদ্মবেশে তার বাঁদিকে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে হুরীর মত ঘুরে বেড়াত কাশে ছাওয়া চরের বুকে।

আনন্দের অবধি ছিল না গুলনারের। সে স্বামীর সোহাগে আর নিজের মনের অফুরন্ত আনন্দে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ রচনা করত। শুধু এক জায়গায় জীবনের কাছে হেরে গিয়েছিল গুলনার। সে তার স্বামীকে দীর্ঘ ছ'সাত বছরের বিবাহিত জীবনে উপহার দিতে পারেনি একটিও সন্তান। তাই নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে স্বামীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু গুলনারের স্বামী তাকে ছাড়া সর্বত্রই অন্ধকার দেখত। গুলনার ছিল ইউসুফের জীবনে ভোরের শুকতারা।

গুলনারের মনে পড়ে এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণের কথা। সে একা এসেছিল গ্রামের বাড়িতে। বসে বসে দিনান্তের আয়োজন দেখছিল দিগন্তে। এমন আশ্চর্য সমারোহপূর্ণ দিনবসান সে তার জীবনে যেন এই প্রথমই দেখছিল। সহসা কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। হঠাৎ যেন ঝড়ের মেঘে গ্রামের বুকে নেমে এল অন্ধকার। বাতাসে ভেসে এল জহ্লাদের চীৎকার আর বলিপ্রদত্ত পশুর আর্ত হাহাকারধ্বনি।

অশ্বারোহী এক রক্ষী বাইরে থেকে চীৎকার করে বলল, মনিবাইন, এই মুহূর্তে বেরিয়ে শিবিকায় আরোহণ করুন। হার্মাদরা গ্রাম ঘিরে ফেলছে। বাহকেরা প্রস্তুত। দেখি শিবিকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি কিনা।

হার্মাদদের কথা শুনেছে গুলনার। তারা যে সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলকে

প্রায় জনশূন্য করে দিয়েছে, একথা গুলনারের অজানা নয়। তবে একটি শাখানদী বেয়ে এত ভিতরে ঢুকে আসতে পারে হার্মাদরা এ কথা তার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্যই ছিল।

গৃহের বান্দা আর বাঁদিদের দ্রুত পালাবার আদেশ দিয়ে গুলনার ঢুকল শিবিকার ভেতরে। সারা সময়ের জন্য নিযুক্ত বাহকেরা ছুটে চলল শিবিকাটি বহন করে। পাশে চলল অশ্বারোহী দেহরক্ষী।

গ্রামের এক প্রান্ত ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার সময় কালান্তক যমের মত সামনে বন্দুক আর তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়াল কয়েকজন হার্মাদ।

বিদ্যুৎগতিতে রক্ষী দিলওয়ার হোসেনের তরবারি কোষমুক্ত হল। লাফ দিয়ে যুদ্ধের ঘোড়া ঢুকে পড়ল শসস্ত্র হার্মাদদের ভেতর। শিবিকা বাহকেরা সেই মুহূর্তে শিবিকা ফেলে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। শিবিকা থেকে বেরিয়ে এল গুলনার। চীৎকার করে বলে উঠল, হোসেন সাহেব, আত্মসমর্পণ করুন।

গুলনারের কথায় মুহূর্তমাত্র বিচলিত হল দিলওয়ার হোসেন, সেই সুযোগে তার তরবারির অব্যর্থ নিশানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এক হার্মাদ। বন্দুকধারীরা কিন্তু বন্দুক ব্যবহার করছিল না। তলোয়ারধারীরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল। একটি মানুষকে হত্যা করার চেয়ে তাকে জীবন্ত ধরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করতে পারলে মুনাফা অনেক। কিন্তু দিলওয়ার হোসেনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনা এক অসম্ভব প্রচেষ্টা। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর সামান্য ইঙ্গিতেই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করছে, আবার বেরিয়েও আসছে। হার্মাদরাও রণবিদ্যায় সুনিপুণ।

শেষে দিলওয়ার হোসেনের অসি যখন এক হার্মাদের শির লক্ষ্য করে ঝলসে উঠেছে, তখন হার্মাদদের নিক্ষিপ্ত গুলি ভেদ করে গেল দিলওয়ারের কণ্ঠদেশ। অমনি অশ্ব মৃত প্রভুকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

স্তম্ভিত গুলনার সমস্ত ঘটনাটিকে যেন অনুধাবন করতে পারছিল না। সে চিরদিনই নির্ভীক, কিন্তু এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সাহসিকতার মূল্যই বা কতটুকু। তাকে হার্মাদদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হল। তারা তাকে শিবিকায় বসিয়ে নদীতীরে বাঁধা তাদের জাহাজের কাছে নিয়ে এল। হার্মাদরা রত্ন চিনতে কখনও ভুল করে না। গুলনারকে দেখেই তারা চিনেছিল, এ রত্ন সামান্য নয়। দাস-দাসীর হাটে বিকোবার

বস্তুই নয় এ। বিপুল ধনশালী কিংবা রাজামহারাজারাই একমাত্র পারে একে কিনতে।

সাধারণ হতভাগ্য কয়েদীদের মত তাকে নিক্ষেপ করা হয়নি জাহাজের খোলে। উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তার জন্য।

জাহাজের ক্যাপ্টেন ডিয়াগো-ডা-সা যখন তার নির্মম লুণ্ঠনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়াঙ্গার বলয় স্পর্শ করল তখন সূর্যাস্তের কিছু বাকী। দস্যুদলপতির নির্দেশে আকাশ লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি ছোঁড়া হল। তারপর বেজে উঠল ড্রাম আর বিউগল।

এই শব্দে দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ আর আরাকানী অধিবাসীরা জড়ো হল জাহাজঘাটায়। তারা ডিয়াগো-ডা-সার শিকারের কৌতূহলী দর্শকমাত্র।

প্রথমে জাহাজের অন্ধকার খোল থেকে টেনে বের করা হল হতভাগ্য বন্দীদের। কয়েকদিন অন্ধকারের ভেতর কাটিয়ে হঠাৎ আলোয় এসে তারা সময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারাল। জাহাজঘাটায় যখন তাদের নামিয়ে আনা হচ্ছিল তখন তারা চোখে দেখতে না পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের লাথি মেরে অথবা চুলের ঝুঁটি ধরে দাঁড় করান হচ্ছিল। তারা আতঙ্কে কাঁদছিল, মাথায় করাঘাত করে বিলাপ করছিল। হায় আল্লা, হায় আল্লা বলে বুক চপড়ে হাহাকার করছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা।

গুলনারকে দেখে দিয়াঙ্গার দর্শকেরা স্তম্ভিত। এমন রূপ যে একমাত্র বাদশাজাদার ঘরেই সম্ভব। গুলনার দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়েছিল। তার পদ্ম পাপড়ির মত বিশাল দুটি চোখ থেকে ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। হায়, ভাগ্য তাকে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে এল!

ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনরা জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছিল ডিয়াগো-ডা-সা-র শিকার। হঠাৎ এক ক্যাপ্টেনের চোখ মধুতে আবদ্ধ মক্ষিকার মত আটকে গেল গুলনারের দেহে! ঐ শিকারটিকে সাময়িকভাবে হলেও লাভ করতে হবে তাকে। কামনার আগুনে তখন জ্বলছিল সেই জলদস্যু।

অন্য এক বিবাহিত ক্যাপ্টেন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে এল ডিয়াগো-ডা-সা-র কাছে।

তোমারই আজ জয়জয়কার ডিয়াগো।

গর্বিত দৃষ্টিতে গুলনারের দিকে চেয়ে ডিয়াগো বলল, বহুদিন এমন শিকারের মুখ সম্ভবত দিয়াঙ্গায় কেউ দেখেনি।

অবশ্যই। আমি পুরোপুরি তোমার সঙ্গে একমত বন্ধু কিন্তু এই মূল্যবান রত্নটিকে এখন রাখবে কোথায়? এ তো সহজে বিকোবার নয়। এর ক্রেতা কেবল রাজা-বাদশাই হতে পারে।

তুমি ভাল মনে করিয়ে দিলে ভাই। যতদিন না একে উপযুক্ত জায়গায় পার করতে পারছি ততদিন একে নিরাপদে রাখাই এক সমস্যা। তাছাড়া জাহাজ নিয়ে কালই আমাকে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য সুন্দরবনে যেতে হবে। সাধারণ বন্দীদের রাখার কোন সমস্যাই নেই আমার আস্তানায় কিন্তু একে আর ওদের ভেতর রাখা যায় না।

বেশ, আমরাই ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু তার পরিবর্তে একটি জিনিস আমাদের উপহার দিতে হবে।

কি, বল?

আমার বউয়ের সুন্দরবনের মধু বড় পছন্দ। তুমি যদি তা এনে দিতে পার তাহলে বউয়ের জিম্মায় ক'দিন তোমার রত্নটিকে জমা রেখে দিতে পারি।

এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আজই নিয়ে যাও ভাই। যথা সময়ে সুন্দরবনের মধু দিয়ে এই মধুমতী যুবতীকে আমি খালাস করে নিয়ে যাব।

অবিবাহিত ক্যাপ্টেনটি তার বিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে গুলনারকে নিয়ে তুলল তার নিজের ডেরায়। খানাপিনার ঢালাও ব্যবস্থা হল রাতে। স্নান আর পোশাক পরিবর্তন করে গুলনার ঢুকল তার জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষে। সেখানে তাকে রাতের খাবার পরিবেশন করল এক বাঁদী। জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী এক কণাও সে গ্রহণ করতে পারল না। বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না তার। হাজার স্মৃতির বৃশ্চিক তাকে দংশন করতে লাগল। চোখের জলে ভিজল তার পোশাক।

তিন দিন তিন রাত্রি তাকে যত্ন আর সমাদরের সঙ্গে রাখা হল। চতুর্থ দিনে ঘটল অঘটন।

হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল গুলনারের। বাইরে কার যেন পদধ্বনি। পাশে শুয়ে থাকত যে বাঁদীটা নিঃশব্দে কখন সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য দরজাটা ভেজানো।

বিছানায় উঠে বসল গুলনার। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিসের যেন আভাস পেল।

ঝরোকার ভেতর দিয়ে ঘরে এসে পড়ছিল চাঁদের অস্পষ্ট আলো। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। একটি ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে

প্রায় নিঃশব্দে আগলটা বন্ধ করে দিলে।

এখন মূর্তিটা ধীরে ধীরে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, গুলনার বিবি, ঘুম আসেনি তোমার?

আবছা চাঁদের আলোয় গুলনার ঘরের মালিক ক্যাপ্টেনকে চিনতে পেরেছে। সে যে পরিষ্কার হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলতে পারে তার পরিচয় আগেই পেয়েছে গুলনার।

ক্যাপ্টেনের কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিল গুলনার, এইমাত্র জেগে উঠলাম।

আমি কি, বসতে পারি? বলতে বলতেই লোকটা গুলনারের পাশে বসার উপক্রম করল। অমনি গুলনার সরে গেল বিছানার একপ্রান্তে। মুখে কোন কথা উচ্চারণ করল না।

ক্যাপ্টেন এবার বলল, এই যে ঝরোকার ভেতর দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ঢেউয়ের গর্জন শোনা যাচ্ছে, এ তোমার ভাল লাগে না?

অস্পষ্ট জবাব গুলনারের, লাগে, তবে···।

উচ্ছ্বসিত আবেগ গলায় ঢেলে ক্যাপ্টেন বলল, তবে কি গুলনার বিবি?

পাখিকে খাঁচায় পুরে আকাশ দেখালে তার যেমন লাগে।

তোমাকে যদি মুক্ত করে নিয়ে ঐ সমুদ্রের বুকে ভেসে যাই তাহলে যাবে কি?

গুলনার এ কথার জবাব দিল না। তার অনেক কাছে সরে এল ক্যাপ্টেন। হঠাৎ একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় বন্দী করে বলল, নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা ভুলে যাও গুলনার বিবি। আমি তোমাকে নতুন করে বাঁচার স্বাদ দেব।

কথা বলা শেষ করেই কামার্ত লোকটা প্রচণ্ডবেগে নিজের দিকে টেনে নিল গুলনারকে।

অসহায় গুলনার আকুল প্রার্থণা জানিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, আমার ইজ্জৎ নেবার আগে দয়া করে আপনার তরবারি দিয়ে আমার শিরচ্ছেদ করুন।

এমন সুন্দর যৌবনকালে কেউ কি মৃত্যু চিন্তা করে বিবি। এস, আমরা নতুন করে জীবনকে উপভোগ করি।

পশুটার প্রচণ্ড আকর্ষণের কাছে নিজের দুর্বল শক্তি দিয়ে বৃথা বাধা দিতে চাইল না গুলনার। বরং সে এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত পাবার জন্য অভিনয়ের আশ্রয় নিল।

আমি রাজি ক্যাপ্টেন, কেবল একটি শর্তে।

বল কি শর্ত তোমার?

আমাকে সাদি করলে তুমি জীবনে আর কাউকে গ্রহণ করতে পারবে না।

কথা দিচ্ছি গুলনার বিবি। এ কথার নড়চড় হবে না কোনদিন।

কামার্ত পশুটা অধীর আনন্দে গুলনারকে দীর্ঘ চুম্বনে বেঁধে রাখল। সেই মুহূর্তে গুলনার তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে তার তীক্ষ্ণ দাঁতের চাপে কেটে নিল পশুটার জিভের অগ্রভাগ। অমনি প্রাণফাটা আর্তনাদ তুলে মেঝেতে ছিটকে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগল পশুটা।

মুহূর্তে দরজায় করাঘাত করতে লাগল ক্যাপ্টেনের লোকেরা। দরজা খুলে দিল গুলনার। সে তখন ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল।

আলো জ্বালা হল। রক্তে ভিজে গেছে ক্যাপ্টেনের পোশাক। সে নিজের জিভের অবস্থা দেখিয়ে গুলনারের দিকে নির্দেশও করল। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় অচৈতন্য হয়ে গেল। চোখ দুটো তার ঠেলে বেরিয়ে এল।

পাশেই ক্যাপ্টেনের বন্ধুর বাড়ি। বান্দা ছুটল খবর দিতে। কালবিলম্ব না করে বন্ধু এল বন্ধুর বাড়ি। ক্যাপ্টেনের অবস্থা দেখে তার মনে হল মৃত্যু সুনিশ্চিত। অমনি দ্রুত এক বান্দাকে পাঠিয়ে দিল চার্চে ফাদার ম্যানরিককে খবর দিতে। মৃত্যুর আগে কৃতকর্মের স্বীকৃতি নেবেন ফাদার।

এদিকে বন্ধুর এই ভয়াবহ পরিণতিতে ক্ষুব্ধ ক্যাপ্টেন আদেশ দিল গুলনারকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলতে। বাঁধা শেষ হলে ক্যাপ্টেন চীৎকার করে বলে উঠল, এ শয়তানীকে ভাসিয়ে দিয়ে আয় সমুদ্রের জলে।

আদেশ পালন করতে বান্দারা তাকে টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

ধূসর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর। ফাদার ম্যানরিক মৃত্যুপথযাত্রীর স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দ্রুত পায়ে সমুদ্রতীর ধরে আসছিলেন, হঠাৎ চাপা একটা কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন।

কে কাঁদে?

তিনটি ছায়ামূর্তি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি ছায়ামূর্তি ফাদারের কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়াল। ফাদার এবার তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে তারা দ্রুত দূরে সরে গেল।

ফাদার গুলনারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত গলায় বললেন, কে তুমি?

গুলনার বালির ওপর ফাদার ম্যানরিকের সামনে নতজানু হয়ে বসে বলল, আমি হতভাগিনী গুলনার।

ফাদার দেখলেন মেয়েটি সম্ভ্রান্ত আর তার হাত দুটি পিছমোড়া করে বাঁধা। তিনি মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, নির্ভয়ে বল, কারা তোমার এ দশা করেছে এবং কেন?

আনুপূর্বিক সকল ঘটনা ফাদার ম্যানরিককে বলে গেল গুলনার। সব শুনে ম্যানরিক বললেন, তোমাকে দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে তোমাকে এই দিয়াঙ্গায় আর কেউ অসম্মান করতে সাহসী হবে না, এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

আপনার কাছে এজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনি যা বলবেন, সে নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

ফাদার ম্যানরিক বললেন, এস আমার সঙ্গে।

গুলনার নির্ভয়ে আর পরম ভরসায় ম্যানরিককে অনুসরণ করে চলল।

কিছু পথ যাবার পর ফাদার ম্যানরিক থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন।

সামনেই একজন সম্ভ্রান্ত বিচারকের বাড়ি। তিনি যথার্থ অর্থে খৃষ্টান। তুমি তাঁর বাড়িতে থাকলে নির্ভয়ে থাকতে পারবে। অবশ্য তোমার মালিক ডিয়াগো-ডা-সা ফিরে এলে তার ইচ্ছানুযায়ী চলতে হবে তোমাকে।

সে আমি জানি ফাদার!

আর একটি কথা…।

বলুন।

তুমি তোমার ধর্মে থেকে যেভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মরক্ষার সুযোগ পাবে যদি আমার পরামর্শ মত কাজ কর।

আপনি আমার প্রাণ আর মান দুটোই রক্ষা করেছেন, এখন আমাকে যে আদেশ করবেন তাই শুনব।

তুমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর, অনেক বিপদের হাত এড়াতে পারবে।

গুলনার আল্লার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলল, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ মেহেরবান।

পরক্ষণে উদ্ধারকর্তা ম্যানরিকের দিকে চেয়ে বলল, আপনার পরামর্শ মতই কাজ হবে ফাদার।

ম্যানরিক গুলনারকে বিচারকের বাড়িতে রেখে ক্যাপ্টেনের গৃহাভিমুখে ছুটলেন।

আহত ক্যাপ্টেন সেবাযত্নে ইতিমধ্যেই অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছিল, তাই ফাদারের শেষ সময়ের স্বীকৃতি আদায়ের আর প্রয়োজন পড়ল না। পরদিন যথারীতি গুলনারের খৃষ্টধর্মে দীক্ষার কাজ সম্পন্ন হল।

অন্ধকারে বসে থেকে জীবনের অতীত পাতাগুলো দ্রুত উল্টে চলেছিল গুলনার। এখন আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। বৃষ্টিহীন আকাশ অজস্র তারার ফুল ফুটিয়েছে। সারি সারি মেঘ ভেসে চলেছে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তারাগুলো একবার মেঘের ভেতর লুকোচ্ছে আবার একমুখ হাসি ছড়িয়ে ফুটে উঠছে।

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে আছে আর প্রেমিকার হাত ধরে স্থির হয়ে বসে আছে ব্রাহ্মণ যুবকটি।

পাশের অরণ্যে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় অসংখ্য কীটপতঙ্গ নিজস্ব পদ্ধতিতে আনন্দের স্বরগ্রাম সেধে চলেছে। এক ঝাঁক জোনাকী ঘুরে ঘুরে নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে অরণ্যের রঙ্গমঞ্চের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর কোন জন্তু ডাক দিয়ে উঠতেই অরণ্য, পাহাড় কাঁপিয়ে ভীরু জন্তুর দল লাফিয়ে নেমে যেতে লাগল নিচের দিকে। অমনি গর্জন করে উঠল রক্ষীদের বন্দুক। ড্রাম পিটিয়ে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হল, কেউ যেন যাত্রীদের ত্রিসীমানায় ভুলেও প্রবেশ না করে।

ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হল যাত্রা। শেষবেলায় ওরা এসে পৌছল এক নদীর ধারে। বর্ষার জলে নদী ফুলে ফেঁপে প্রবল স্রোতে পাথর গুঁড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এ নদী পার হয়ে যেতে হবে ওপারে। কিন্তু উপায় কি? এ যে দুস্তর নদী, দুর্বার স্রোত এর। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় কি উপায়ে!

ওরা কাঠ কেটে একটা পারাপারের ভেলা তৈরি করল। লম্বা কাছির সঙ্গে বেঁধে সে ভেলা ছেড়ে দেওয়া হল নদীর স্রোতে। ভেলাটি কিছুদূর স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে একটা পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে দু'টুকরো হয়ে গেল।

এবার আরও শক্ত করে তৈরি করা হল ভেলা, কিন্তু পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ায় পারাপারের কাজ সে রাতের মত স্থগিত রইল। রাতে অঝোরে নামল বৃষ্টি। আগুন জ্বালানোর চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল। সবাইকে তাই সে রাতের মত অভুক্ত থাকতে হল। তিনদিন একটানা চলল প্রবল বৃষ্টি, সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। পাহাড়ে পাহাড়ে বাজের আওয়াজ ঘুরে ঘুরে

বাজতে লাগল। পাথরে ধাক্কা খেয়ে প্রবল স্রোত লাফিয়ে ছুটে চলল কেশর ওড়ানো দুরন্ত সাদা ঘোড়ার মত।

অবর্ণনীয় অবস্থায় যাত্রীদের। তিনদিন প্রায় অভুক্ত থাকতে হল সবাইক। চাল ভিজিয়ে তাই চিবিয়ে ক্ষুধার জ্বালা উপশম করল কেউ কেউ। ছোট ছোট পাহাড়ী গুহা খুঁজে তার ভেতর দু'একজন করে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করল।

চতুর্থ দিনে মেঘ সরে গিয়ে আলো ফুটল পুব দিকে। প্রথমেই পারাপারের চেষ্টা না করে আগুন জ্বালান হল। বন্দী দাস থেকে রক্ষীরা সকলেই নিজেদের আধভেজা পোশাকগুলো সেঁকে নিল আগুনে। ফাদার ম্যানরিক আর ক্যাপ্টেন টিবাও হাওদার ভেতর থাকায় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। এখন রান্না খাবারের জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আহার পর্ব চুকলে শুরু হল পারাপারের চেষ্টা। একটা হাতিকে জলে নামান হল এবার। প্রবল স্রোত ঠেলে বিপুলকায় জন্তুটি এগোতে লাগল একটি কচ্ছপের মত। অনেক চেষ্টা আর পতন সামলে সে এক সময় পৌঁছে গেল ওপারে। তার দেহের সঙ্গে বাঁধা ছিল একটি কাছি। সেই কাছিতেই এপার ওপার যোগসূত্র হল। এখন কাঠের ভেলায় নদী পারাপার অনেকখানি সহজ হয়ে গেল।

দলের পর দল পেরিয়ে যেতে লাগল ভেলায়। শেষ দলটিতে ছিল একজন রক্ষী, ক্যাপ্টেন, ফাদার আর গুলনার। ঠিক তার আগের দলটি ঘটাল এক অঘটন। দু'জন রক্ষী আর ঐ প্রেমিকযুগল যখন পার হচ্ছিল তখন স্রোতে আচমকা একটা পাহাড়ী ঢল নেমে এল। ফুলে উঠল জলস্রোত, দ্বিগুন হল গতিবেগ। ভেলাটা অকস্মাৎ দুলে উঠতেই ছিটকে পড়ল ব্রাহ্মণ যুবকটি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তরুণীটি হুমড়ি খেয়ে তাকে ধরতে যাচ্ছিল, দু'জন রক্ষী তাকে চেপে ধরে অনিবার্য পতনের হাত থেকে বাঁচল।

জলে আর পাথরে ধাক্কা আর লাট খেতে খেতে মানুষটা ভেসে গেল কতদূর। ওপারের রক্ষীরা নদীর ধারে ধারে ছুটল তার সন্ধানে। তরুণীটি নেমেই পাগলের মত ছুটে চলল রক্ষীদের অনুসরণ করে।

শেষ পারাপার বন্ধ রইল কতক্ষণ। স্বাভাবিক স্রোত ফিরে আসতেই অবশিষ্ট দলটি ভেলায় করে ওপারে গিয়ে উঠল।

সন্ধানী দলটি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিমর্ষ আর উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল সকলে।

গুলনার ভাবছিল ব্রাহ্মণ যুবকটির কথা। তিনদিন বৃষ্টিতে গুহাবন্দী থেকে সে ব্রাহ্মণ যুবক ভবতোষ সম্বন্ধে জেনেছিল অনেক কিছু। তরুণী পুষ্পমঞ্জরী আর যুবক ভবতোষের সঙ্গে গুলনাব ছিল একই গুহায। বাইরে পড়ত অঝোব বৃষ্টি আব ভবতোষ গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করত কালিদাসেব মেঘদূতেব শ্লোক। কিছু বুঝত না গুলনার। ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে শ্লোকেব ব্যাখ্যা কবে বোঝাবাব চেষ্টা কবত ভবতোষ।

গুলনারেব মার্জিত রুচি, প্রবল কৌতূহল। সে জানতে চাইত, কালিদাস কে?

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের একজন সেরা কবি।

মেঘদূত কি?

তাঁবই লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ।

ওতে কি বিষয়ে লেখা হয়েছে?

ভবতোষ বলত, সে অনেক কথা! সংক্ষেপে বলি, এক নববিবাহিত যক্ষ তাব বধূব কথা ভাবতে ভাবতে প্রভুর কাজে বিঘ্ন ঘটায। প্রভু তখন যক্ষটিকে অনেক দূবে রামগিবি পর্বতে নির্বাসন দেন। যক্ষ প্রিয়তমাব বিবহে বড় কাতব হযে পড়ে। এমনি এক বর্ষা ঋতুতে সে দেখতে পায় মেঘ জমেছে পাহাড়ের ওপবে। তখন বিবহী যক্ষ ঐ মেঘকে দূত করে পাঠায় তাব দূববাসিনী প্রিযাব কাছে। মেঘেব যাত্রাপথেব বর্ণনায আব যক্ষপ্রিয়াব বর্ণনায় পূর্ণ হযেছে কাব্যটি।

গুলনাব বলে কাব্য কাহিনীটি তো বড সুন্দব। আপনি বুঝি ঐ কাব্যেবই কিছু অংশ আবৃত্তি কবছিলেন।

হ্যাঁ।

অর্থ বুঝতে না পাবলেও আপনাব কণ্ঠ-মাধুর্যে যে কেউ মুগ্ধ না হযে পাববে না।

ভবতোষ অমনি প্রণয়িনী আব মুগ্ধ শ্রোতার সামনে আবৃত্তি করে চলে:

'বীচিক্ষোভ-স্তনিতবিহগশ্রেণীকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥'

গুলনার আবৃত্তির শেষে অনুরোধ জানায়, এর অর্থটুকু যদি বুঝিয়ে বলেন। সোৎসাহে ভবতোষ বলতে থাকে—হে মেঘ, তোমার পথে পড়বে নির্বিন্ধ্যা

নদী, পাথরে পাথরে আহত হয়ে কলধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে। সঙ্গে ছুটেছে হাঁসের শ্রেণী। মনে হবে ওরা যেন নদীর মেখলা। হাঁসের কলরব, জলের কলধ্বনি সব মিলে যেন নদীর কটিভূষণের ঝঙ্কার। কোথাও পাথরের আঘাতে নদীর গতি বাধা পাচ্ছে, অমনি অশান্ত হয়ে উঠছে স্রোত। যেখানে বাধা নেই সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে ঘূর্ণি। ঐ ঘূর্ণি যেন সুন্দরী নদীর নাভিকূপ। হে মেঘ, তুমি আকাশ থেকে নেমে এসে ঐ সুন্দরী তটিনীর একটু রসাস্বাদন করে নিও। অনেক কথা বলার শক্তি ওর নেই, তাতে কি, ভাববিলাসই নারীর প্রথম প্রণয়বাক্য।

ভবতোষের ব্যাখ্যা শেষ হলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গুলনার, কি অপূর্ব ছবি, ঠিক যেন আমাদের সামনের নদীটির কথাই বলেছেন কবি।

ভাবনার স্রোতে ধাক্কা খেল গুলনার। একি হল! যে মানুষটি বন্দী হয়েও ভালবাসার কথা এমন করে বলে যেতে পারে, দুঃখকে এমন করে খুশির মোড়কে ঢাকতে পারে তার কেন এমন পরিণতি হল! এই মুহূর্তে গুলনারের মনে হল, মানুষ যে বেঁচে আছে সেইটাই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। মৃত্যুটাই নিশ্চিত এবং স্বাভাবিক!

প্রায় এক প্রহর প্রতীক্ষার ভেতর কাটাতে হল সবাইকে। ফাদার ম্যানরিক ভাবলেন, এই বুদ্ধিমান যুবকটি বেঁচে থাকলে তাকে নিশ্চিন্ত খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া যেত। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন টিবাওয়ের ভাবনা হল, এমন একটা বুদ্ধিমান ক্রীতদাস যে কোন মালিকের গর্বের বস্তু। তাছাড়া এ ধরনের ক্রীতদাসের মূল্য অনেক। প্রভুর বড় বড় কাজকর্ম সামলে রাখতে পারবে এরা।

ক্রীতদাসরা বসে বসে ভাবতে লাগল, কি সৌভাগ্য করে এসেছিল লোকটা, তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে গেল।

হঠাৎ একটা কোলাহল পড়ে গেল বন্দীদের ভেতর, ঐ তো, ঐ তো সে আসছে।

রক্ষীরা ভবতোষকে বয়ে আনছিল। সঙ্গে সঙ্গে আসছিল পুষ্পমঞ্জরী।

মানুষটা জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছিল না।

গুলনার দূর থেকে হাত তুলল। সে পুষ্পমঞ্জরীকে দেখতে পেয়েছে। সেও হাত তুলে জানাবার চেষ্টা করল, মানুষটা এখনও বেঁচে আছে।

ক্ষতবিক্ষত হলেও বেঁচে গিয়েছিল ভবতোষ। তবে চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছিল। গুলনার ফাদারের কাছে অনুরোধ জানাল, ভবতোষকে

যেন বাকী পথটুকু হাতির পিঠে সামান্য একটু জায়গা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফাদারের রাজি না হয়ে উপার ছিল না। .কারণ এই খোঁড়া মানুষটাকে ফেলে যাওয়া যায় না, আবার সুস্থ করে নিয়ে যেতে হলে কতদিন লাগবে কে জানে। এদিকে রাজার কাছে পৌছতে দেরি হলে যদি রাজকীয় নৌবহর দিয়াঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তাহলে সমুহ বিপদ।

এখন থেকে গুলনারের যাত্রাসঙ্গিনী হল পুষ্পমঞ্জরী। হাতির পিঠে বসে ভবতোষ তাদের দুজনকে দেখতে দেখতে চলল। আরাকানী রক্ষীরা বুনো গাছের পাতার রস লাগিয়ে ভবতোষের ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করে তুলছিল। ভবতোষ চাইছিল যত সত্বর সম্ভব সে হাতির পিঠ থেকে নেমে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

এক সময় বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে ওরা এসে পৌছল কলদান নদীর ধারে। জায়গাটার নাম উরুরিতাং। কলদান নদী ওখানে সমুদ্র-সান্নিধ্য লাভ করার জন্য বিশাল আকার ধারণ করেছে।

ওরা দেখতে পেল আরাকানের নৌবহর কলদানের মুখেই অপেক্ষা করছে। আশ্বস্ত হলেন ম্যানরিক। তিনি ক্যাপ্টেন টিবাওকে সঙ্গে নিয়ে সত্বর যাত্রা করলেন নৌ-সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য।

সেনাপতি মানুষটির সঙ্গে দেখা করে আর কথা বলে ফাদার ম্যানরিকের মনে হল, মানুষটি ধীর স্থির ও বিবেচক। তিনি তাঁর কাছে তাঁদেস আগমনের হেতু বিশ্লেষণ করে বললেন। সব শুনে সেনাপতি বললেন, দিয়াঙ্গার পর্তুগীজেরা আরাকান-রাজের চেয়ে মোগলদের বেশী পছন্দ করে এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু মহারাজের আদেশ পালন করাই আমাদের কাজ, তাই নৌবহর নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। প্রকৃতি প্রসন্ন হলেই অভিযান শুরু হবে।

ম্যানরিক বললেন, এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের কাছে বহু মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। অনুগ্রহ করে আমাদের কর্তব্য স্থির করে দিন।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন সেনাপতি। পরে বললেন, আমি আমার এক বন্ধুকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পত্র লিখে দিচ্ছি। তিনি অন্যতম রাজ প্রতিনিধি। রাজার অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। আপনারা তাঁর মাধ্যমে রাজদর্শন লাভ করলে কার্যোদ্ধার হবে বলে মনে করি।

এরপর সেনাপতি বন্ধুকে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি শেষ করে বললেন,

রাজধানীতে যেতে হলে আপনাদের এই নদী-মোহনা অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু এ দুর্যোগে পারাপারের নৌকো পাওয়া অসম্ভব।

একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আপনাদের জন্য আমি নৌবহরের একটি জাহাজ ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জাহাজ আপনাদের ওপারে নির্বিঘ্নে পৌছে দিয়ে আসবে।

ক্যাপ্টেন টিবাও বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই।

হেসে বললেন সেনাপতি, দিয়াঙ্গার পর্তুগীজদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ আছে বলে আমি মনে করি না। আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে জানবেন, আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হব।

ক্যাপ্টেন আর ফাদার ম্যানরিক হাতি ও ক্রীতদাসদের নিয়ে জাহাজে উঠলেন। বিশাল পালতোলা জাহাজ জল কেটে অর্ধপ্রহর সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দলটাকে কলদান নদীর ওপারে পৌছে দিল।

এরপর সবুজ অরণ্য, শস্যক্ষেত্র আর নদীধৌত উপত্যকা পেরিয়ে ফাদার ম্যানরিকের দলটি একদিন এসে পৌছল রাজধানী 'ম্রাউক-উ'তে।

সেনাপতির পত্র নিয়ে ক্যাপ্টেন টিবাও আর ফাদার ম্যানরিক দেখা করলেন রাজ-প্রতিনিধিটির সঙ্গে। পত্র পাঠ করে তিনি আশ্বাস দিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই মহারাজের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজ-প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন আর ফাদারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ-সন্নিধানে চললেন।

পাহাড়ের উপর অবস্থিত সুরক্ষিত প্রাসাদে প্রবেশের সময় ওরা দেখতে পেল জাপানের বিখ্যাত সামুরাই যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদ-রক্ষীরা ফাদারকে দেখে মাথা নোয়াল। রাজ-প্রতিনিধিটি যখন বললেন, এরা জাপানের অধিবাসী হলে কি হবে, সকলেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত, তখন বিস্মিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হলেন ফাদার ম্যানরিক।

এরপর ওঁরা প্রবেশ করলেন প্রধান দরবারকক্ষে। সেখানে কিন্তু মহারাজের সঙ্গে ওঁদের সাক্ষাৎ হল না। কয়েকজন ব্রহ্মদেশীয় প্রহরী ওঁদের নিয়ে গেল দ্বিতীয় একটি কক্ষে। সেখানে পাঠান রক্ষীরা দাঁড়িয়েছিল। ওরা দলটিকে নিয়ে গেল তৃতীয় একটি প্রকোষ্ঠে। সেখানে দেখা গেল কয়েকজন সুসজ্জিত সভাসদ বসে রয়েছেন। তাঁরা ম্যানরিকদের অভিবাদন জানালেন।

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে ওঁরা এলেন ক্ষুদ্র একটি কক্ষে। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। রাজপ্রতিনিধি অতি মৃদু তিনবার করাঘাত করলেন। দ্বার খুলল না। কিন্তু দ্বারসংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি গবাক্ষ খুলে গেল। হঠাৎ সেখানে ভয়ঙ্কর-দর্শনা এক নারীর মুখ ভেসে উঠল। অতীব কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল, কার এত দুঃসাহস যে সে দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বরের সামনে আসতে ভয় পায় না?

অতি বিনীত স্বরে প্রতিনিধিটি জানাল, প্রভুর আদেশে আমি বিদেশীদের তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ক্ষুদ্র গবাক্ষটি। কয়েক মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় কাটল ক্যাপ্টেন টিবাও আর ফাদার ম্যানরিকের। এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্য দুই বিদেশী একেবারে প্রস্তুত ছিল না।

পুনরায় গবাক্ষটি খুলে গেল। তিনজনেই সচকিত হয়ে সেদিকে তাকালেন। আশ্চর্য! এবার হাস্যময়ী এক দেবকন্যার মুখ সেখানে ফুটে উঠেছে।

অতি সুললিত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল—

তোমাদের স্বাগত জানাই হে বিদেশী বন্ধু
যেমন করে দগ্ধ দীর্ণ মৃত্তিকার বুকে
কৃষিজীবীরা আহ্বান জানায় বর্ষার মেঘকে।
হে বিদেশী বন্ধুগণ, আনন্দিত হও,
আমাদের জীবনের দেবতা প্রসন্ন হাসিতে
তোমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

কথাগুলি উচ্চারণ করে দেবকন্যাটি সরে গেল। অমনি খুলে গেল দ্বার। রাজ-প্রতিনিধির সঙ্গে প্রসন্ন চিত্তে একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন টিবাও আর ম্যানরিক।

মহারাজ থিরি-থু-ধম্মা বসে রয়েছেন দেয়াল সংলগ্ন উচ্চাসনে, অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়ঃক্রম। দু'দিকে সুসজ্জিতা ভীমকায়া রক্ষীবাহিনী। পশ্চাতে ছত্রধারিণী সেই অনিন্দ্য সুন্দর দেবকন্যাটি। রাজার পরিধানে চিনাংশুকের পরিচ্ছদ, কণ্ঠে কয়েক নরী মুক্তার মালা। মুকুট বহুমূল্য রত্নখচিত। ছত্রধারিণীর পরিধানে শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ, প্রান্তগুলি স্বর্ণসূত্রে চিত্রিত। কৃষ্ণবর্ণের রক্ষীবাহিনী ততোধিক গাঢ় রক্তবর্ণের পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করে রেখেছিল।

প্রকোষ্ঠে ঢুকেই সটান কার্পেট বিছানো মেঝেতে প্রণিপাতের ভঙ্গীতে উবু হয়ে শুয়ে পড়লেন রাজ-প্রতিনিধিটি। তিনবার মাথা ঠুকে প্রণতি জানালেন মহারাজকে।

তাঁকে অনুসরণ করে ঠিক সেইমত মহারাজকে অভিবাদন জানাল ক্যাপ্টেন টিবাও আর ফাদার ম্যানরিক।

এরপর ম্যানরিকের আনা উপহারগুলি মহারাজের সামনে রাখা হল। লবঙ্গ দিয়ে তৈরি সুদর্শন একটি মুকুট, যা কেবলই দৃষ্টিগ্রাহ্য, শিরোধার্য নয়। স্পেনদেশীয় ভেড়ার লোমে প্রস্তুত একখানি উৎকৃষ্ট আলোয়ান। চোদ্দটি তিব্বতীয় কস্তুরীর মোড়ক আর একটি সুদৃশ্য আধারে বসোরাই গোলাপের নির্যাস।

মহারাজ সেগুলির দিকে একবার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন। পরক্ষণেই রাজপ্রতিনিধির কাছে জানতে চাইলেন বিদেশীদের আগমনের উদ্দেশ্য।

রাজপ্রতিনিধিটির পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞান ছিল। তিনি রাজা ও বিদেশীদের মধ্যে দোভাষীর কাজ চালাতে লাগলেন।

ফাদার ম্যানরিক এমন বিনয় আর নিপুণতার সঙ্গে দিয়াঙ্গার পর্তুগীজদের নির্দোষিতার কথা প্রমাণ করলেন যে মহারাজ তৎক্ষণাৎ তা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিলেন। তিনি বললেন বিশেষ দূতের মাধ্যমে তিনি নৌসেনাপতির কাছে আদেশ পাঠাবেন, যাতে দিয়াঙ্গা অভিযান থেকে তারা বিরত থাকে।

ম্যানরিক কৃতজ্ঞতায় রাজাকে পুনর্বার অভিবাদন জানালেন।

মহারাজ জানতে চাইলেন আর কোন বক্তব্য আছে কিনা।

ফাদার ম্যানরিক বললেন, 'ম্রাউক-উ'তে আপনার অনুগত বহু পর্তুগীজ প্রজার বাস, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের একটি চার্চ নেই, মহারাজ যদি তাদের উপাসনার জন্য একটি চার্চ তৈরি করে দেবার অনুমতি করেন।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল থিরি-থু-ধম্মার মুখে। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, ম্যানরিকের প্রস্তাব তিনি কার্যকরী করবেন যদি ম্যানরিক নিজে 'ম্রাউক-উ'তে থেকে তার দায়িত্ব নেন।

ফাদার ম্যানরিক বুঝলেন, মহারাজ দিয়াঙ্গার দূতটিকে নিজের রাজধানীতে বেঁধে রাখতে চান। তিনি তাঁর সম্মতি জানিয়ে বললেন, মহারাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

এরপর কথা শুরু করলেন ক্যাপ্টেন টিবাও। তিনি বললেন, মহারাজ, আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন 'রামু'র শাসনকর্তা আপনার আসন্ন অভিষেকের কথা স্মরণ করে একদল ক্রীতদাসকে উপহাররূপে পাঠিয়েছেন।

মহারাজ তাঁর প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্রীতদাসদের এখন আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও, অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হলে আমার

কাছে নিয়ে এস তখন আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

একটু থেমে বললেন, আর কিছু?

টিবাও বললেন, মহারাজ, দিয়াঙ্গার শাসনকর্তা যে মুসলিম সম্ভ্রান্ত মহিলাটির কথা জানিয়ে বলেছিলেন, এই মহিলাটির অপহরণই মোগলদের ক্রোধের কারণ। এবং সেই সূত্রে মোগল ও পর্তুগীজদের গোপন মিলনের একটা কল্পিত কাহিনী রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, সে ক্রীতদাসীকে আমি তার মালিক ক্যাপ্টেন ডিয়াগো-ডা-সা-র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছি। এখন আপনার নির্দেশ মতই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

মহারাজ বললেন, ক্যাপ্টেন ডিয়াগো-ডা-সা ঐ ক্রীতদাসীর জন্য কি পরিমাণ মূল্য প্রত্যাশা করেন?

আপনার অভিরুচি অনুযায়ী মূল্য নিরূপিত হবে।

পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে মহারাজ।

থিরি-থু-ধম্মা প্রতিনিধিকে বললেন, এই ক্রীতদাসীটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে রাখ। অভিষেকের পরে অন্য দাসদাসীর সঙ্গে ওকেও নিয়ে এস আমার কাছে।

এরপর সহসা মহারাজ আর ফাদার ম্যানরিকদের মাঝখানে একটি পর্দা নেমে এল।

এটি সাক্ষাৎপর্ব সমাপ্তির ইঙ্গিত।

পথে আসতে আসতে কথা প্রসঙ্গে ম্যানরিক জানতে পারলেন, বার বছর আগে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করলেও জ্যোতিষীর নির্দেশে তাঁর অভিষেক-ক্রিয়া স্থগিত ছিল। সামনের শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই শুরু হবে সে উৎসব।

ম্যানরিক আর টিবাও ফিরে এলেন পর্তুগীজ মহল্লায়। 'ব্রাউক-উ'র পর্তুগীজরা যখন শুনল তাদের জন্য একটি চার্চ মহারাজ তৈরি করে দেবেন তখন তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না।

রাজার অভিষেকের অনুষ্ঠান পর্ব শুরু হল। সারা নগরী সাজল নতুন সাজে। দৃষ্টিনন্দন তোরণের শীর্ষে উড়তে লাগল রাজকীয় পতাকা।

কয়েকদিন আগে থেকেই রাজধানীতে সমবেত হয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তারা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন দেশের বণিকের দল। তারা সঙ্গে এনেছে নানাদি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য। শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছে এইসব বণিক সম্প্রদায়। তারা যথাযোগ্য

স্থান ভাড়া নিয়ে তাদের পশরা সাজিয়েছে। সুগন্ধী কাষ্ঠ, উৎকৃষ্ট রেশম-বস্ত্র, মূল্যবান গালিচা, কারুকার্যখচিত ধাতুপাত্র প্রভৃতি সজ্জিত হয়েছে মনোরম সুষমায়। দর্শক ও ক্রেতাদের দৃষ্টি যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

গ্রাম, শহর ভেঙে মহারাজের অভিষেক দেখার জন্যে কাতরে কাতারে নারী পুরুষ বালবৃদ্ধ যুবা সমবেত হয়েছে রাজধানীতে।

উৎসবের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই পিত্তল নির্মিত শিঙা বাজতে লাগল। নগরীর জলপথগুলিতে সুসজ্জিত নৌকারোহীরা সাধারণ মানুষের নিদ্রাভঙ্গের জন্য এই সব বাজাচ্ছিল।

লোকেরা দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে প্রস্তুত হয়ে নিল উৎসবে যোগ দেবার জন্য। আরাকানরাজ্যের বারটি বিভাগের শাসনকর্তারা সুসজ্জিত হস্তিতে আরোহণ করে প্রাসাদ অভিমুখে চললেন।

প্রাসাদের প্রধান দরবার কক্ষটি মহারাজের অভিষেকের জন্য সাজান হয়েছে। মেঝেতে কারুকার্যখচিত অতি মূল্যবান গালিচা পাতা। কক্ষের ঊর্ধ্বদেশ একহস্ত পরিমিত স্বর্ণবর্ণের বনাত দিয়ে ঘেরা। কদম্ব পুষ্পের আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের ঝালর ঝুলছে সেই বনাতের নিম্নভাগ থেকে। স্তম্ভগুলি চিনাংশুকে জড়ানো। রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপে শ্বেত হস্তি সারি দিয়ে চলেছে। শ্বেত হস্তি সৌভাগ্যের প্রতীক। থিরি-থু-ধম্মার পিতামহ রাজাগ্রী ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে অজস্র রত্নসম্ভারের সঙ্গে একটি শ্বেত হস্তি নিয়ে আসেন। ঐ শ্বেত হস্তিটিকে যখন নদীতে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন দ্বাদশজন সংবাহক তার ওপর শ্বেত-বর্ণের একটি চন্দ্রাতপ ধরে নিয়ে যায়। স্নানের সময় স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে সুগন্ধী জল ঢালা হয় তার দেহে। নদী থেকে উঠে আসার সময়ে পায়ে যেটুকু কর্দম লেগে থাকে রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত জলে সে মালিন্য ধুইয়ে দেওয়া হয়।

থিরি-থু-ধম্মাকে জ্যোতিষী বলেছেন, তিনি একদিন পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। আরাকানের পর্বতে মহামুনির (প্রস্তরখোদিত বুদ্ধের একটি মূর্তি) অধিষ্ঠান। আরাকানরাজের অধীনে শ্বেত হস্তি। সুতরাং সকল সুলক্ষণের সমাবেশ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁর চরণে মুকুট সমর্পণ করে তাঁকে রাজচক্রবর্তী পদে বরণ করবেন। আপাতত সে সম্ভাবনা না থাকায় দ্বাদশজন বিভাগীয় শাসনকর্তাকে রাজা এক একটি স্বর্ণমুকুট দান করেছেন। এই সব মুকুটধারী শাসনকর্তাদের ধরে নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রাজা। তাঁরা সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে চলেছেন

পৃথিবী পতি মহারাজাধিরাজের সকাশে।

পাহাড়ের ওপরে রাজপ্রাসাদ থেকে দ্বাদশবার তোপধ্বনি হল। মহারাজ স্নানাদি সম্পন্ন করে প্রস্তুত হয়েছেন অভিষেক উৎসবের জন্য। দ্বাদশ শত হস্তি প্রাসাদ বেষ্টন করে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নানা বর্ণের হাওদার মধ্যে বসে আছেন রাজার স্বজন-বন্ধু, নগরীর বণিকশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানীয় ব্যক্তিরা। উদিত সূর্যের আলো এসে পড়েছে প্রাসাদের স্বর্ণ-খচিত চূড়ার ওপর। আশ্চর্য পীতাভ দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে নগরীর চতুর্দিকে। করিযূথের স্বর্ণলাঞ্ছিত আস্তরণেও সেই সূর্যালোকের দীপ্তি ঝলসে উঠছে।

দ্বাদশজন স্বর্ণমুকুটধারী শাসনকর্তা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান দামামাবাদক রৌপ্য শিকলে দোদুল্যমান বিরাট দামামাটিতে আঘাত করল। অমনি শত শত কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ভেরীধ্বনি।

হস্তি থেকে অবতরণ করে শাসনকর্তারা দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। কর্ণাভরণ, কণ্ঠাভরণ আর স্বর্ণমুকুটে তাঁদের যথার্থ রাজা বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁরা সকলেই পরিধান করেছিলেন হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত রেশমবস্ত্র।

সভাসদেরা এই রাজবেশধারীদের আপ্যায়ন করে বসালেন। দরবারকক্ষ নিমন্ত্রিত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। কক্ষের শেষপ্রান্তে অভিনয় মঞ্চের আকারে একটি বেদী। বেদীটির চতুর্দিক ঘিরে অনেকখানি মুক্তস্থান। বেদীতে আরোহণের জন্য পাঁচটি সুপ্রশস্থ সোপান। এই মঞ্চের সম্মুখে একটি নীল বর্ণের যবনিকা পড়ে আছে। ঐ নীল যবনিকার উপর স্বর্ণরেখায় উৎকীর্ণ বিশাল এক সর্পাকৃতি দানবমূর্তি।

সহসা যবনিকার সামনে এসে দাঁড়াল ঘোষক। মহা রাজাধিরাজ থিরি-থু-ধম্মাকে বহু বিশেষণে ভূষিত করে তাঁর আগমন ঘোষণা করল।

ঘোষকের যবনিকার সামনে থেকে অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দাটি ধীরে ধীরে সরে গেল। সুসজ্জিত মঞ্চে দেখা গেল মহারাজ থিরি-থু ধম্মা বসে রয়েছেন সিংহাসনের ওপর। চারিটি রৌপ্যনির্মিত হস্তি ধরে রেখেছে স্বর্ণ ও বহু রত্নখচিত সিংহাসনটি। মহারাজের পশ্চাতে দু'টি সারিতে চব্বিশজন তরুণী। শ্বেত পোশাকে মরালীর মত মনে হচ্ছিল। পোশাকগুলিয় বিভিন্ন প্রান্ত স্বর্ণসূত্রে সুচিত্রিত। মাথায় ধারণ করে আছে সুউচ্চ শ্বেতবর্ণের মুকুট। হাতে আধখোলা পাখা।

মহারাজ পরিধান করেছেন সবুজ বর্ণের পোশাক। এই পরিচ্ছদটির সর্বত্র

অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রের কাজ। সুদক্ষ কারিগর এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বহুদিন ধরে এই পোশাকটি তৈরি করেছে।

মহারাজের কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে মূল্যবান মুক্তার মালা। অঙ্গুলিতে মহারানী প্রদত্ত বিবাহতিথির অঙ্গুরীয়। কর্ণে মহামূল্য চুনির দুটি আভরণ। পিতামহ রাজাগ্রী ব্রহ্মদেশের নৃপতিকে পরাজিত করে তাঁর কর্ণ থেকে খুলে এনেছিলেন।

মহারাজের সামনে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা রৌপ্যপাত্র ও স্বর্ণভৃঙ্গার নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁরা মন্ত্রোচ্চারণেব সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সবশেষে প্রদীপ হস্তে শুরু হল আরতি।

এই মাঙ্গলিক কর্ম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা বিদায় নিলেন।

এরপর সভাস্থল থেকে একে একে উঠে এলেন দ্বাদশজন শাসনকর্তা বা কল্পিত নৃপতি। তাঁরা নিজ নিজ মস্তক থেকে স্বর্ণমুকুট খুলে মহারাজের চরণে অর্পন করলেন। এইভাবে থিরি-থু-ধম্মা আপাততঃ পূর্ণ করলেন পৃথিবীপতি হবাব বাসনা। নৃপতিবা এখন সারি দিয়ে বসলেন সোপানশ্রেণীর ওপব।

অন্তরালে থেকে ঘোষক ঘোষণা কবলেন, যেহেতু মহাবাজ তথাগতেব চরণাশ্রিত সেহেতু বৌদ্ধবিহারের প্রধান শ্রমণই তাঁর মস্তকে মুকুট পরাবেন।

এরপর মহারাজের পশ্চাতে স্থিরচিত্রের মত দণ্ডায়মান চব্বিশটি তরুণী সহসা প্রাণ পেয়ে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা করধৃত ব্যজন আন্দোলন করে লীলাভবে নৃত্য করতে লাগল। মহারাজকে বেষ্টন কবে সে নৃত্য এমনি উপভোগ্য হল যে দর্শকেরা নৃত্যশেষে উচ্ছ্বসিত হলেন প্রশংসায়।

দরবাবকক্ষ ত্যাগ করে মহারাজ বহির্গত হলেন নগর পরিক্রমায়।

সামনে অশ্বারোহী সৈন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে চলল।

প্রথম অংশে তরবারি ঊর্ধ্বে তুলে চলল জাপানী সৈন্যেরা। দ্বিতীয় অংশে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠান সৈনিকেরা। তারা ধনুতে জ্যা আকর্ষণ করে চলেছিল। তৃতীয় বা শেষ সারিতে ছিল বল্লমধারী ব্রহ্মদেশীয় আর আরাকানী সৈন্য।

অশ্বারোহীদের পশ্চাতে ছিল কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ শত হস্তি। সে এক দৃষ্টিনন্দন সমারোহ! মহারাজ যে হস্তিতে আরোহণ করেছিলের সেটি ছিল অতিকায়। তার দু'টি দর্শনীয় শুভ্র দন্ত সোনার পাতে মোড়া ছিল। সোনার শেকলে বাঁধা হয়েছিল মহারাজ ও দ্বাদশ নৃপতির হস্তি। মহারাজের হস্তির

পৃষ্ঠাবরণটি সোনা ও বিভিন্ন রত্নের কাজে অতি মনোহর দেখাচ্ছিল। হস্তিটির ললাট-ভূষণ ছিল হীরকখচিত। সূর্যালোক পড়ামাত্রই বহুবর্ণের ঝলক দর্শকদের চোখে এসে লাগছিল। ক্রমাগত রাজার জয়ধ্বনিতে কম্পিত হচ্ছিল আকাশ-বাতাস।

টিলার ওপরে একটি ছোট্ট কুটরী। গুলনারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। সাধারণ বন্দীর মত তাকে রাখা হয়নি। সে ইচ্ছে করলে ঐ টিলার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে পারে। টিলার নিচে থাকে একজন রক্ষী। সে গুলনারের প্রাত্যহিক রসদ যোগায়?

গুলনার কুটীরের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল শোভাযাত্রা। তার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল আর একটি শোভাযাত্রার ছবি।

তখন শাজাহান সবেমাত্র দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেছেন। দিল্লীতে রাজ্যাভিষেকের উৎসব শুরু হল। অমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিকর্তারা নিজ নিজ প্রদেশে উৎসবের আয়োজন করলেন।

ঢাকার উৎসবে কেবল বাদশাহী সৈন্য সমাবেশই হয়েছিল আড়াই লক্ষ।

মনে আছে গুলনার তার স্বামী ইউসুফকে সাজিয়ে দিয়েছিল। নিজে গিয়েছিল তাঞ্জামে চড়ে উৎসব দেখতে। সুবেদার কাসিম আলির প্রাসাদের ভেতর জেনানামহলে তাদের বসার জায়গা হয়েছিল। কাসিম আলি সাহেবের বিবি আখতারুন্নিসা বেগম তাকে তাঞ্জাম থেকে নামিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে জাফ্রির কাজওয়ালা জানালার একেবারে সামনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় যখন সে আব্বাজানের কাছে ছিল তখন মাঝে মাঝে স্বামী কাসিম আলির সঙ্গে বেগম তাদের লক্ষ্ণৌর বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। কত উপহার কিনে দিতেন আর আদর করতেন তাকে।

স্বামী ইউসুফের সঙ্গে সে যখন ঢাকার সরকারী আবাসে উঠে এল তখন চার হাজারী মনসবদারের স্ত্রী বলে সুবাদারের বিবি তাকে অবহেলা করেন নি, বরং সমান সমাদরের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। আলি সাহেবের মুখোমুখি হলেই তিনি তাকে বেটি বেটি বলে কত আদর করতেন। দিল্লীর বাদশার কাছে গোপন কোন বার্তা পাঠাবার দরকার হলে আলি সাহেব দশ হাজারী মনসবদারদের না পাঠিয়ে তার স্বামী ইউসুফকেই পাঠাতেন।

আলি সাহেবের সঙ্গে যখন ঢাকার উৎসবে তার দেখা হয় তখন সুবাদার সাহেব তাকে কাছে ডেকে বললেন, শোন বেটি, একটা দুঃসংবাদ আছে।

গুলনার চমকে উঠে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, দুঃসংবাদ!

হ্যা রে বেটি দুঃসংবাদ, তবে সেটা আর কারও নয় আমারই।

বিচলিত গলায় গুলনার বলল, কি দুঃসংবাদ আব্বাজান?

কাসিম আলিকে পিতৃবন্ধু বলে গুলনার আব্বাজান বলেই ডাকত।

কাসিম আলি বললেন, এই অভিষেকের সময় আমি সম্রাটের কাছে পদোন্নতির জন্য কতকগুলো নাম সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলাম, সবারই পদোন্নতি তিনি মঞ্জুর করেছেন কেবল একজনের ছাড়া। সেটাই আমার কাছে আজ সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ।

গুলনার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আলি সাহেবের মুখের দিকে।

অনুমান করতে পার কে সেই ভাগ্যহীন?

আপনি আপনার বেটার কথা বলছেন তো আব্বাজান? কিন্তু আপনার কাছে থাকাটাকেই যে সৌভাগ্য বলে মনে করে তার কাছে পদোন্নতির প্রশ্নটা আদপেই বড় নয়।

কাসিম আলি তখন অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন. আর বেশী কোন কথা না বলে তিনি প্রাসাদ থেকে মঞ্চের দিকে হেঁটে গেলেন।

পূর্বব্যবস্থা মত মনসবদারেরা মঞ্চের সামনে দিয়ে সুবাদার কাসিম আলিকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যাবে তাদের বাহিনী নিয়ে। বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ।

গোলন্দাজবাহিনীর কামান টেনে নিয়ে চলে গেল হাতির দল। তারপর এল অশ্বারোহী বাহিনী। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনীর অধ্যক্ষ খুরশীদ আলি এলেন কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। তাঁর কোষে তরবারি। মঞ্চের সামনে এসে তিনি তরবারি কোষমুক্ত করে অভিবাদন জানিয়ে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেলেন।

এরপর সামনে এলেন দশ হাজারী মনসবদারেরা। তাঁরাও অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

পর পর পদমর্যাদা অনুযায়ী সুবাদার সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যেতে লাগল সৈন্যসহ মনসবদারেরা।

গুলনার জাফ্রিকাটা জানালার ভেতর দিয়ে দেখল সাদা ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার উঁচিয়ে ইউসুফ সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে এগিয়ে চলেছে। কি দৃপ্ত ভঙ্গী। লক্ষ্যে একাগ্র, অব্যর্থ এক ধনুর্বিদের মূর্তি যেন।

গুলনারের চোখের পলক পড়ে না। এমন শৌর্য-বীর্যে ভালবাসায় গঠিত যে মানুষ তাকে পেয়ে আর কিছু পাবার থাকে না নারীর। নাইবা হল

ইউসুফের পদোন্নতি। সে তো ইউসুফকে তার পদমর্যাদা দেখে ভালবাসেনি।

এক সময় সমাপ্ত হল সৈন্যদেব অভিবাদন অনুষ্ঠান। এখন বাদশার দেওয়া পদোন্নতির তালিকা পেশ কবার পালা। সুবাদার কাসিম আমি প্রথমে বাদশা শাজাহানের প্রতি সেনাপতিদের আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর একে একে মনসবদারদেব আহ্বান কবে তাদেব হাতে বাদশার সীলমোহরাঙ্কিত পদোন্নতির ফবমান দিলেন।

আশ্চর্য! প্রথমেই তিনি আহ্বান কবলেন ইউসুফ আলিকে। বললেন, তোমার যোগ্যতা আর কর্তব্যনিষ্ঠায় সম্রাট এমনি প্রীত হয়েছেন যে এই প্রথমবার বাঙ্গালা প্রদেশের দুজনকে বিশ হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত করেছেন। তার মধ্যে তুমি অন্যতম। অন্যজন বিচক্ষণ প্রবীন দশ হাজারী মনসবদার আব্দুল হামিদ।

উল্লাসধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হল।

এরপর একে একে মনসবদাররা এসে তাদেব পদোন্নতির পত্রগুলি গ্রহণ করল।

এক সময় সভা শেষ হল। ভারত সম্রাট শাজাহানের জয়ধ্বনি দিতে দিতে জনতা ঘরে ফিবল। প্রাসাদে ফিরেই কাসিম আলি গুলনারকে ডেকে পাঠালেন। গুলনারর সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি হেসে বললেন, দুঃসংবাদকে যারা সহজভাবে নিতে পারে সুসংবাদ আপনিই তাদের কাছে পৌছে যায়।

গুলনার মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি আর চোখে আনন্দের অশ্রু নিয়ে পিতার বয়সী কাসিম আলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নিজের আস্তানায় পৌছে গুলনার দেখল তখনও ইউসুফ ফিরে আসেনি। সে ঘরগুলিকে সাধ্যমত সুন্দর করে সাজাল। ইউসুফ ফিরে এসে গুলনার, গুলনার বলে ডাক দিতেই গুলনার সামনে এসে তসলিম করে বলল, বাঁদী হাজির জনাব।

ইউসুফ তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কখন এলে? নিশ্চয়ই শুনেছ খবরটা?

গুলনার কোন কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে জানাল খবরটা তার অজানা নয়।

তুমি খুশি হওনি?

গুলনার এবার মুখ খুলল, জীবনে তোমাকে পেয়েই আমি খুশি, এর চেয়ে বড় আনন্দের খবর আমার কাছে আর কিছু নেই। এটা আমার উপরি

পাওনা মাত্র।

এরপর কাসিম আলি সাহেবের রসিকতার কথা গুলনার সবিস্তারে ইউসুফকে বলল।

সে রাতটি ছিল জ্যোৎস্নায় ভরা। সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুধু চাঁদের আলোয় দুজনে সারা রাত জেগে কাটিয়েছিল।

আকাশে যখন ভোরের আলো ফুটল তখন ইউসুফ বলে উঠল, আজ আমরা কত সুখী গুলনার।

হঠাৎ গুলনারের মুখ দিয়ে সাদীর একটি বয়ৎ বেরিয়ে এল :

'খুশ অস্ত উমর্ দরীঘা কি জারিদানী নীস্ত্।
বস্ ইতিমাদ্ বরীন্ পঞ্জ-রূজ-ই-ফানী নীস্ত্।'

জীবন সুখের কিন্তু দুঃখ এই যে তা চিরস্থায়ী নয়। এই ক্ষণস্থায়ী পাঁচটা দিনের ওপর বেশি নির্ভর করা উচিত নয়।

ইউসুফ গুলনারের একটা হাত ধরে বলল, আজ এই বয়ৎ কেন উচ্চারণ করলে গুলনার?

মালেক, হঠাৎ মনে এল, তাই বলে ফেললাম।

এই মুহূর্তে আরাকানের একটি পাহাড়ে বন্দী জীবন যাপন করতে গিয়ে গুলনারের মনে হল, খোদা সেদিন তার মুখ দিয়ে কত সত্য একটি কথা উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছিলেন।

এখন আরাকানরাজ থিরি-থু-ধম্মার সুসজ্জিত হস্তি টিলার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। পুরো শোভাযাত্রাটিকে এখন সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ অব্দি একটি বিশাল অজগরের মত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ টিলার নিচে একটা হৈচৈ শোনা গেল। গুলনার পেছনে চোখ ফেরাতেই দেখল একটি লোক পাহাড়ের খাঁজ ধরে টিলার ওপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে। সে উঠে এলও।

গুলনার অবাক হয়ে দেখল লোকটি পর্তুগীজ। পোশাকে সম্ভ্রান্ত না হলেও আকৃতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত রক্তের একটা ছাপ আছে।

লোকটি প্রথম পর্তুগীজ ভাষায় ওকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু গুলনার কিছুই বুঝল না।

লোকটি বুঝল তার ভাষা সম্বন্ধে গুলনারের কোন ধারণা নেই।

তখন লোকটি ভাঙা হিন্দুস্থানীতে ওকে বলল, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি হিন্দুস্থানী। আমি তোমার ভাষা কিছু কিছু জানি।

গুলনার বলল, তোমার অনুমান ঠিক, কিন্তু…।

লোকটি দারুণ উদ্বিগ্ন বলে মনে হল। সে বলল, এই টিলার ওপর থেকে রাজকীয় শোভাযাত্রাটি সব থেকে ভাল দেখা যায়। তাই আমি ভোর থেকে টিলার ওপর উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় বসেছিলাম। এই দেখ, আমি শোভাযাত্রার ছবি আঁকছিলাম। কিন্তু নিচের রক্ষীগুলো আমাকে দেখতে পেয়ে হৈ-হল্লা লাগিয়েছে। এখন যে পথে উঠে এসেছি সে পথে নামবার উপায় নেই। সামনে শোভাযাত্রা। ওদিক দিয়ে নামতে গেলেও রাজার লোকেরা ধরে ফেলবে। তুমি কি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পার? অন্ধকার আমি রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে নেমে যেতে পারব।

লোকটি তাহলে শিল্পী। গুলনার তার চোখে-মুখে যথার্থই একটি সম্ভ্রান্ত মানুষের ছাপ দেখেছে।

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নিজের শয্যা ও পোশাক পরিচ্ছদের আড়ালে লোকটির আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার সে যথাস্থানে এসে শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে রইল।

পেছনের হাঁকডাক নিকটবর্তী হচ্ছিল। সে অনুমান করল টিলার ঘোরানো পথে ওপরে উঠে আসছে রক্ষীরা।

এক সময় তারা গুলনারের কাছে এসে বলল, কোন একটি লোককে এই টিলার ওপর উঠে আসতে দেখেছ কি?

লোক! ও ঠিক বটে, আমি যখন শোভাযাত্রা দেখছিলাম তখন মনে হল কেউ যেন দক্ষিণ দিকের টিলা বেয়ে নেমে গেল। আমি ভেবেছিলাম কোন রক্ষীই বুঝি, তাই ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। আর সে সময় মহারাজের হস্তিটি সামনে এসে গিয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে আর কোনদিকে তাকাতে পারিনি।

রক্ষী তিনজন টিলার দক্ষিণ প্রান্তে ঝুঁকে দেখল। চীৎকার করে আরাকানী ভাষায় কাউকে যেন কিছু বলতে লাগল। গুলনারের মনে হল ওরা তিনজনেই নিজেদের ভাষায় লোকটাকে গাল পাড়ছে।

ওরা আবার নিচে নেমে গেল। গুলনার ঘরের ভেতর এসে বলল, লোকগুলি চলে গেছে, এখন নিশ্চিন্তে ঘরের ভেতর বসতে পার। কেবল একটি মহিলা রক্ষী খাবার নিয়ে আসবে মধ্যাহ্নে, তখন সাবধান হতে হবে। ওর চোখে পড়লে দুজনেরই বিপদ।

লোকটি পোশাক-পরিচ্ছদের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, শোভাযাত্রা কি চলে গেছে?

না, এখনও চলেছে, কিন্তু বাইরে এলে আবার বিপদে পড়তে পার।

আচ্ছা, ঐ তো দেওয়ালের ওপরের দিকে একটা ছোট ঘুলঘুলি, বাঁশের একটা সিঁড়িও বাইরে পড়ে থাকতে দেখছি। তুমি যদি সিঁড়িটাকে একটু ভেতরে এনে দাও।

গুলনার বাইরে থেকে বাঁশের সিঁড়িটাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এল। লোকটি সেই সিঁড়িকে ঘুলঘুলির পাশে ঠেসান দিয়ে রেখে নিজে উঠল। এখন ঘুলঘুলি দিয়ে পুরো শোভাযাত্রাটি সে দেখতে লাগল।

গুলনার বাইরে বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রার ওপর চোখ রাখল, কিন্তু ভবতে লাগল এই বিশেষ চরিত্রের মানুষটির কথা। লোকটি মনেপ্রাণে শিল্পী।

কতক্ষণ পরে শোভাযাত্রাটি চলে গেল বৌদ্ধ বিহারের দিকে। সেখানে শ্রমণ মহারাজের মাথায় মুকুট পরাবেন।

গুলনার ফিরে এল তার কক্ষে। লোকটি এখন নির্দ্বিধায় শয্যার ওপর বসে ছবি আঁকছে। সে এমনই মগ্ন ছিল যে গুলনারের উপস্থিতি টেরই পেল না।

কতক্ষণ পরে ছবি শেষ করে উঠে দাঁড়াল। গুলনারকে সামনে দেখে বলল, এই যে, দেখ তো শোভাযাত্রার ছবিখানা মোটামুটি আঁকতে পেরেছি কিনা?

গুলনার দেখল, হাতি, রাজা, ঘোড়সওয়ার, তোরণ, দূরে কাছে পাহাড়ী পরিবেশ, প্রাসাদের অবস্থান, সব কিছুই ধরা হয়েছে ছবিখানার ভেতর। এমন জীবন্ত হয়ে ছবিটি ফুটে উঠেছে যে গুলনারের মনে হল সে পুরো শোভা-যাত্রাকেই ঘরে বসে দেখছে।

অপূর্ব তোমার ছবি। তুমি বুঝি এঁকেই বেড়াও?

হ্যাঁ, ছবি আমি আঁকি, তবে আমি ভ্রাম্যমান। সারা দুনিয়া ঘুরে বড়ানোই আমার কাজ। যেখানে যাই সেখানকার কথাও লিখে রাখি।

কবে এসেছ এ দেশে?

এখানে এসেছি দু'মাস কিন্তু পাঁচ বছরেরও বেশী রয়েছি হিন্দুস্থানে। প্রথমে লিসবন থেকে গোয়াতে এসে নামি। সেখানে প্রচুর ছবি এঁকেছি। তারপর হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীতে যাই। সেখানে পুরো দু'বছর থেকেছি। পরে ফতেপুরসিক্রি, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, জয়শলমীর, কোন জায়গায়ই আমি যেতে বাদ রাখিনি। দেখবে, কত ছবি এঁকেছি?

গুলনারের প্রত্যুত্তর না শুনেই সে ঝোলার ভেতর থেকে গোছা গোছা ছবি বের করে গুলনারকে দেখাতে লাগল।

এই দেখ, গোয়াতে পাল্কী চেপে চলেছে পর্তুগীজ মহিলা। পাশে পাশে ছুটে চলেছে দুজন ক্রীতদাসী। পেছনে আর সামনে তলোয়ার হাতে দুজন দেহরক্ষী। পাল্কীটি চারদিকে খোলা। দোলনার মত দুলছে কাঁধের বহন দণ্ড থেকে।

আর এটিতে দেখ ঘোড়ায় চড়ে চলেছে এক ধনী পর্তুগীজ। পাশে ছাতা ধরে ছুটে চলেছে একটি লোক। অন্য পাশে চামর হাতে হাওয়া করতে করতে চলেছে আর একজন। সামনে পেছনে সুসজ্জিত সব দেহরক্ষী।

এবার দেখ হাতিতে চড়ে চলেছে কোচিনের রাজা। হাওদা নেই। রাজার ঊর্ধ্ব অঙ্গেও কোন আবরণ নেই। একটি তীর ডানহাতে ধরে কাঁধে তুলে রেখেছেন। ধনুকখানা পাশে পাশে বয়ে নিয়ে চলেছে ক্রীতদাস। দেশীয় যোদ্ধারা চলেছে সঙ্গে। এক দলের হাতে বন্দুক, অন্য দলের হাতে ঢাল তলোয়ার। সামনে পেছনে দু'দল চলেছে বর্শা উঁচিয়ে।

এরপর জয়শলমীরের পথে উটের সারি, ফতেপুর সিক্রিতে আজান, যোধপুরে গাগরী মাথায় রাজপুত রমণীরা, উদয়পুরে বিশাল গোঁফওয়ালা দরোয়ান, জয়পুরে হাঁটুর ওপরে কাপড় আর মাথায় বিরাট পাগড়ীওয়ালা গ্রাম্য লোক, এই ধরনের অজস্র সব ছবি দেখিয়ে গেল পর্তুগীজ শিল্পীটি। শুধু ছবি দেখানোই নয়, কোথায় কিভাবে ছবির মানুষগুলোকে সে দেখেছিল, তাদের সঙ্গে তার কি ধরনের কথা হয়েছিল, তাদের জীবনের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের কাহিনী সব কিছুই বলে গেল চিত্র কয়টি।

এক সময় কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে গিয়েছে যখন, মানুষটি তখন হঠাৎ গুলনার দেখতে পেল ক্রীতদাসীটি তার খাবার নিয়ে নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে।

মুহূর্তে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে এগিয়ে গেল গুলনার। ক্রীতদাসীরা হাত থেকে খাবারের পাত্রটা ধরে নিয়ে বলল, আজ দেখছি অনেক কিছুই এনেছ!

দাসীটি বলল, আজ মহারাজার অভিষেকের জন্য প্রাসাদ থেকেই সব খাবার এসেছে।

তারপর সে মাছ-মাংসের ফিরিস্তি দিয়ে গেল। শেষে বলল, তোমার কপাল ভাল তুমি দুটো বিশেষ রান্নার ভাগ পেয়েছ।

গুলনার বলল, সে রান্নাগুলো কি?

মেয়েটি একটি একটি করে দু'টি রান্না দেখিয়ে দিয়ে বলল, এটি মসলাদার ইঁদুরের ভাজা আর এটি সাপের ডালনা।

তা বেশ। তুমি এখন যাও। রাতে আর আসতে হবে না। এত রান্না খেয়ে রাতে আর খেতে ইচ্ছে করবে না। একেবারে কাল দুপুরে খাবার নিয়ে এসো।

দাসীটি বেঁচে গেল। নিচ থেকে টিলার মাথায় দিনে দু'বার করে উঠে আসা সত্যি ঝকমারি ব্যাপার। বাংলাদেশের মাঠঘাট নদীনালার মেয়ে, ভাগ্যদোষ ফিরিঙ্গি ডাকাতদের হাতে পড়ে কি নাজেহালই না হতে হচ্ছে। সাঁতার কাটায় ওস্তাদ হলে কি হয়, পাহাড়ে চড়তে গেলেই যে কোমরে খিল ধরে যায়।

গুলনারের ওপর বড় খুশি হয়ে মেয়েটি নেমে গেল। গুলনার তাকে আজকের মত বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বেঁচে গেল গুলনারও। ইঁদুর আর সাপের তৈরি খাবার কাক চিলেদের ভোগের জন্য ফেলে দিয়ে এসে বাকী পাত্রটি নিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

থালাটা মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে বলল, সারাদিন ছবি এঁকে কাটল, এখন নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে।

এ তো তোমার খাবার, এতে আমি ভাগ বসাতে গেলে তোমারই কম পড়বে।

ভাবনা নেই, অনেক দিয়েছে। রাজার অভিষেকের ভোজ।

দুজনে খাবারগুলো ভাগ করে খেল। খাওয়া শেষ হলে শুরু করল গল্প। কি বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা মানুষটির। কথা বলতে বলতে চোখে মুখে উজ্জ্বল আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

তুমি আরাকানের রাজধানীতে এলে কিভাবে?

রাজার অভিষেকের জন্য সুমাত্রা থেকে এক জাহাজ সুগন্ধী মসলা আসছিল। আমি সুমাত্রায় ছিলাম। জাহাজের মালিককে অনেক বলে কয়ে একটু ঠাঁই করে নিয়েছিলাম।

ঐ জাহাজেই কি ফিরবে?

না, ওদিকে সব দেখা হয়ে গেছে। এখন দেখি অন্য কোন জাহাজে অন্য কোথাও যাওয়া যায় কিনা।

তোমার ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না?

ছুনিয়ার সব কিছু চোখ মেলে দেখতে আর তার রূপের কিছু কিছু আঁকায় আর লেখায় ধরে রাখতে পারলেই আমি খুশি।

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাইনি।

তুমি আমার ঘরে ফেরার কথা বলছ? লিসবনে আমাদের পরিবারের বেশ নাম-ডাক আছে। সেখানে থাকলে সুখে নিশ্চিন্তে আমার জীবনটা কেটে যেত। কিন্তু বাইরের টান যার বেশী ঘরের বাঁধনে সে নিজেকে বাঁধবে কি করে?

মানুষটির সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত আলাপ করেই বড় খুশি হল গুলনার। গভীর দুঃখের ভেতরও কখনো কখনো হঠাৎ এমনি টুকরো টুকরো শান্তির ছোঁয়া পাওয়া যায়।

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের দিক থেকে একটা কালো মেঘ ডানা মেলে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। দিনান্তের সূর্যটা অস্তের আগেই কালো পাখিটার মুখে একটা রক্তবর্ণ ফলের মত ঢুকে গেল।

লোকটি সেই দিকে অবাকবিস্ময়ে চেয়েছিলে। দিন শেষের সমস্ত সৌন্দর্য সে নিঃশেষে পান করে নিচ্ছিল।

গুলনারই তাকে সাবধান করে দিলে, ঐ মেঘ এখুনি বৃষ্টি ঝরাবে। সমস্ত টিলা পিচ্ছিল হয়ে যাবে। তুমি নামতে গেলেই বিপদে পড়বে। এখুনি নেমে যাও। অস্পষ্ট আলোয় কেউ তোমায় চিনতে পারবে না।

লোকটি মুহূর্তে ঝোলাটা বেঁধে নিল পিঠে। বলল, তোমার উপকারের কথা ভুলব না। ইচ্ছে ছিল তোমার একখনা ছবি এঁকে তোমাকে উপহার দিয়ে যাব কিন্তু সে সময় আর হাতে পেলাম না।

ক্ষিপ্র একটা কাঠবেড়ালীর মত লোকটি পথের চিহ্নহীন টিলার খাঁজখোঁজ ধরে নেমে যেতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠায় গুলনারের যেন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে ক্রীতদাসীটি গুলনারের খাবার নিয়ে এল টিলার ওপর। আজ এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে খাবার ধরে নিল না গুলনার।

মেয়েটি রোজগার মত গুলনারের ঘরে খাবার দিয়ে পাশে বসল। খাওয়া শেষ হলে সে দু'দিনের পাত্রগুলো নিয়ে চলে যাবে একসঙ্গে।

গুলনার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, কি খবর আজ সুখদা? রাজবাড়িতে আজ আর কোন অনুষ্ঠান নেই?

মেয়েটি কথা বলতে পারে ভাল। সে বলল, অনুষ্ঠানের কথা বলছ, মস্তবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। তাই নিয়ে চারদিকে হুলুস্থূল।

কি আবার কাণ্ড সুখদা ?

হায় কপাল, তোমার এই টিলাতেই কাণ্ডটা ঘটে গেল আর তুমি জানলে না।

আমার এই টিলাতে !

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। একটা ফিরিঙ্গি কি করে যেন উঠেছিল এই ওপরে। রক্ষীরা দেখতে পেয়েছিল কিন্তু ধরতে এসে তাকে আর দেখতে পায়নি। সবাই মনে ভাবল, লোকটা আঁচড়ে কামড়ে নেমে পালিয়েছে। কিন্তু পালায়নি গো !

সেকি ! তাহলে ছিল কোথায় ?

এই পাহাড়ের খাঁজে কোথাও সারাদিন মটকা মেরে পড়েছিল।

তারপর !

প্রাসাদের একজন রক্ষী সন্ধ্যেবেলা এই পথ ধরে যেতে যেতে দেখল, একটা লোক টিলার ওপর থেকে পথে লাফিয়ে পড়েই দৌড়। ব্যাটা যাবি কোথায় ? লাফাতে গিয়ে পিঠের ঝোলাটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে, তাই কুড়োতে ফিরে এসেই পাহারদারের হাতে ধরা পড়ে গেল।

তারপর !

আজ দরবারে তার বিচার হল। লোকটা কোথাকার যেন গুপ্তচর।

না না, গুপ্তচর কেন হবে ?

তুমি কিছু জান না। তার থলে থেকে কত কাগজ বেরিয়েছে ! এই 'ব্রাউক-উ' জায়গাটার কোথায় কি আছে ও ছবি এঁকে এঁকে সে সব তুলে নিয়েছে। হিন্দুস্থানের রাজা, নয়তো ব্রহ্মদেশের রাজা, এদের যে কোন একজনকে রাজধানীর খবর আর ছবিগুলো দিয়ে দেবে, ব্যস, আর দেখতে হবে না। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে আমরা গেছি আর কি।

উদ্বেগে আকুলতায় গলা বন্ধ হয়ে এল গুলনারের। তার সারা মন চীৎকার করে বলতে চাইল, এ সত্য নয়, কখনই সত্য নয়। আমি ফিরিঙ্গিদের ঘৃণা করি কিন্তু এ মানুষটা ফিরিঙ্গি হলেও অন্য জাতের। এ পুরোপুরি শিল্পী, এক জাত-চিত্রকর।

গুলনারকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি আবার মুখ খুলল, ভাগ্যিস ধরা পড়ল, আর বিচারে নির্ব্বাসন হয়ে গেল।

নির্বাসন ! কোথায় ?

ওর মুণ্ডু উড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু মহারাজার মুকুট উৎসব বলে ওর

শাস্তিটা কম করে প্রাণটা বাঁচান হল। তবে যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে আর বাছাধনকে ফিরতে হবে না।

কেন, কি রকম জায়গা সেটা?

দেখিনি, তবে শুনেছি। চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা একটা খাদ জায়গা। জঙ্গলে বাঘগুলো মানুষ খাবে বলে নাকি হাঁ করে থাকে। ওখানে যত সব ডাকাত আর চোর-ছ্যাঁচোড়কে পাঠান হয়। বন কেটে চাষবাস করে দিন কাটায়।

খাবারগুলো গলা দিয়ে নামল না গুলনারের।

কি হল, তুমি খেলে না?

কাল থেকে শরীরটা বড্ড গুলিয়ে উঠছে, খেতে পারছি না, তুমি বাসনগুলো নিয়ে যাও।

সুখদা বাসনকোসন নিয়ে চলে গেল।

সাতদিনও পেরুল না, রাজ দরবারে ডাক পড়ল ক্রীত-দাসদাসীদের। একদিন আগে গুলনারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ফাদার ম্যানরিক। গুলনার তাকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিল, ফাদার, রাজার ক্রীতদাস-দাসীদের ভেতর বন্দী স্বামী-স্ত্রী রয়েছে। আপনি যে কোন উপায়ে যদি ওদের এক সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে ওরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

ফাদার বলেছিলেন, সম্পত্তি এখন মহারাজের। কাজ হবে তাঁরইচ্ছানুযায়ী। তুমিও তাঁর কেনা, ভুলে যেওনা গুলনার।

পরের দিন উনপঞ্চাশজন বন্দীর সঙ্গে গুলনারও গিয়ে দাঁড়াল রাজ দরবারে।

মহারাজ থিরি-থু-ধম্মাকে দেখে মনে হল, তিনি বেশ খোশ মেজাজেই রয়েছেন।

রামুর শাসনকর্তাকে অভিষেক উপলক্ষে রাজধানীতে আসতে হয়েছিল। তিনি অনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীত-দাসদের উৎসর্গ করলেন রাজার উদ্দেশ্যে।

মহারাজ প্রীত হয়ে ঘোষণা করলেন, রামুর শাসনকর্তা এখন থেকে দিয়াঙ্গা শাসনের ভার নেবেন। আর দিয়াঙ্গার বিচক্ষণ শাসনকর্তা বহুদিন দূরে রয়েছেন, তিনি উব্রিতাংএর শাসন ভার নিয়ে চলে আসবেন রাজধানীর কাছে। রামুতে যাবেন উব্রিতাংএর শাসনকর্তা। দূরের অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তাঁর প্রয়োজন।

সভাসদেরা মহারাজের নিয়োগ বদলীকে সাধুবাদের সঙ্গে সমর্থন জানাল।

এরপর ক্রীতদাস-দাসীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, অভিষেক উৎসবের জন্য তোমাদের কিছু সুবিধা দিতে চাই আমি। আমার দু'টি প্রস্তাব আছে, যে কোন একটি তোমরা মেনে নিতে পার। হয় তোমরা দাস হয়ে সভ্য-সমাজে থাকবে, চাষ-আবাদ কিংবা মালিকের কাজকর্ম করবে, নয়তো পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা আমার একটি নির্বাসনের জায়গা আছে সেখানে গিয়ে স্বাধীন-ভাবে বসবাস করবে। নিজের খাদ্য নিজেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে, হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। কিন্তু কোনদিন আর সভ্যজগতের মুখ দেখতে পাবে না।

বন্দীদের প্রায় সকলেই হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ নির্বাসনের জগতে যেতে চাইল না। কেবল তিনজন স্বেচ্ছায় ঐ নির্বাসনের জগতে চলে যেতে চাইল। তাঁদের একজন গুলনার, অন্য দুজন সেই প্রেমিকযুগল।

মহারাজ গুলনারের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, শুনেছি তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, তুমি কি পারবে সেই সভ্যতা-বর্জিত হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ জঙ্গলে বাস করতে?

গুলনারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে মহারাজকে তসলিম জানিয়ে বলল, গুস্তাকি মাফ করবেন মহারাজ, আপনি যে জগতে পাঠাতে চাইছেন সে স্থানটি কি আমার দেখা স্থানগুলির চেয়েও সভ্যতাবর্জিত? আর হিংস্র জন্তুর কথা বলছেন, আমাদের চারদিকের মানুষ নামক প্রাণীদের চেয়েও কি তারা বেশী হিংস্র?

মহারাজ বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজের কাছেই রয়েছে। যে জায়গা নির্বাচন করেছ সেখানে গিয়ে তা পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে।

ক্রীতদাস-দাসীদের দরবার কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে দর্শক আসন থেকে ফাদার ম্যানরিক উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আমার একটি প্রার্থনা আছে রাজাধিরাজ।

মহারাজ থিরি-থু-ধম্ম হেসে বললেন, আপনার চার্চ তৈরির কাজ সরকার থেকে শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

সেজন্য 'ব্রাউক-উ'র পর্তুগীজ অধিবাসীরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি মহারাজের কাছে এখন যে প্রার্থনা জানাচ্ছি সেটি একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত।

বলুন কি প্রার্থনা।

আপনার ক্রীতদাস-দাসীদের ভেতর থেকে যদি দুজনকে আমার চার্চের কাজের জন্য নিয়োগ করেন তাহলে বড় অনুগৃহীত হই।

ও, এইমাত্র। নিন আপনার খুশি মত দুজনকে বেছে। অবশ্য যে তিনজন স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছে তাদের বাদ দিয়ে।

ম্যানরিক গুলনারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন স্বামী-স্ত্রীকে ক্রীতদাস-দাসীরূপে নির্বাচন করে।

দু'টি বন্দী গুলনারের দিকে চেয়ে রইল। তাদের চোখ ভরে নেমে এল কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

॥ চার ॥

লক্ষাধিক ফৌজ চলেছে কুচকাওয়াজ করে ঢাকা থেকে হুগলী শহরের অভিমুখে। ঢাকার সুবাদার কাসিম আলি, গুলনার বেগম আর হতভাগ্য গ্রামবাসীদের অপহরণের খবর জানিয়ে বাদশা শাজাহানের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন। সম্প্রতি আর এক খবর তিনি জানিয়েছিলেন, গুপ্তচরেরা সন্ধান এনেছে দিয়াঙ্গার দস্যু ডিয়াগো-ডা-সা এই অপহরণের নায়ক। হুগলীতেও তার একটা ডেরা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা হুগলী অবরোধের ফরমান জারি করলেন। তিনি জানতেন, দিয়াঙ্গা অভিযান এই মুহূর্তে খুব যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ দিয়াঙ্গা আরাকান রাজ্যের অধিকারে। যুদ্ধ বাধলে আরাকানী নৌবহর আর পর্তুগীজ দস্যুদের রণতরী একযোগে মোগলদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরচেয়ে হুগলীর পর্তুগীজ পত্তনি অধিকার করা অনেক সহজ। যদিও হুগলী থেকে তাঁর বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ কম নয় তবুও হুগলীর প্রতি মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। কারণ তাঁর অভিষেকের সময় হুগলী থেকে কোন উপঢৌকন দিল্লীতে পাঠান হয়নি।

কাসিম আলি এনায়েতুল্লা খানকে সৈন্যাধ্যক্ষের ভার দিয়ে পাঠালেন। সহকারী হিসেবে সঙ্গে দিলেন অভিজ্ঞ পাঠান সেনানায়ক বাহাদুর খানকে। গুলনারের মালিক ইউসুফ বাহিনীর সঙ্গে গেলেও কাসিম আলি তাকে কোন পদাধিকার দিলেন না। সে সমগ্র বাহিনীর পর্যবেক্ষক হিসেবে সঙ্গে রইল। প্রয়োজন হলে এনায়েতুল্লা যাতে ইউসুফের সঙ্গে পরামর্শ করে সে নির্দেশও দেওয়া হল। বিচক্ষণ কাসিম আলি বুঝেছিলেন, গুলনারের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত ইউসুফ হয়তো যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারবে

না, তাই তিনি তাকে বাহিনীর সঙ্গে পাঠালেও ভারমুক্তই রাখলেন। হুগলী নদীতে মোগলবাহিনী বেশ কিছু নৌকোর সমাবেশও ঘটাল।

হুগলী শহর থেকে কিছু দূরে মোগলবাহিনী তাদের ছাউনি ফেলল। কামানগুলো মুখ করে রইল হুগলী শহরের দিকে।

দিল্লী আর ঢাকা থেকে জেসুইট ফাদাররা আগে ভাগেই হুগলী অভিযানের খবর সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা দ্রুত খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হুগলীতে। কিন্তু হুগলীর শাসন পরিষদ কিছুতেই সে খবরে কান দেয়নি। তারা ভাবতেই পারেনি যে মোগল সম্রাটকে বছরে বছরে এত কর দিয়েও এমন ব্যবহার পাওয়া যাবে।

এনায়েতুল্লা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলগুলি অধিকার করে নিয়ে শহর অবরোধ করে বসে রইল।

পর্তুগীজদের অন্যতম ক্যাপ্টেন মার্টিম-ডি-মেলোর সঙ্গে হুগলীর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের সদ্ভাব ছিল না। সে গোপনে এনায়েতুল্লাকে সংবাদ দিল, ডিয়াগো-ডা-সা-র স্ত্রী হুগলীর ডেরাতেই রয়েছে। তাছাড়া এক পক্ষকালের মধ্যে ডিয়াগো-ডা-সা দিয়াঙ্গা থেকে হুগলীতে নিজের ডেরায় বিশ্রামের জন্য এসে যাবে। ঐ ডিয়াগো-ডা-সা-ই গুলনার বিবির অপহরণকারী।

এ খবরটুকু দিয়েই সে আর একটি লোভনীয় সংবাদ মোগল সেনাপতির কর্ণগোচর করল। অগাস্টিনিয়ান চার্চ আর জেসুইট হাউসের রত্নভাণ্ডার অপরিমিত। ঐ রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের কিছু অংশ পেলেই সে খুশি হবে।

এনায়েতুল্লা ডি-মেলোকে বলল, ক্যাপ্টেন তার সহযোগিতার পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে।

ইউসুফ এনায়েতুল্লাকে পরামর্শ দিয়ে বলল, হুগলী নদীতে মোগলদের যে সব সৈন্য বোঝাই নৌকো রয়েছে সেগুলো যেন শহরের বেশ খানিকটা উত্তর দিকে সরিয়ে রাখা হয়, কারণ ডিয়াগো-ডা-সা দক্ষিণ থেকে তার জাহাজ নিয়ে যখন শহরে ঢুকতে যাবে তখন শত্রুদের নৌবাহিনী দেখে পিছিয়ে যেতে পারে।

ইউসুফের পরামর্শ মত সেই ব্যবস্থাই করা হল।

এদিকে হুগলীর পর্তুগীজরা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রথমে খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু লড়াই যাদের রক্তে তারা সহজে হার মানবার নয়। সীমিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা প্রস্তুত হল লড়াইএর জন্য। প্রথমে পর্তুগীজ পক্ষ থেকে ফাদার ক্যাবেরলকে দূত হিসেবে মোগল শিবিরে

পাঠান হল। ক্যাবরেল মোগল সেনাপতির কাছে জানতে চাইলেন কি উদ্দেশ্যে মোগলরা তাদের আক্রমণ করতে চায়।

সেনাপতি বলল, একটি সম্ভ্রান্ত মহিলাকে ঢাকা থেকে আরও অনেকগুলি হতভাগ্য মানুষের সঙ্গে ধরে এনে এখানে রাখা হয়েছে, তাই তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।

ক্যাবরেল বললেন, কথাটা সত্য আবার মিথ্যাও।

কি রকম?

অপহরণের কথা সত্য কিন্তু হুগলীতে তাদের অবস্থানের কথা সত্য নয়।

তবে তারা কোথায়?

শুনেছিলাম দিয়াঙ্গা কিংবা আরাকানের রাজধানীতে।

সেনাপতি হেসে বলল, ফাদার, তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না কিন্তু রাজনীতিতে বিশ্বাস শব্দটাকে বাতিল করা হয়েছে। কথা দিচ্ছি, নগরে প্রবেশ করে আমরা শুধু অনুসন্ধান চালাব আমাদের মানুষজন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হয়ে আছে কিনা।

ফাদার ক্যাবরেল ফিরে গেলেন।

পর্তুগীজদের পরামর্শ-সভায় স্থির হল তারা কিছুতেই মোগলদের নগরে প্রবেশ করতে দেবে না। একবার ঢুকে পড়লে পর্তুগীজদের আর কোন প্রতিরোধই থাকবে না।

সুতরাং দু'পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। পর্তুগীজরা কিন্তু প্রথম আক্রমণের ঝুঁকি নিল না। ওদিকে মোগলবাহিনীও অবরোধ করে বসে রইল। ডিয়াগো-ডা-সা ঢুকলেই জলে-স্থলে শুরু হয়ে যাবে মোগলদের আক্রমণ।

মার্টিম-ডি-মেলোর অনুচর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে খবর নিয়ে এল, যে ডিয়াগো-ডা-সা নগরীতে প্রবেশ করেছে।

খবর পাওয়ামাত্র এনায়েতুল্লা নৌসেনাদের আদেশ দিলেন হুগলীনদী বরাবর দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে। পর্তুগীজরা তাদের জাহাজে করে যাতে পালাতে না পারে সেজন্য লোহার শেকল টেনে নদীর স্থানে স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করা হল।

এরপর প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল দু-পক্ষের গোলাবর্ষণ। মোগলরা শুরু করল আগে, তার প্রত্যুত্তরে পর্তুগীজদের কামান গর্জে উঠল।

ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ। প্রভাতে বাসা ছেড়ে

যে সব পাখি উড়ে গিয়েছিল আহারের সন্ধানে তারা দিনান্তে আর ফিরে আসতে পারল না। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের মত কামানের গর্জন থেমে গেল। মোগলরা শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ভাঙতে পারল না। দু'পক্ষেই হতাহত হল প্রচুর।

প্রথমে ইউসুফের মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, হয়তো সে গুলনারকে হুগলীতেই দেখতে পেয়ে যাবে, কিন্তু মার্টিম-ডি-মেলো যখন নিশ্চিত করে বলল যে, গুলনার হুগলীতে নেই তখন সেনাপতি এনায়েতুল্লার হুগলী ধ্বংস করে ফেলতে আর কোন বাধা রইল না।

কিন্তু যত সহজে হুগলী নগরী ধ্বংস করে ফেলবে বলে মোগলরা ভেবেছিল, তা আর সম্ভব হল না। অসামান্য দক্ষতায় নিপুণ পর্তুগীজ সৈন্যরা নগরীর পতন বহুদিন ঠেকিয়ে রাখল।

এদেশীয় বহু মহিলাকে পর্তুগীজরা খৃষ্টধর্মমতে বিয়ে না করেও তাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করত। গোলন্দাজদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় দেখা গেল ঐসব মেয়েরাই কামানে গোলাবারুদ ভরছে।

শেষে সত্যিই একদিন পর্তুগীজ যোদ্ধাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষীণ হয়ে এল। তখন পরামর্শ সভায় স্থির হল, যে ক'টি জাহাজ এখনও অক্ষত আছে, রাতের অন্ধকারে তাতে আরোহণ করেই পালাতে হবে।

কিন্তু পালান সহজ হল না। মার্টিম-ডি-মেলো পর্তুগীজদের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিল। মোগলদের দিক থেকে রাতের আকাশ আলোকিত করে ছুটে আসতে লাগল গোলা। নদীবক্ষে ডুবতে লাগল পর্তুগীজদের জাহাজ।

নারী-শিশুতে বোঝাই একটি জাহাজ হুগলীর অন্ধকার জলরাশি চিরে বেরিয়ে যাচ্ছিল মোহনার দিকে। তার হালে বসেছিল যে পর্তুগীজটি, গোলার ঘায়ে তার একটা পা থেঁতলে গিয়েছিল। কিন্তু সে যন্ত্রণা সহ্য করেও নির্বিকারে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজখানা। হঠাৎ লোহার একটা শেকলে আটকে গেল জাহাজ। শেকল ধরেছিল মোগলদের যে নৌকোগুলো তারা জাহাজটাকে ঘিরে ফেলার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। সামান্য শিথিল হল শেকল, অমনি প্রবল বিক্রমে দাঁড় টেনে বেরিয়ে গেল জাহাজ। কিছু পথ গিয়েই রক্তক্ষরণের ফলে আহত কর্ণধারের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। অমনি দাঁড় থেকে একটি লোক চলে এল হালে। জাহাজ যেমন চলছিল তেমনি উড়ে চলে গেল।

অন্য একটি ছোট জাহাজে কয়েকজন যাত্রী ও সশস্ত্র পর্তুগীজ জেসুইট

হাউসের সিন্দুকভরা ধনরত্ন নিয়ে পালাচ্ছিল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তাদের ঘিরে ধরল মোগল নৌ-সৈনিকের দল। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হল পর্তুগীজরা। এক পর্তুগীজ মহিলা পেটিকা ও শিশুকন্যা সহ ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। পেছনের পর্তুগীজ নৌকো তাকে দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলে নিয়ে দাঁড় টেনে পালাল। মূল্যবান রত্নের চেয়ে কন্যাটি প্রিয় হওয়ার রত্ন পেটিকাটিকে কিন্তু গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়েছিল।

অন্ধকার নগরীর পথে ছুটে চলেছিল বিশজন অশ্বারোহী। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মার্টিম-ডি-মেলোর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক। তারা এসে দাঁড়াল বিরাট কতকগুলি বনস্পতির আড়ালে। স্বল্প চন্দ্রালোকে তারা বৃক্ষগুলির ঘন ছায়ার আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

দু'টি অশ্ব প্রথমে বেরিয়ে এল অদূরে একটি গৃহ থেকে। তারপর আরও দু'টি, আরও দু'টি। পাশাপাশি চলেছিল দু'টি দু'টি করে অশ্ব।

পথ-প্রদর্শক অঙ্গুলি নির্দেশে কি যেন দেখিয়ে দিল। অশ্বগুলি মধ্যম গতিবেগে বৃক্ষের জটলা অতিক্রম করে যাওয়ামাত্র বিশজন অশ্বারোহী পশ্চাৎ থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত আক্রমণে আত্মরক্ষার বিশেষ কোন সুযোগ পেল না তারা। ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রইল। নৈশাকাশ বিদীর্ণ করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আর্ত অশ্বগুলির হ্রেষাধ্বনি।

কেবলমাত্র দুজন অশ্বারোহীকে আঘাতের বাইরে রাখা হয়েছিল। তাদের একজন পুরুষ অন্যজন নারী। পুরুষটি রমণীটিকে আড়াল করে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে এগিয়ে এল এক অশ্বারোহী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, এবার তোমার পালা ডিয়াগো-ডা-সা।

অমনি পর্তুগীজ জলদস্যু তার তেজী ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। ঘোড়া তার সামনের দুটো পা তুলে হ্রেষাধ্বনি করল। কিন্তু ডিয়াগো-ডা-সা প্রথম আঘাত হানবার জন্য এগিয়ে এল না।

ভয় নেই, আমার বিবিকে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি যেমন করে টেনে নিয়ে পালিয়েছ, আমি নিশ্চয়ই তেমন করব না। এস, আমরা দুজনে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করি, তুমি জয়ী হলে তোমার বিবিকে নিয়ে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে, কেউ বাধা দেবে না। আর আমি যদি জয়ী হই তাহলে তোমার স্থাবর-অস্থাবরের সঙ্গে তোমার বিবিও আসবে আমার অধিকারে।

সঙ্গে সঙ্গে হার্মাদ ঘোড়াটা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল ইউসুফের ওপর।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সরে গিয়ে ইউসুফ আঘাত বাঁচালে। পরমুহূর্তে সেও হানল পাল্টা আঘাত।

দুজনেই অসিযুদ্ধে সুনিপুণ। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে রাতের অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রহর গড়িয়ে গেল, রক্ত ঝরল অন্ধকারে কিন্তু যুদ্ধ থামল না। অবাক বিস্ময়ে আকাশের চাঁদ, তরুশ্রেণী আর উপস্থিত অশ্বারোহীরা তাদের অসাধারণ শিক্ষার কৃতিত্ব লক্ষ্য করতে লাগল। বিশাল প্রান্তর জুড়ে কখনো তাদের রণক্ষেত্র বিস্তৃত হল, আবার কখনো দুটো অশ্ব মুখে মুখ দিয়ে দাঁড়াল, দুটো অসি গভীর ঘর্ষণে পরস্পরকে চুম্বন করল।

এক সময় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানল ইউসুফ। উত্তেজনায় সহসা চীৎকার করে উঠল ডিয়াগো-ডা-সা-র বিবি। আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হার্মাদের হাত হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। ইউসুফের তরবারির আঘাতে বহু দূরে ছিটকে পড়ল তার তরবারি।

ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুতবেগে পালাতে লাগল হার্মাদ। পেছনে ছুটল ইউসুফ, কাপুরুষ, নিজের বিবিকে ছেড়ে প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাচ্ছিস ?

চতুর্দিক থেকে অশ্বারোহীরা ছুটে এলো। ঘিরে ধরল হার্মাদকে। বন্দী হল দুর্ধর্ষ জলদস্যু ডিয়াগো-ডা-সা আর তার বিবি। ডিয়াগো-ডা-সা-র ঘরেই তাদের বন্দী করে রাখা হল।

সারাদিন ধরে চলল নগরীলুণ্ঠন। চার্চের ধনরত্নের সঙ্গে তিন সহস্র পর্তুগীজ নরনারী আর প্রায় পাঁচশত হতভাগ্য ক্রীতদাসকে বিশাল প্রান্তরে জড়ো করা হল।

বিচার-সভায় ঘোষণা করা হল, হয় পর্তুগীজদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে ক্রীতদাস-দাসীর জীবনযাপন করতে হবে না হলে গর্দান দিতে হবে।

সবাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণে সম্মতি জানাল।

এবার ঘোষণা করা হল, যেসব হতভাগ্য ক্রীতদাস এতদিন পর্তুগীজদের সেবায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তারা সকলেই আজ মুক্ত।

চতুর্দিকে গগনবিদীর্ণ করা বন্ধনমুক্তির একটা উল্লাসধ্বনি উঠল।

এবার বিচারের পালা জলদস্যু ডিয়াগো-ডা-সা-র। তাকে প্রশ্ন করল বাহাদুর খান, গুলনার বিবি কোথায় ?

ক্রীতদাসী হিসাবে চালান দেওয়া হয়েছে।

কোথায় ?

আরাকানের রাজধানীতে।

এমন ঘৃণ্য কাজ তুমি করলে কেন?

এ আমার ব্যবসা। একে আমি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করি না।

তুমি জান হার্মাদ, এ কাজের কি ভীষণ শাস্তি?

কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না জলদস্যু ডিয়াগো-ডা-সা।

বাহাদুর খান ঘোষণা করল, দীর্ঘ দিন আমাদের দেশের মানুষকে তাদের সমাজ, সংসার, প্রিয়জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মনে যে শোকের আগুন জ্বালিয়েছ, সেই আগুনে পুড়ে মরতে হবে ডিয়াগো-ডা-সা-কে। আর সেই আগুন আজ জ্বালাবে এইসব ভাগ্যহত ক্রীতদাসের দল।

সূর্যাস্তের আকাশে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতার আগুন। অন্যদিকে হুগলীর বুকে জ্বলে উঠল ডিয়াগো-ডা-সা-র বহু পাপের পণ্যেভরা জাহাজখানা। সমবেত পাঁচশত ক্রীতদাস এনায়েতুল্লার নির্দেশে আগুন দিল সে জাহাজে। বন্দী ডিয়াগো-ডা সা-কে নিয়ে সেই দগ্ধ জাহাজ সন্ধ্যার অন্ধকারে হুগলীনদীর গর্ভে তলিয়ে গেল।

পরদিন ডিয়াগো-ডা-সা-র বিবিকে তঞ্জামে চড়িয়ে মোগলবাহিনী ফিরে চলল ঢাকা অভিমুখে।

॥ পাঁচ ॥

পাহাড়ী নদীর স্রোত ঠেলে রাজকীয় নৌকো পঞ্চম দিনে যেখানে এসে পৌছল সেটা শেষ তল্লাসী-ঘাঁটি। এরপর আর নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা নেই। এখান থেকে তিনদিনের পথ পাহাড় ভেঙে গেলে তবেই পৌছনো যাবে সেই নির্বাসনের জায়গাটিতে। নদীর ধারে পাহাড়ী খাঁজে তিনটি ঘাঁটি ওরা পেরিয়ে এসেছে। আরাকানরাজের পাহারাদারেরা সেখানে মজুদ ছিল। তারা তল্লাসী করেছে। বিশেষ কোন আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। অবশ্য নির্বাসন-উপত্যকায় যাবার পথে তল্লাসী তেমন জোরদার হয় না। কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে গেলেই বিপদ। প্রথমে ফেরার অনুমতি-পত্র দেখাতে হবে, না হলে আবার তিনদিনের পথ ভেঙে ফিরে যেতে হবে। কেবলমাত্র যাওয়া আসার অনুমতি আছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। তাঁরা ধর্মপ্রচারের জন্য যেখানে খুশি যেতে পারেন। আরাকানরাজ বৌদ্ধ, তাই বৌদ্ধ শ্রমণ সম্বন্ধে আইনের এই শিথিলতা।

ওরা শেষ তল্লাসী ঘাঁটি পেরিয়ে যাবার সময় ওদের সঙ্গে নিয়ম অনুযায়ী

মাঝিমাল্লারা মাসখানেকের খাবারদাবার, বীজধান ইত্যাদি বয়ে নিয়ে গেল। তিনদিনের দুর্গম পথ পেরিয়ে ওরা এক দ্বিপ্রহরে পৌঁছল সেই নির্বাসন-উপত্যকায়।

চারদিক দুর্গম পর্বতবেষ্টিত। গিরিগাত্র গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ। মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে খরস্রোতা এক পার্বত্য নদী। সেই নদীই উপত্যকাবাসীদের জলের প্রধান উৎস।

সরকারী মাল্লারা গুলনার, পুষ্পমঞ্জরী আর ভবতোষকে যেখানে এনে তুলল সেখানে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা কুটীর সরকার থেকেই নির্মাণ করে দেওয়া আছে। শালের খুঁটিতে মজবুত করে তৈরি সেইসব ঘর। বুনো হাতি কিংবা অন্য কোন জন্তু যাতে সহজে ঘর ভেঙে ঢুকে পড়তে না পারে তারই ব্যবস্থা।

উপত্যকাটি বহু বিস্তৃত। বিভিন্ন এলাকায় এক একদল মানুষ পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে। সকলেই আরাকানরাজ কর্তৃক নির্বাসিত আসামী। তবে ব্রহ্মদেশের দিক থেকে সুদূর অতীতে কিছু কিছু পীতবর্ণের যাযাবর মানুষ পাহাড় ডিঙিয়ে এই উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতের আসামীদের রক্তের মিশ্রণে কিছু কিছু শঙ্কর জাতের মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, তারাও উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এইভাবে এই নির্জন, জঙ্গলাকীর্ণ, সভ্যজগৎ থেকে বহু দূরবর্তী উপত্যকায় জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্য এক মনুষ্যগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটছে। এখানেও কিন্তু ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ধর্মের। পীতবর্ণের রক্ত সম্বন্ধযুক্ত মানুষগুলি আদিতেই ছিল বৌদ্ধ। এখন তাদের শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত বংশধরেরাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই তাদের আচার-আচরণ, শীল ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে দেবার জন্য মাঝে মাঝে দুর্গম পথ পেরিয়ে আসেন দুএকজন শ্রমণ। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু নির্বাসিত মানুষ রয়েছে। তারাও কেউ কেউ পাহাড়ীদের ভেতর থেকে তাদের জীবনসঙ্গিনী সংগ্রহ করে বংশ-বৃদ্ধি করেছে। তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকে উত্তর দিকের পর্বতগাত্রে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এ অঞ্চলে মুষ্টিমেয়। তারাও পীতবর্ণের পাহাড়ীদের সঙ্গে রক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমানরা যেমন আল্লার ভজনা করে, হিন্দুরাও তেমনি করে মনসা, কালী, শিবের উপাসনা।

দক্ষিণ পাহাড়ে থাকে খৃষ্টানদের পাঁচঘর মানুষ। সন্দীপের পর্তুগীজ

জলদস্যুদের ধরে এক সময় এখানে পাঠান হয়। তারাও পাহাড়ীদের থেকে আপন আপন নারী নির্বাচন করে বংশবৃদ্ধি করেছে।

এদের কারুরই সভ্যজগতে ফিরে যাবার পথ নেই। প্রকৃতির কোলে, অনন্ত আকাশের তলায় এরা এদের নিজস্ব পৃথিবী গড়ে নিয়েছে। এখানেই এদের শান্তি, এখানেই এদের মুক্তি।

মাল্লারা গুলনারদের নতুন আস্তানা দেখিয়ে বলেছিল, তোমরা এই নতুন আস্তানায় থাকতে পার অথবা ধর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতে পার, কোন বাধা নেই। ওসব এলাকায়ও সরকারী ডেরার অভাব হবে না।

গুলনার যেতে চায়নি। তার এই মানসিক অবস্থায় বহু মানুষের সঙ্গ সে এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিল। কিন্তু দু'দিন কাছাকাছি থাকার পর ভবতোষ আর পুষ্পমঞ্জরী অনেক মানুষের সঙ্গই কাম্য বলে মনে করল। তারা উঠে গেল মুষ্টিমেয় হিন্দু এলাকায়। যাবার সময় গুলনারকে তার অভিরুচি অনুযায়ী খৃষ্টান অথবা মুসলিম এলাকা নির্বাচন করতে বলেছিল, কিন্তু গুলনার হেসে বলেছিল, আল্লার রাজ্যে আর এলাকা ভাগ করি কেন, যেখানে থাকি সেটাই তাঁর স্থান।

পুষ্পমঞ্জরী চলে যাবার সময় বলেছিল, আমরা যেখানেই থাকি একবার করে এসে দেখে যাব। তোমার সুবিধা অসুবিধার কথা আমাদের বলতে সংকোচ কর না দিদি।

অকৃত্রিম হাসি হেসে গুলনার পুষ্পমঞ্জরীর কানে কানে বলেছিল, ভবতোষকে নিয়ে সংসার গড়লে আমি সবচেয়ে সুখী হব বোন। তোমাদের মিলনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল জানবে।

গুলনারের ডেরা থেকে ভবতোষের হিন্দু এলাকা দু'ক্রোশ পরিমাণ দূরত্ব। ভবতোষ চলে যাবার কয়েকদিন পরেই পুষ্পমঞ্জরীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। হিন্দু বিবাহিতা মেয়ের চিহ্ন তার ললাটে। মুখখানা খুশিতে ভরা। এক কাঁদি সুপক্ব কলা এনেছিল ওরা। ওখানকার হিন্দু বাসিন্দারা নাকি ওদের দুজনকে পেয়ে লুফে নিয়েছে। ওরাই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকবার আস্তানা ইত্যাদি ঠিক করে দিয়েছে। সেখানে শস্য, ফলমূল কোন কিছুরই অভাব নেই।

ওরা গুলনারকে আশ্বাস দিয়ে বলে গেল সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য গুলনার যেন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে।

প্রায় রাতেই গুলনারের ঘুম ভেঙে যায়। নিঃসঙ্গ জীবন আকাশের মত

পালমেরো। আমাকে পালমেরো বলেই ডেকো।

বস পালমেরো।

এস, একসঙ্গেই বসা যাক।

দুজনে বসল। পালমেরো বলল, তুমি কি করে এখানে এলে? তুমি তো দস্যু, তস্কর কিংবা গুপ্তচর নও।

তুমি যে ধরা পড়েছিলে আর গুপ্তচর বলে এখানে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল তা আমি শুনে এসেছি।

আর তুমি?

মুখ টিপে হাসল গুলনার, আর যা হই গুপ্তচর নই।

পালমেরো অমনি বলে উঠল, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলে আমি গুপ্তচর?

একজন ছাড়া সকলেই বিশ্বাস করেছিল।

সেই একজন নিশ্চয়ই গুলনার।

আমি যে তোমার ছবি দেখেছি পালমেরো। এমন ছবি যে আঁকতে পারে সে জাতশিল্পী। যথার্থ শিল্পীরা কি কখনো গুপ্তচরের কাজ করতে পারে?

আচ্ছা, এখন বল তুমি কি করে এলে?

আমাকে রাজার কাছে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। অভিষেক উৎসবের জন্য রাজা হঠাৎ খুব উদার হয়ে গিয়ে বললেন, যদি কেউ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি চাও তাহলে নির্বাসন উপত্যকায় গিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস কর। তবে আর কোনদিন সভ্য জগতের মানুষের মুখ দেখতে পাবে না।

পালমেরো বলল, কেমন লাগছে জায়গাটা?

খুবই ভাল, আবার এক সময় খুবই অসহ্য।

কি রকম?

এমন আদিম প্রকৃতির মুখোমুখি কোনদিনই হতে পারতাম না, সেদিক থেকে ভাল, কিন্তু পাখি আর বন্য জন্তুর স্বর শুনে কতদিন কাটান যায়?

আমি কিন্তু সত্যি বলতে কি দিব্যি আছি। প্রাণভরে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকা চলছে। দেখবে একখানা ছবি? কাল ওপরের পাহাড় থেকে এঁকে এনেছি।

কই দেখি।

কাঁধের ঝুলি থেকে হাতড়ে একটি ছবি বের করে আনল পালমেরো।

ছবিটা মেলে ধরল গুলনারের চোখের সামনে।

আতঙ্কের তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গুলনারের গলা চিরে। বড় বড় চোখ মেলে সে বলল, এটা সত্যিকারের না তোমার কিছু কল্পনা মেশানো?

তার মানে! আমি কাল প্রায় সারাদিন একটা গাছের ডালে বসে এঁকেছি।

বিশাল আকারের এক পাহাড়ী সাপ গাছের একটা মোটা ডালে লেজ জড়িয়ে মাটিতে মুখ নামিয়ে একটা বন্য বরাহকে গিলছে।

ছবিখানা নিখুঁত করে আঁকা। প্রাণভয়ে ভীত শূকরের ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ আর ক্ষুধার্ত সাপটার হিংস্র চোখ শিল্পীর কলমের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গুলনার মন্তব্য করে, ছবিখানা ভয়ঙ্কর কিন্তু অপূর্ব।

পালমেরোর চোখে মুখে আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে। সে বলে, ইতিমধ্যে পঞ্চাশ মাইল উপত্যকা আমি চষে ফেলেছি। অনেক বিষয় আছে আঁকার, অনেক বিষয় আছে লেখার।

কোথায় রয়েছ তুমি?

বড় অপরাধীদের খাতির বেশী। আমি গুপ্তচর বলে অপরাধের মাত্রাটা আমার কম নয়। তাই পাহাড়ের খানিকটা ওপরে জঙ্গলের ভেতরে আমার ডেরা বানান হয়েছে। ওখানে বুনো জন্তুর পেটে গেলে একেবারে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে অপরাধীর, তাই এ ব্যবস্থা।

সেখানে খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা?

সদাশয় আরাকানী সরকার অনেক ফলের গাছ সেখানে লাগিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে অজস্র কলা ফলছে বারোমাস। আমি নিচের এলাকায় নেমে কলার বদলে অন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।

আমি তোমার আস্তানায় একদিন গিয়ে পৌঁছব পালমেরো।

নিশানা জান না, কেমন করে যাবে?

তুমি না জেনে যেমন করে এলে। ঠিক দেখ একদিন ঘুরতে ঘুরতে তোমার ডেরা বের করে ফেলব।

আমি যদি তখন না থাকি?

তুমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

তারচেয়ে আমি এসে একদিন তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব, তারপর

যেদিন খুশি তুমি একাই যেতে পারবে।

না পালমেরো, আমাকে আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোর না।

এখান থেকে ঐ যে দূরের পাহাড়টা দেখছ, ওরই মাঝ বরাবর একটা জায়গায় আমার আস্তানা। কাছে পিঠে কেউ নেই।

এইটুকু জেনে নিলাম, ব্যস। কিন্তু একা থাকলে জন্তুজানোয়ার ঠেকাবে কি করে?

বন্দুক আছে আমার, আরাকান থেকে বয়ে এনেছি।

তোমাকে আনতে দিলে?

না।

তবে?

একটা মোটা বাঁশের ভেতর কুরে ফেলে তারই মধ্যে ভরে এনেছি।

আচ্ছা কৌশল তো তোমার?

পাহারাদারদেব বলেছিলাম, এই মোটা বাঁশে খুব মজার পুতুল তৈরী কবব, তাই নিয়ে যাচ্ছি। দুটো বাঁশের একটাতে বন্দুকের রসদ অন্যটাতে বন্দুক।

ওবা বলেছিল, ফের যখন আসব তখন তোমার তৈরি পুতুল দেখে যাব। আমি সঙ্গী পাহাবাদাব আর চারটে ঘাঁটির পাহারাদারকে বশ করে ফেলেছিলাম।

কি বকম?

ওদেব সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি এঁকে উপহার দিয়েছি। তাতে দারুণ খুশি। ওরা আর বাঁশ দুটোকে যাচাই করে দেখতেই চায়নি।

গোলাগুলি ফুরোলে আবার পাবে কি করে?

অনেক আছে, আগে ফুরোক তো, তারপর ভেবেচিন্তে উপায় একটা বের করা যাবে।

গুলনার তার সঞ্চিত কিছু খাবার বের করে অতিথি সৎকার করল। বেলা পড়ে আসছিল, গুলনারই বলল, অনেক পথ পেরিয়ে ডেরায় পৌছতে হবে তোমাকে, সন্ধ্যাও নামছে, এটুকু খেয়ে নাও।

পালমেরো খেতে খেতে বলল, আজ সারাদিন বড় খাটুনি গেছে, ভাল করে খাওয়াই হয়নি। তোমার দেওয়া খাবার খেয়ে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছি।

খাওনি কেন?

পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা এলাকায় দেখলাম অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

কাছে গিয়ে দেখি একটা ছেলে পাহাড় থেকে পড়ে হাত ভেঙে বসে আছে।

তারপর?

তুমি হয়তো জান না, আমি একজন অস্থিবিশারদ শল্যচিকিৎসক।

তাই!

হাসল পালমেরো, এটা আমার একটা অতিরিক্ত সুবিধে গুলনার। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে অনেক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসক বলে পার পেয়েছি বেশীরভাগ জায়গায়।

আমি তোমার সম্বন্ধে যত জানছি ততই অবাক হচ্ছি। তারপর শোন, ছেলেটার হাতখানা টেনেটুনে ভাল করে বেঁধে দিলাম। আসার সময় ওরা আমাকে অনেক ফলমূল আর চাল বেঁধে দিলে, তাই নিয়ে এদিকে চলে এসেছি।

কোথায় সে-সব?

হাসল পালমেরো। বলল, ভেলায় রেখে এসেছি।

বিস্মিত হল গুলনার, ভেলা!

এই যে তোমার আস্তানার সামনের জঙ্গল ছুঁয়ে পাহাড়ী নদীটা বয়ে গেছে, ওখানেই আমার ভেলা বেঁধে রেখে এসেছি।

কি দিয়ে ভেলা তৈরি করলে?

কেন, জঙ্গল থেকে মোটা মোটা গাছের ডাল কেটে লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধেছি। তাই ভাসিয়েছি নদীর ওপর। এখানে সবাই বুঝি এমনি করে যাতায়াত করে?

কই, আমি তো দেখিনি। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, সকলেই যে যার এলাকায় থাকে। তারা চাষবাস করে জীবনধারণ করে। নদী থেকে জল নিয়ে ব্যবহার করে, ব্যাস। আর তাছাড়া...।

তাছাড়া কি?

এইসব পাহাড়ী নদীতে ভেলা চালাতে গেলে শক্তি আর কৌশল দুটোই দরকার।

তুমি এসব শিখলে কোথায়?

ইচ্ছে থাকলেই সব কিছু শেখা যায়।

আমি তোমার ভেলাটা দেখব।

এসো।

দুজনে পাহাড়ী নদীটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পালমেরো নিচে নামল।

তার হাত ধরে নামল গুলনার। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সত্যি চমৎকার একটা ভেলা বানিয়েছে পালমেরো। কাঁচা বাঁশের একটা লগি বাঁধা আছে তার ওপর। ভেলাটা স্রোতের মুখে এদিক-ওদিক হচ্ছে।

চমৎকার ভেলা তৈরি করেছ।

একদিন তোমাকে এই ভেলায় চড়িয়ে নিয়ে যাব।

বাব্বা, ওতে উঠলে আমি জলেতেই ছিটকে পড়ে যাব।

কোন ভয় নেই, শক্ত করে বসে থাকবে, আমি চালিয়ে নিয়ে যাব।

ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল মিশে অনেক ভাবান্তর হচ্ছিল গুলনারের। মুখের ওপর সেই ছবিটা ফুটে উঠতে দেখছিল পালমেরো।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল তাড়াতাড়ি। গুলনারকে ডাঙায় উঠতে সাহায্য করে পালমেরো ভেলায় গিয়ে উঠল। স্রোতের বিপরীত দিকে ভেলা ঠেলে নিয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের যে কর্ম নয় তা যে কোন লোকেরই বুঝতে অসুবিধে হয় না, কিন্তু পালমেরো যে অসাধারণ শক্তি আর দক্ষতায় সেটিকে চালিয়ে নিয়ে গেল তা গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল গুলনার।

বহুক্ষণ পরে মানুষটা চোখের আড়ালে চলে যেতে গুলনার ডেরায় এসে ঢুকল। নিজের বিছানায় বসে বসে সে আর একটি মানুষের কথা ভাবতে লাগল। পালমেরোর মত এমনি বলিষ্ঠ সে মানুষ। তার মল্লযুদ্ধ, তলোয়ার খেলা সে আড়াল থেকে দেখেছে, কি অসাধারণ শক্তি তার! যেমন ক্ষিপ্র তার দেহচালনা তেমনি তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি।

এক সন্ধ্যায় মানুষটা তাকে বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে তুলে নিয়ে একটি সুখী কবুতরের মত ছাদে চলে গেল। ছাদের মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে বলল, গুলনার, আজ আকাশে চাঁদ আর তারাদের রোশনাই, এসো আমরা কবিতার আসর বসাই।

সে বলল, বেশ, প্রথম কবিতাটি প্রিয়তমের মুখ থেকেই শোনা যাক।

রাজি, তবে একটিমাত্র, তারপর রাতটা প্রিয়তমার।

ইউসুফ শুরু করল:

অগর্ আন্ তুরক্-ই-শীরাজী বদস্ত,
আরদ্ দিল্-ই-মরা।
বখাল্-ই-হিন্দুয়শ্, বখ্শম্ সমরকন্দ,
ব বুখারা রা॥

যদি শীরাজের সেই তুর্কী যুবতী আমাদের হৃদয়কে গ্রহণ করে তবে তার

কালো তিলটির জন্য সমরখন্দ আর বোখারা (দুটি শ্রেষ্ঠ নগরী) বিলিয়ে দিতে রাজি আছি।

সে অমনি বলল, কে সেই ভাগ্যবতী তুর্কী যুবতী, প্রিয়? ঈর্ষা হয় তার সৌভাগ্যের কথা শুনে।

ইউসুফ বলল, প্রতিদিন তোমার প্রসাধনকক্ষে গিয়ে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে যাকে দেখতে পাও সে-ই আমার হৃদয় হরণকারিণী তুর্কী যুবতী।

সে রাতে দুজনে কত গজল উচ্চারণ করেছিল পরস্পরে। গুলনারের মনে হচ্ছিল, খোদাতালা রাতটি শুধু তাদের দুজনের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

শেষ রাতে যখন ইউসুফ তার পিপাসু ওষ্ঠ দু'টি নামিয়ে এনেছিল প্রিয়ার মুখের ওপর তখন হাত দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাকে প্রতিহত করে সে উচ্চারণ করেছিল:

ল্ অল্-সীরাব্ বখুন্ তিশ্নহ্ লব্-
ই-ইয়ার্-ই-মন্-অস্ত্।
বজ্ পদ দীদন্-ই-উ দাদন্ জান্
কার্-ই-মন্-অস্ত্॥

সতেজ, রক্তবর্ণ মণির মত আমার বন্ধুর ওষ্ঠ দু'টি দেখছি রক্তপিপাসু, এখন আমার একমাত্র কাজ তাকে আত্মদান করা।

অনেকখানি জঙ্গল পেরিয়ে আর পাহাড় ভেঙে একদিন গুলনার ঠিক খুঁজে পেল পালমেরোর ডেরা। আস্তানার সামনে তখন বসেছিল ক'টি মেয়ে পুরুষ। চিকিৎসার জন্য তারা এসেছে নিচের উপত্যকা থেকে।

গুলনারকে দেখতে পায়নি পালমেরো। সে রোগীদেব বুকে পিঠে টোকা দিচ্ছিল আর গলা জিভ দেখছিল। তার পাশে মেঝের ওপর পড়েছিল একরাশ গাছগাছালি। সে রোগীদের ভেতর বিলিয়ে দিচ্ছিল ঐ লতাপাতাগুলো আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিল কেমন করে ওগুলো ব্যবহার করতে হবে।

কেউবা সাহেব ডাক্তারের জন্য মোরগ এনেছে, কেউ এনেছে ডিম, কেউ এনেছে কলার ছড়া আবার কেউ এনেছে খাঁচার ভেতর একটা পাখি।

গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে গুলনার দেখছিল সব কিছু। এক সময় রোগীরা একে একে পালমেরোকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। ডাক্তার একটি একটি করে খাদ্যবস্তু ঘরের ভেতর তুলতে লাগল। তার পর ডাক্তার ডেরার ভেতর ঢুকলে গুলনার এগিয়ে গিয়ে পাখির খাঁচাটা হাতে

তুলে নিল। ডাক্তার ফিরে এসে অবাক।

গুলনার খাঁচাখানা তুলে বলল, 'অন্দলীবম্ বিহ্ গুলিস্তান্ জদনেম্ নগুধারন্দ।'—আমি বুলবুল, তবু আমাকে বাগানে যেতে দেওয়া হবে না?

পালমেরো হেসে বলল, নিশ্চয়ই, আমি বন্দীত্বের বিরোধী। বুলবুল তো বাগানে বসে গান গাইবার জন্যেই। তুমি খাঁচা খুলে ওকে মুক্তি দিলে আমি খুশি হব গুলনার।

পাখিটিকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেওয়া হল।

পালমেরো বলল, গুলনার, তুমি আজ আমার এখানে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিলে বড় আনন্দ পাব আমি।

রাজি, তবে রান্নার ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

পালমেরো বলল, তোমার রান্নার সময় আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বলে দাও।

তুমি আমার পাশে বসে থেকে তোমার নানাদেশ ভ্রমণের গল্প বলে যাবে, আমি রান্নার কাজ করতে করতে সে সব শুনব।

সেদিন পালমেরো গুলনারকে শোনাল তার ভ্রাম্যমান জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কাহিনী। মহানগরী থেকে মরুপ্রান্তর, উত্তাল সমুদ্র থেকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, কত বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী মিছিলের মত চলে এল তার কাহিনীর মধ্যে।

গুলনার অবাক হয়ে শুনতে লাগল পথ-পাগল মানুষটির অসামান্য জীবনের কথা। তার মনে হল, একই মানুষ কত তফাৎ। ভিয়াগো-ডা-সা-র দেহে পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত, পালমেরোর দেহেও তাই। কিন্তু দুজনের অবস্থান একেবারে দু'টি আলাদা মেরুতে।

গুলনার খেতে বসে শুনল পালমেরোর রোজনামচা। উঠোনে যখন রোদ এসে পড়ে তখন সে তার নিজের হাতে বানানো কুর্শীখানা নিয়ে রোদ্দুরে বসে। হাতে থাকে কিছু শস্যদানা। নানান পাখি প্রথমে রামনের গাছটার ডালে বসে প্রাণখুলে পালমেরোকে গান শোনায়। তারপর একে একে ওর উঠোনে উড়ে আসে। পায়ে পায়ে এগোতে থাকে পালমেরোর দিকে। কিচির-মিচির শব্দ করে ওঠে। ওরা বলে, কই গো খেতে দাও। এত গান শোনালাম, খেতে দেবে না?

পালমেরো ওদের ভাষা বোঝে। সে হাতের পাত্রে শস্যদানা তুলে ধরে। পাখিরা নির্ভয়ে ওর হাতে বসে খেয়ে যায়। একজন শুধু গাছের ডালে লেজ

তুলে উঁকি দিয়ে দেখে। পাখিরা চলে গেলে সে নেমে আসে তির্ তির্ করে। পালমেয়োর সামনে উবু হয়ে বসে দুটো হাত তুলে বলে, কি গো, হ্যাংলারা চলে গেল ?

পালমেয়ো তাকে বাঁহাতের তর্জনী নাচিয়ে একটা চোখ টিপে কাছে ডাকামাত্রই সে তর্ তর্ করে একেবারে পা বেয়ে কাঁধে উঠে আসে। পালমেয়োর সঙ্গে তখন আর সামনের গাছটার কোন তফাৎ থাকে না। তাকে ফল খেতে দেয় পালমেয়ো। দুটো পায়ে বাগিয়ে ধরে কাঠবেড়ালী কুটুস কুটুস করে ফল খায়।

বিকেলে ভেলায় করে গুলনারকে পৌছে দিতে আসে পালমেয়ো। সারা উপত্যকটা ঘুরে ঘুরে দুধনাগের মত পাহাড়ী নদীটা উত্তর থেকে দক্ষিণে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ওরা সেই নদীর বুকে ভেলা ভাসিয়ে আসতে আসতে দেখে খৃষ্টান এলাকার সামনে গাছের ডালের ক্রশ বানিয়ে সামনে পুঁতে রাখা হয়েছে। একটি বৃদ্ধ উদাস দৃষ্টিতে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মানুষটি কি ভাবছে পশ্চিমে ফেলে আসা তার আপন দেশটির কথা ? ঐ তো পশ্চিমে মুখ করে নামাজ পড়ছে ক'টি মুসলমান। ওরা নামাজের শেষে আল্লার কাছে চোখের জলে হয়তো জানাবে আবেদন, আল্লা, আমাদের ফেলে আসা সংসারকে সুখে রেখো। ডেরার কাছাকাছি পেঁাছেই গুলনার শুনতে পেল শাঁখের আওয়াজ। হিন্দু এলাকা এটি। সন্ধ্যার আকাশে যেন পাহাড় ডিঙিয়ে পাখির মত উড়ে গেল সে আওয়াজ। ওদের বুকের নিশ্বাস উজাড় করে ওরা যেন ঐ শাঁখের ধ্বনির ভেতর দিয়ে ওদের প্রিয়জনদের কাছে খবর পাঠিয়ে বলতে চায়, তোমরা দুঃখ কোর না, আমরা কোন রকমে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

বিষণ্ণ গুলনারের বুকের মধ্যে কেমন যেন হাহাকার ধ্বনি ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে।

ডেরায় পেঁাছে দিয়ে পালমেয়ো ভেলার দিকে ফিরে যেতে চায়। তখন ঘনঘোর সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। গুলনার অনুরোধ জানায়, আর দু'প্রহর পরে পৃথিবীকে আলো দেখাতে চাঁদ আসবে আকাশে। বন্ধুর ডেরায় রাতটুকু কাটিয়ে দিতে কি খুব অসুবিধে হবে তোমার ?

পালমেয়ো বলে, গৃহকর্ত্রীর অসুবিধে না থাকলে আমার কোন অসুবিধে নেই গুলনার।

বহু রাত্রি ওরা বসে বসে গল্প করে। গুলনারের মুখে ফিরে ফিরে বাজতে

থাকে ইউসুফের কথা। কত স্মৃতি, কত ছবি। শেষ বর্ষার মেঘের মত সে উজাড় করে দেয় বন্ধু পালমেরোর কাছে তার চোখের জল। রাতের অন্ধকার গুলনারের বুকের দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে।

পুব আকাশে শুকতারার আবির্ভাব হয়। পালমেরো হঠাৎ বলে ওঠে, শরৎ এসে গেছে গুলনার ঐ দেখ ভোরের আকাশে নীরে ধীরে জেগে উঠছে দুটো সাদা মেঘ।

গুলনার পূর্বদিকে ফিরে দেখতে থাকে সং মেঘ। ক্রমে আলোর বুকভরা আশার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেঘগুলি।

পালমেরো বলতে থাকে, এবার এই দ্বীপ থেকে স্বাধীন কন্যা নিয়ে আবাদানে আসা যাওয়া করবে অনেক নৌকা। যদি ইচ্ছা কর তো একটা জাহাজে তোমাকে তুলে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

তারপর?

ওগুলো জলদস্যুর নয় গুলনার। হয়তো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে কোনটি তোমাকে নিয়ে পৌঁছে যাবে তোমার জন্মভূমিতে বাংলাদেশে।

কিন্তু কি করে তুমি ঐ জাহাজের সন্ধান পাবে এবং কোথায় গিয়ে বা ওখানে যাবে?

আমি জানি গুলনার স্রোতের উল্টো ফেরার পথ আমাদের নেই। তাই এই নদীপথ ধরে দুর্গম পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ভেলা নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। বড় বিপদসঙ্কুল, বড় দুঃসাহসী এ অভিযান। নদীপথে আমরা সমুদ্রের মুখে গিয়ে পড়ব আর সেখানে অপেক্ষা করব ব্যবসায়ী জাহাজের জন্য।

আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত পালমেরো।

পালমেরো হেসে বলল, আমাদের মনের ইচ্ছাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তাদের কুড়িয়ে নিয়ে গুছিয়ে গেঁথে তোলা বড় শক্ত। দুটো দিন তোমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে গুলনার। আমাকে তৈরী হতে দাও।

পালমেরো তার ভেলাখানা নিয়ে চলে গেল। গুলনার সারাটা দিন একটা স্বপ্নের মধ্যে আচ্ছন্ন আর অস্থির হয়ে রইল। সে খেতে বসেও খেতে পারল না, ঘুম এল না তার চোখে। নদীর হঠাৎ খলখল শব্দ অথবা বন্য কোন প্রাণীর ডালপাতার ওপর দিয়ে চলে যাবার শব্দে চমকে ওঠে গুলনার। ঐ বুঝি পালমেরো এলো।

ঠিক চতুর্থ দিনে গুলনারের কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল পালমেরো। কেন

কয়েক যুগের প্রতীক্ষার পর পালমেরোকে দেখতে পেল সে।

এই মুহূর্তে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে গুলনার। এখনও ভোরের আলোর জোয়ার জাগেনি। তবে রাত শেষের তরল অন্ধকারে র‍্যাপ্টখানা (ভাসমান কাঠের গুড়ি বেঁধে তৈরী ভেলা) ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। বাঁক পেরিয়ে পাহাড়ী নদীর ঢালে নামতে সময় লাগবে। ততক্ষণে আলোর ঢেউতে ভেসে যাবে বন। আর আমরাও এ ভ্যালির বাসিন্দাদের চোখের সামনে থেকে সরে যাব।

কিন্তু তোমার রোগীদের কি হবে? তারা তোমাকে দেখতে না পেলে কি ভাববে?

হেসে বলল পালমেরো, বাঘে খেয়েছে অথবা হাতির পায়ের তলায় পঞ্চত্ব পেয়েছে।

গুলনার বলল, অবশ্য ওরা বড় একটা আমার খবর রাখে না, এই যা বাঁচোয়া।

এবার তাড়া লাগাল পালমেরো, আর কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই গুলনার।

ওরা শেষ রাতের অন্ধকারে বেবিয়ে এল নদীর ধারে।

গুলনার বলল, যতটুকু অনুমান করছি এ তো তোমার ভেলা নয়।

তাহলে এ দু'দিন তোমার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিলাম কেন?

বুঝেছি, পাহাড়ী নদীর ধাক্কা সামলাবার জন্য তুমি শক্ত ভেলা বেঁধেছ।

দুজনে সাবধানে র‍্যাপ্টে উঠে এল। পালমেরো গুলনারের হাতখানা ধরতেই গুলনার প্রথমে কেমন যেন চমকে উঠল। অবশ্য তরল অন্ধকারে তার ভাবান্তর বোঝা গেল না।

একটু পরেই পালমেরোর কথায় সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

তুমি মনে কর যেন একটা বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়েছ। একটা লাগাম শুধু তোমার হাতে। সে লাফিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটবে। তোমাকে একেবারে পিঠ থেকে গভীর খাদে ফেলে দেবার চেষ্টা করবে। তুমি কিন্তু তার লাগামখানা যদি বাগিয়ে ধরে থাকতে পার, আর সারা শরীর দিয়ে তাকে চেপে ধরতে পার তাহলে সে তোমাকে সহজে ফেলতে পারবে না। এই যে দড়িখানা র‍্যাপ্টের সঙ্গে বাঁধা। তুমি সারা শরীরের শক্তি দিয়ে এটা ধরে থাকবে। নৌকো থেকে হঠাৎ করে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা আর তোমার থাকবে না।

গুলনার পালমেরোর হাত ধরে নৌকোর দড়িটার হদিস পেল। সে দু'হাতে সেটাকে জাপ্টে ধরে রইল।

র‍্যাপ্ট ছেড়ে দিল পালমেরো। ভরা বর্ষা সবে শেষ হয়েছে। পাহাড়ী নদীতে যৌবনের ঢল। মুহূর্তে অন্ধকারে ভেসে চলল র‍্যাপ্টখানা। আশ্চর্য! একটা শক্ত বাঁশের লগি হাতে ধরে বিধাতা পুরুষের মত অস্পষ্ট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল পালমেরো। শুধু তার হাতের লগিখানা একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে ফিরতে লাগল।

ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠল চারিদিক। বন আর পাহাড়। টিলা, পাহাড় কেবলমাত্র বোঝা যাচ্ছে তাদের উচ্চতায়। পাথরের রঙ দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঘন সবুজ বন। বর্ষার জলে লতাপাতা, গাছগাছালির রঙ ধুয়ে মুছে বেড়ে পরিষ্কার সবুজ হয়েছে। অবশ্য সবুজের রঙেও তফাৎ আছে। হালকা, গাঢ়র নানা রকম ভেদ। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল গুলনারের। সে ধরে বসেছিল কাঠের সঙ্গে বাঁধা মোটা দড়িখানা। এখনও তেমন ঝাঁকানি লাগছিল না তার শরীরে। বিরাট একখানা কাঠের প্যাটরায় কি সব নিয়ে চলেছে পালমেরো। মোটা বাঁশের হাত চারেক করে লম্বা দুটো কাণ্ড একধারে পড়ে আছে। গুলনার জানে 'ম্রাউক-উ' থেকে ওদের একটায় বন্দুক আর একটায় টোটা ভরে এনেছিল পালমেরো। পথে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওগুলোর দরকার আছে বৈকি। আর পালমেরো যে এতখানি হিসেবী তা জানতে বাকী ছিলনা গুলনারের। অন্তত পাঁচ কাঁদি কলা সে এনেছে তার র‍্যাপ্টে। ক'দিন লাগে কে জানে, তাই এ ব্যবস্থা। আরও কিছু নিশ্চয় আছে ওর ঐ বাক্সে। কারণ গম দিয়ে ইঁটের মত এক রকম পিঠে তৈরী করতে জানে পালমেরো। ওটাই নাকি ওদের দেশের প্রধান খাদ্য। গুলনার নিজের পোশাক ছাড়া অবশ্য আর কিছু আনে নি। কারণ পালমেরোই ক'দিন আগে তাকে সঙ্গে পোশাক ছাড়া কোন কিছু নিতে বারণ করেছিল।

পালমেরোর গলা শোনা গেল, হয় আমরা আরাকানের এ জংগল চিরে বেরিয়ে যাব না হয় এই জংগলটাই আমাদের দুজনকে গ্রাস করে নেবে।

গুলনার বলল, সত্যি, যত জোরে স্রোতের টানে এগোচ্ছি, জংগলটা ততই যেন হাঁ করে গিলতে ছুটে আসছে।

ভয়ংকর কিন্তু সুন্দর, কি বল?

গুলনার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ, কান খাড়া করে ঐ গাছের ধারে-

কটা খরগোস দাঁড়িয়ে আছে।

র‍্যাপ্টখানা হঠাৎ ঘুরে গেল।

ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল গুলনার কিন্তু হাতে শক্ত করে জড়ান দড়িটাই তাকে রক্ষা করল। ততক্ষণে একখানা মাথা উঁচু পাথরের গায়ে লগির ধাক্কা মেরে র‍্যাপ্টখানাকে সামলে নিয়েছে পালমেরো!

এখন থেকে [illegible] সজাগ। র‍্যাপ্ট চালাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হওয়া চলবে না। কথা বলবে কিংবা শুনবে, তবে চোখ থাকবে জলের স্রোতের ওপর। বনের শোভা দেখার জন্য চোখ ওপরে তুলেছ কি আঁকাবাঁকা ঐ দুধনাগটা ছোবল মারবেই। ওর ছোবল বড় মারাত্মক, প্রাণে বাঁচা দায়।

লাগেনি তো তোমার?

আমি খরগোস দেখাতে গিয়ে তোমাকে অন্যমনস্ক করে দিলাম, তাই।

এবার থেকে স্রোতের বেগ বাড়বে। আমাদের আরও সাবধান হতে হবে গুলনার।

আমি কি তোমাকে কিছু দেব?

তুমিও পাবে। সামনে একটা বাঁধ দেখা যাচ্ছে, ওখানে র‍্যাপ্টটা বাঁধার চেষ্টা করি।

বাঁধের মুখে জলের সাংঘাতিক একটা ঘূর্ণি। র‍্যাপ্টখানা তারই ভেতর ফেলে অতি কৌশলে একটি দড়ি নিয়ে লাফিয়ে নামল পালমেরো। সঙ্গে সঙ্গে দড়িখানা জড়িয়ে দিল একটা গাছে। এবার টানতে টানতে র‍্যাপ্টখানাকে ডাঙার একেবারে গায়ে এনে ভেড়াল।

ডাঙায় সামনে সবুজ ঘাসের জমি। তার ওপর বসে জলযোগ সারল দুজনে।

আচ্ছা পালমেরো, আমি অবাক হচ্ছি তোমার নৌকো চালানো দেখে। তুমি তো ছবি আঁকো, এ বিদ্যে শিখলে কোথায়?

সেয়াইয়া নদী জিসবনের কাছে যেখানে আতলান্তিকের জল ছুঁয়েছে তার থেকে দু'দিনের নৌকো-পথ আমার বাড়ী। ঐ নদী আমাদের ছেলেবেলা থেকে খেলার সঙ্গী। নদীর স্রোতের ঘাঁতঘোত তাই আমার অনেকখানি চেনা।

জলযোগের শেষে উঠে পড়ল পালমেরো।

আমাদের এখন অনেক কঠিন পথ পেরুতে হবে গুলনার। বিপদের মুখোমুখি যত তাড়াতাড়ি হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

দুপুরের কাছাকাছি সে বিপদ এল।' নদী এখানে মাঝারি ধরনের একটা প্রপাত সৃষ্টি করেছে। এখানে স্রোতের টান এবং প্রবাহ স্বাভাবিক-ভাবেই বেশী। দূর থেকে স্রোতের টান বুঝতে পেরেছিল পালমেরো। তাই সে একটা বড় পাথরের মাথায় র‍্যাপ্টখানাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

তুমি কোমরে দড়িখানা জড়িয়ে নাও, হাতেও শক্ত করে জড়িয়ে রাখ। সবচেয়ে বড় কথা মনটাকে স্বাভাবিক রেখ।

এই ক'টা কথা বলেই র‍্যাপ্টখানা স্রোতের মুখে ঠেলে দিল পালমেরো।

সামনে মৃত্যু কিভাবে ওৎ পেতে আছে সে ভাবনা আর গুলনারের ছিল না। সে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছিল দড়িখানা।

হাজার কলসী জল কেউ যেন ঢেলে দিল গুলনারের দেহে। অথবা দমবন্ধ করা অতল জলের তলে কেউ যেন বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে দিল গুলনারকে। আঁকুপাকু করা দম বন্ধ অবস্থায় কখন দড়ি থেকে হাত আলগা হয়ে গেল তার। যখন স্বাভাবিক স্রোতের টানে পৌঁছুল র‍্যাপ্ট তখন দেখা গেল কোমরে বাঁধা দড়ির জোরে রক্ষা পেয়েছে গুলনার। চৈতন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেই সে তাকাল পালমেরোর দিকে। লোকটি সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ধরা সেই বংশদণ্ডটি। চুল দাড়ি পোশাক পরিচ্ছদ ভিজে তাকে একজন জলদেবতাব মত মনে হল।

খুব কষ্ট হল?

আমি তো হাতের দড়ি ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস কোমরের দড়িটা বাঁধা ছিল।

তেমনি সামনের দিকে নিবদ্ধ চোখের তারা। অদৃশ্য শত্রুর আঘাতকে এড়াবার জন্য হাতে ধরা রয়েছে বিশাল দণ্ডখানা।

এবার তোমার ভয় ভেঙে গেল গুলনার।

অভয় তো তোমার কাছে শিল্পী।

একটু হাসল পালমেরো, এখন আমি শিল্পী নয় গুলনার। বরং বলতে পার ডাক্তার। প্রকৃতির রূপ দেখার সময় কোথা? নিখুঁত চোখ আর হাত চালিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

যে নদী বেয়ে ওরা 'ব্রাউক-উ' থেকে এসেছিল এ সে নদী নয়। তবে দু'টি নদীর সংযোগ ছিল কিছুদূর অব্দি। তারপর ভিন্নমুখী হয়ে গেছে।

স্রোতই ওদের র‍্যাপ্টখানাকে টেনে নিয়ে এল বহুদূর।

সন্ধ্যা নেমে আসার বেশ কিছু আগে পালমেরো রাতের আস্তানা নির্বাচন

করে তার র‍্যাপ্টখানা বেঁধে ফেলল। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সে দড়ি ধরে লাফ দেয় ডাঙায়। সঙ্গে সঙ্গে দড়িখানা একটা গাছ অথবা পাথরের গায়ে জড়িয়ে নেয়। যাতে করে প্রবল স্রোত ভেলাখানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

গুলনার ডাঙায় উঠে এল। জায়গাটাতে সবুজ ঘাসের জমি যেমন আছে তেমনি পেছনে আছে বড় বড় গাছের জঙ্গল।

সন্দেহের চোখে গাছের জটলার দিকে একবার তাকাল গুলনার।

পালমেরো মৃদু হেসে র‍্যাপ্টে নেমে গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে এসে গুলনারের পাশে দাঁড়াল।

যতক্ষণ আমার হাতে এই অস্ত্রটি আছে ততক্ষণ নির্ভয়ে তুমি থাকতে পার।

বড় বড় চোখ মেলে গুলনার বলল, তুকি সারারাত আমাকে পাহারা দেবে নাকি?

এই বন্দুকটা অকেজো করে রাখার জন্যেই কি সঙ্গে এনেছি?

বেশ, রাতগুলোকে আধাআধি ভাগ করে নিই এসো।

তুমি বন্দুক চালাতে জান নাকি?

আমার স্বামী ঢাকায় বিশহাজারী মনসবদারে উন্নীত হয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেই বন্দুক চালান শিখেছি।

তাহলে তো তোমাকে জাগিয়ে রেখে আমার ঘুমোনো ঠিক হবে না। মনসবদারের সঙ্গে কোনদিন দেখা হলে আমার শিরচ্ছেদ অবধারিত।

এতদিন পরে প্রাণখুলে হাসল গুলনার, দুজনেই জাগব। কথাটা না হয় গোপন থাকবে।

মুহূর্তে গভীর হল' পালমেরো, তা হয় না গুলনার। কতদিনে পৌছব, একেবারে পৌছতে পারব কিনা তার কোন ঠিক নেই। তোমাকে একটা আশা দিয়ে আমি নিয়ে চলেছি। সব দায়িত্বটুকু আমার ওপর ছেড়ে দাও।

ওরা দুজনে মিলে সামনের জঙ্গল থেকে বেশ কিছু শুকনো ডাল আর পাতাপত্র সংগ্রহ করে আনল। অল্প অল্প আগুনের শিখা ধিক ধিক করে জ্বলতে লাগল। জন্তু জানোয়ারেরা যাতে এই আগুনের শিখা দেখে সামনে এগিয়ে আসতে না পারে তাই এ ব্যবস্থা।

দুজনের কেউ কিন্তু ঘুমাল না, পাশাপাশি কত রাত্র বসে বসে গল্প করতে লাগল।

রাতের অরণ্যের অদ্ভুত একটা প্রাণ আছে। কোটি কোটি কীট পতঙ্গের মিশ্রিত ডাকে, জন্তু জানোয়ারের হঠাৎ আর্ত কণ্ঠে ডেকে ওঠার ভেতর অরণ্যলোকের বিপুল প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণা সপ্তমীতে বনের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল। শেয়ালরা ডেকে উঠল ঐকতানে। চাঁদকে যেন অভিনন্দন জানাল বনের একদল গায়ক। ভয়ের সঙ্গে আশ্চর্য এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল গুলনারের মনে। সে কথা বলে চলেছিল পালমেরোর সঙ্গে কিন্তু তার মনে হচ্ছিল সে যেন এই বাস্তব জগতের কেউ নয়। আরব দেশের গল্পে শোনা জীনদের কোন জাদুর জগতে তারা দুজনে এসে পড়েছে। পালাবার পথ নেই, কেবল প্রতীক্ষা। যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনায় তটস্থ হয়ে আছে সব কিছু।

দ্বিতীয় রাত তারা কূলে উঠল না। নদীর মাঝখানেই রইল। নদীর বিস্তার সেখানে কিছু বেশী কিন্তু স্রোতের টান তেমন বেশী নয়। নদীর মাঝে প্রকৃতির খেয়ালে মাথা তুলে আছে একটা শিলাস্তূপ। একেবারে লতাপাতাবিহীন মসৃণ একটি পাষাণ। তারই সঙ্গে বাঁধা হয়েছে র‍্যাপ্টখানা। ওরা সেই শিলাস্তূপের খাঁজ বেয়ে উঠেছে চূড়ায়।

এ যেন পৃথিবীর প্রাণীজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। যে দ্বীপে আশমান থেকে সহসা নেমে এসেছে দু'টি অলৌকিক জীব। অনন্ত আকাশ নীল। হিরক-খণ্ডের মত জলজল করছে নক্ষত্র। নীচে প্রবাহিনী পার্বত্য নদী। শিলাখণ্ডে পাক খেয়ে অদ্ভুত গান শুনিয়ে চলে যাচ্ছে। এ রাতের অবস্থান সত্যিই মায়াময়।

দুজনে গল্প করতে করতে আজ এই প্রথম নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতে পালমেরোর মনে হল কে যেন তাকে ধাক্কা দিলে। ততক্ষণে গুলনারও চীৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেক নীচের থেকে র‍্যাপ্টখানা একেবারে উঠে এসেছে পাহাড়ের চূড়ায়। তারই ধাকায় আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে দুজন।

গুলনার বিহ্বল, সে যেন অনন্ত জলধির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পালমেরো কিন্তু মুহূর্তে ঘটনাটি অনুমান করে নিয়েছে। সে প্রায় কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে গুলনারকে বসিয়ে দিল টলোমলো র‍্যাপ্টে। দড়ির সঙ্গে বেঁধে দিল তার কোমর।

প্রচণ্ড বান এসেছে।

দড়ি ছেড়না গুলনার, বলতে বলতে শিলাস্তূপের সঙ্গে জড়ানো র‍্যাপ্টের দড়িটা খুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাপ্টখানা বিদ্যুৎগতিতে উড়ে গেল সামনের দিকে। গুলনার পেছন ফিরে দেখতে পেল না পালমেরো র‍্যাপ্টের কোথায় রয়েছে।

এখানে নদীর গতি বড় বেশী আঁকাবাঁকা নয় তবে পাহাড়ী ঢল নামায় স্রোতের বেগ তীব্র হয়ে উঠেছে। র‍্যাপ্ট চলেছে তেজী আরবী ঘোড়ার মত। গুলনার দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে অনিমিষে সামনের দিকে চেয়ে রলে

আছে। সে যেন এক ঘোড়সওয়ার। মহাযুদ্ধের মাঝখানে অস্ত্র হারিয়েছে। প্রভুকে নিয়ে ছুটে চলেছে তার ঘোড়া। কোণ দিক থেকে তীর বা বল্লম এসে তার শরীরে বিঁধবে তা সে জানে না। কেবল সন্ত্রস্ত প্রাণটুকুকে নিয়ে পালাবার তাগিদ।

কতক্ষণ পরে ভোরের আলো ফুটে উঠল। স্রোতের তীব্রতা ধীরে ধীরে অনেকখানি কমে গেছে। মুহূর্তের জন্য গুলনার একবার পেছন ফিরে তাকাল। সে কই! পালমেরো কোথায়! একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় গুলনার থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর প্রায় সেই মুহূর্তে একটা হাত জলের দিকে বেরিয়ে আসা বিশাল একটা গাছের শেকড় ধরে ফেলল। র‍্যাপ্টের ভেতর ছলকে উঠল কিছু জল। কিন্তু র‍্যাপ্টটা থেমে গেল।

ঘাড় বেঁকিয়ে এতক্ষণে পালমেরোকে দেখতে পেয়েছে গুলনার। র‍্যাপ্ট বাঁধা দড়িখানা সে প্রাণপণে জড়াচ্ছে শেকড়ের সঙ্গে। একসময় অতিকষ্টে গাছের শেকড় ধরে নিজে উঠল ডাঙায়। তারপর কতক্ষণ গাছতলায় পড়ে রইল মূর্ছিতের মত।

এবার গুলনার উঠে দাঁড়াল। অনেক কষ্টে শেকড় ধরে সেও উঠল ওপরে। প্রায় অচৈতন্য পালমেরোর মাথাটাকে নিজের কোলে তুলে নিল। ভেজা ওড়না নিংড়ে হাতে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল পালমেরোর চোখে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই চোখ মেলে তাকাল পালমেরো। উঠে বসল। সমস্ত মুখখানা তার সাদা হয়ে গেছে। হাতের আর পায়ের পাতা কুঁকড়ে গেছে বহুক্ষণ জলের সংস্পর্শে থেকে।

গুলনারের সারা দেহ ভেজা তবু চোখের জল ধুইয়ে দিচ্ছিল তার গাল। সে সমানে পালমেরোর হাত পা ঘষে ঘষে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করছিল।

মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হল। পালমেরো রোদ্দুরের তাপে এখন বেশ সুস্থ! গুলনার সাবধানে র‍্যাপ্টে নেমে খাবার আনল। বাধা দিয়েছিল পালমেরো, সে নিজেই র‍্যাপ্টে নামতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কোন কথাই শোনেনি গুলনার।

খাবার পরে জোর করে পালমেরোকে ঘুম পাড়াল গুলনার।

ঘুম ভাঙল প্রায় অপরাহ্নে। গুলনার কতক্ষণ এই ঘুমন্ত মানুষটার মুখের দিকে চেয়েছিল। সে যে কেন চেয়েছিল, কি ভাবান্তর হয়েছিল তার মনে, সব কিছুই বৃষ্টিহীন শরতের টুকরো মেঘের মত সরে গেল।

স্থানটা পরিচ্ছন্ন। নদী এখানে প্রায় সমভূমিতে প্রবাহিত। একটি বিশাল গাছের তলায় ওরা বসেছিল। দূরে দূরে পাহাড়ের ধূমল চিহ্ন। জনহীন প্রান্তরে নির্মল সবুজ ঘাস। সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে নদীর দক্ষিণ তীরের অরণ্যে। গাছের ডালে পাতায় শেষ সূর্যের জলন্ত সোনা। ওপরে নীল আকাশ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু'চারখণ্ড সাদা মেঘ। নীলে, সোনায়, সবুজে, সাদায় প্রকৃতির কি দৃষ্টিলোভন সাজসজ্জা!

গুলনার সেদিকে নিষ্পলক চেয়েছিল। হঠাৎ পালমেয়ো চেঁচিয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে আনন্দ আর উত্তেজনা। গুলনার সহসা ফিরে তাকাল পালমেয়োর দিকে।

পালমেয়ো দক্ষিণ আকাশে হাতখানা প্রসারিত করে বলে উঠল, আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি এসে গেছি গুলনার। ঐ দেখছনা, সমুদ্রের পাখিরা এদিকে উড়ে আসছে।

গুলনার কপালে হাত রেখে দেখতে লাগল পাখিদের উড়ে আসা। সাদা সাদা পাখি ডানা মেলে উড়ে আসছে, আর এক একটি দল নদী তীরের গাছ ভরে বসে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে গাছে গাছে সাদা ফুলের সমারোহ।

ওরা যে গাছের তলায় আস্তানা নিয়েছিল সেই বিশাল গাছটির ডালপালাও সাদা সাদা পাখিতে ভরে গেল।

রাতে কিন্তু ক্লান্ত গুলনার ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে রইল পালমেয়ো। সারাদিন অনেকখানি ঘুমিয়ে সে ঝরঝরে হয়ে উঠেছিল। খাবার পরে সে জোর করেই গুলনারকে ঘুমিয়ে পড়ার আবেদন জানিয়ে নিজে বন্দুকহাতে বসে রইল।

ভোর রাতে স্বপ্ন দেখল গুলনার। নীল আকাশটা সমুদ্র হয়ে গেছে। বিকেলে সাদা সাদা ডানা মেলে ভেসে আসা পাখিদের মত শত শত নৌকো নীল সমুদ্রে ধবধবে সাদা পাল তুলে ভেসে আসছে।

পালমেয়ো বলেছিল, এগুলো মশলা দ্বীপের নৌকো। গুলনারের মনে হল সমুদ্রের বাতাসে সেই সব মশলার সুগন্ধ ভেসে এসে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বুক ভরে দিচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল গুলনারের। সে উঠে বসল ঘাসের জমিতে। পুব আকাশে জলজল করছে শুকতারা। সমুদ্র থেকে বড় মিষ্টি একটা হাওয়া বয়ে আসছে।

গভীর অরণ্য পেরিয়ে, দৈত্যের মত শিলাখণ্ডের আঘাত এড়িয়ে অবশেষে ওরা দক্ষিণবাহিনী নদীপথ ধরে চতুর্থ দিনে এসে পৌঁছল নদী মোহনায়। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ তবু গুলনারের মনে জলছে আশার আলো। পালমেয়োর দু'টি হাত ক্ষতবিক্ষত তবু তার মনে পরম শান্তি, সে গুলনারকে নির্বাসন-উপত্যকা থেকে বের করে আনতে পেরেছে। তার দেশবাসী দস্যু ডিয়াগো-ডা-সা-এই সম্রান্ত যুবতীর যে ক্ষতি করেছে তার সামান্যকিছু পূরণ যদি সে করতে পারে।

পেছনে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়, সামনে সমুদ্র। মোহনার মুখে ছোট ভেলাখানা বেঁধে দুজনে চেয়ে আছে সীমাহীন সমুদ্রের দিকে। ঢেউ উঠছে, ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে তটে। হাজার পাখি ডানা মেলে ভেসে উঠছে বাতাসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঢেউয়ের মাথায়। সূর্যোদয় থেকে

চোখে আশার আলো জেলে বসে থাকে দুজনে, সূর্যাস্তের পর নিভে আসে সেদিনের মত সব উদ্যম।

এমনি করে কেটে গেল কতগুলো দিন আর রাত। একদিন ভোরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাদের মনে হল দিগন্তে কোন একটি জাহাজের সাদা পাল জেগে উঠছে। ওরা চীৎকার করে ডাকতে লাগল। হাত তুলে কাপড়ের টুকরো উড়িয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভুল ভাঙল ওদের। যাকে জাহাজের পাল বলে ভ্রম হয়েছিল তা দিগন্তে জেগে ওঠা শরতের একখণ্ড সাদা মেঘ ছাড়া কিছু নয়।

উত্তেজনার শেষে গভীর অবসাদে ভরে উঠল ওদের মন।

সহসা গুলনারের মনের মধ্যে কি এক ভাবান্তর ঘটে গেল। সে পালমেরোর হাত ধরে বলল, চল ফেরা যাক।

অবাকবিস্ময়ে পালমেরো তার দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। এক সময় শান্ত গলায় বলল, উৎসের দিকে ভেলা চালিয়ে তো ফেরা যাবে না গুলনার, ফিরতে গেলে ঐ পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে জঙ্গল ভেদ করে যেতে হবে।

আমি যেতে পারব পালমেরো, তুমি সঙ্গী থাকলে কোথাও যেতে আর আমার কোন বাধা নেই।

দেখা গেল পাহাড়ের ওপর একটি রমণীকে হাত ধরে টেনে তুলছে একটি বলিষ্ঠ পুরুষ।

হয়তো এখন নির্বাসন-উপত্যকায় ডাক্তার পালমেরোর উঠোনে রোগীরা ভীড় করে এসেছে। তাদের পরীক্ষা করে ওষুধের নির্দেশ দিচ্ছে পালমেরো। গুলনার ডাক্তারের নির্দেশ মত রোগীদের হাতে তুলে দিচ্ছে লতাপাতা, গাছগাছালি।

এরপর দিন গড়িয়ে দিনান্ত আসবে। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাতে হাত রেখে গুলনার আর পালমেরো চেয়ে থাকবে সৌন্দর্যের প্লাবনে ভাসমান অস্তসূর্যের দিকে। আর ঠিক সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে নীশাপুরের কবি উমর খইয়ামের একটি রুবায়ি গুলনারের কানে বাজতে থাকে:

- রুজী কি গুযশ্‌ত-অস্ত্‌, অজ্‌ উ ইয়াদ্‌ মকুন্‌।
ফরদা কি নিয়ামদ অস্ত্‌, ফরিয়াদ্‌ মকুন্‌॥
বর্‌ নামদ ব গুযশ্‌ত বনিয়াদ্‌ মকুন্‌।
হালী খুশ্‌ বাশ্‌ ব উমর্‌ বর্‌ বাদ্‌ মকুন॥

যেদিন চলে গেছে তাকে আর স্মরণে এনো না। যে ভবিষ্যৎ এখনো আসেনি, তার জন্যে দুঃখ কর না। অতীত আর ভবিষ্যতের ওপর স্থাপন কর না তোমার জীবনের ভিত্তি। বর্তমানকে নিয়ে সুখে থাক, নষ্ট হতে দিও না তোমার সুন্দর জীবন।

সকরুণ বেণু

আমরা অনেক অনেক পথ বোটে করে ফিরছি। কত বাঁক, কত ছোট ছোট খাল এসে মিশেছে নদীতে। এখন ভাটার নদী। খাল থেকে হুহু করে জল নেমে আসছে। শেয়ালকাঁটার ঝোপে ফুল ফুটেছে। আমি বিশুদার কাছে গলুইএর ওপর বসে আছি। বিশুদার হাতে হাল। আমি বিশুদাকে বিরক্ত করছি।

ওগুলো কি পাখি উড়ে গেল বিশুদা ?

পানকৌড়ি।

বোকার মত আবার বললাম, কোথায় উড়ে যাচ্ছে ?

বিশুদা সত্যি কত জানে। অমনি বলল, কদমা পাড়ার ঝিলে।

আবার জানতে চাইলাম, আসছে কোথা থেকে ?

বিশুদা একটু থেমে গেল। হাতে ধরা হালটায় দু'একটা মোচড় মেরে নৌকোটাকে বাঁক পের করে আনল। সিধে নদীতে নৌকো চলছে এখন। বিশুদা হালে শুধু হাত ছুঁইয়ে বসে আছে। এবার আমার কথার খেই ধরে বলল, অত আন্দাজ কি করা যায় দিদি। তবে মনে হয়, ওরা স্যাড়ার বিল ছেড়ে আসছে। ঠা ঠা রোদ্দুরের দিনে বিলের জল সুয্যি ঠাকুর চোঁ চোঁ করে শুষে খেয়ে নেয়। তখন ওটুকু জলে কি আর পাখপাখালি থাকতে পারে। উড়ে যায় কদমা পাড়ার ঝিলে।

ওখানে বুঝি অনেক জল ?

নন্দদের পুকুর ছিল ওটা। তিনপুরুষ আগে কদমা প্রজারা কেটেছিল। অনেক গভীর করেছিল ঝিলটা। তাই সম্বচ্ছর জল থাকে।

শেয়ালকাঁটার ঝোপ, হোগলার বন, হাবুলি গাছের লাল সাদা ফুলের খবর বিশুদাই আমাকে দিয়েছে। নদী জুড়ে জাল পেতেছে মালো-পাড়ার জেলেরা। হারের মত দড়িতে মাছ গেঁথে শুটকি করছে রোদ্দুরে।

একটা চরের ওপর মালোপাড়া। বিশুদা ঠেকিয়ে দিলে নৌকো। মা, মাসুমণি আর মেসাই সাবধানে নেমে গেল। এই চরে আজ দুপুরে পিকনিক সেরে হাজিপুরে ট্রেন ধরে ফিরব।

মায়েরা চলল মালোপাড়ার দিকে মাছ কিনতে। খুকি একটা গল্পের বই

পড়ছিল। সে বইটার আকর্ষণ হঠাৎ কাটিয়ে উঠে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নৌকোর কাণায় দাঁড়িয়ে বলল, হুর্‌রে। তারপর হনুমানের মত লম্বা এক লাফ মেরে চরে নেমে পড়ল।

রাজর্ষি এই অব্দি পড়ে উলুর দেওয়া ডায়েরির বাঁধানো খাতাখানা বন্ধ করল। উলু তাকে আজই এই ডায়েরিখানা উপহার দিয়েছে। স্মৃতির সুধায় ভরা ডায়েরির পাতাগুলো। সুধা না হলাহল? সবই মিলেমিশে একাকার। মন্থনে শুধু অমৃতই ওঠে না, গরলও উঠে আসে।

গঙ্গার ওপারে দিনান্তের ছবি ফুটছে আকাশে। জল বইছে। দুটো নৌকো পাল তুলে চলেছে। ওরা কতদূরে যাবে? গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে? তারপর? তারপর? দু'টি ভিন্ন দিকে হয়ত ভেসে চলে যাবে ঝড়ের হাওয়ায়, স্রোতের টানে।

এই গঙ্গার উৎস মুখেই তো একদিন সুদীপা মাসী আর উলুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল ঋষি। উলুই প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছিল।

ঋষি, ঋষি।

নির্জন গোমুখে তখন এমনি সূর্যাস্তের আয়োজন চলছিল। প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছিল চরাচর। বাবা মার সঙ্গে রাজর্ষি গোমুখ দেখে ফিরছিল। আর ঠিক সে সময় ওপর থেকে নামছিল উলু তার মায়ের সঙ্গে।

ঋষির নাম ধরে ডাকছিল উলু। পতাকার মত হাত নাড়ছিল সে।

ঋষি চিনতে পেরেই হাত নাড়তে লাগল।

বাবা বললেন, মেয়েটি কে ঋষি?

আমরা এক ক্লাশে পড়ি বাবা, তবে সেক্সান আলাদা। খুব নাম ওর নাচে গানে। পড়াশোনাতে ও ভাল।

সুদীপা মাসী উলুর সঙ্গে নেমে এসে ঋষিদের মুখোমুখি হলেন।

দু'টি পরিবারে সেদিনই আলাপ হলো। মা বাবাকে ওখানে বসিয়ে রেখে ঋষি ওদের নিয়ে গেল গুহামুখ দেখাতে। গুহামুখে সাদা বরফ জমে আছে। সেই বরফ গলা জল বেরিয়ে আসছে প্রবল বেগে।

উঃ দারুণ ঠাণ্ডা, জমে গেলাম একেবারে।

মুখে বলছে উলু, কিন্তু হাত ডোবাচ্ছে জলে।

ঋষি জলের ওপর জেগে থাকা একটা বোল্ডারের মাথায় লাফ দিয়ে উঠে বলল, স্রোতটা কেমন পাথরটাকে পাক দিয়ে যাচ্ছে দেখ।

অমনি উলুরও ওখানে যাওয়া চাই। ঋষি হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটা ঝাঁকুনিতে ওকে তুলে নিল।

ভাগীরথী পিকের ওপরটা তখন সিঁদুর মেখে টুকটুক করছে। ওরা হাত ধরাধরি করে সূর্যাস্তের সেই সুন্দর ছবিটা দেখতে লাগল।

মা বাবার হাতছানি আর সুদীপা মাসীর কড়া হুকুমে সেদিন ওরা বোল্ডারের ওপর থেকে নেমেছিল।

গোমুখের নিচ থেকে ওপরের আসল পথটা খুঁজে পাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোর আশেপাশে ছোট বড় গড়ানে পাথরের টুকরো ছড়ানো। অসাবধানে পা পড়লেই পাথরের নুড়িগুলোর সঙ্গে গড়িয়ে যেতে হবে নিচে। অবশ্য গড়াতে গড়াতে বোল্ডারের গায়ে ঠেকে গেলে কিছুটা রক্ষে।

বেশ খানিকটা অঞ্চল জুড়ে এই বোল্ডারের রাজত্ব হওয়ায় পথ চেনা ভারী মুশকিল। পাথরের চাঁইগুলোর মাথায় মাথায় চূড়া করে বড় থেকে ছোট পাথরের টুকরো সাজিয়ে রেখে গেছে কারা। ঐ চূড়াগুলো দেখেই আন্দাজে ভুলভুলাইয়ার পথটা পেরিয়ে আসতে হবে।

ঋষি সেদিন সবাইকে ধরে ধরে বিপদজনক জায়গাগুলো পার করেছিল।

খালি উলু বলেছিল, থাম্, তোকে ওস্তাদি করে আমাকে আর ধরতে হবে না, আমি নিজেই পেরিয়ে যেতে পারব।

বোল্ডারের চিহ্ন দেখে উলু বলে, এদিকে।

ঋষি বলে, ক্ষেপেছিস, ওদিকের পথ ধরলে আবার হড়বড়িয়ে নামতে হবে নদীর ধারে। আয় আমার সঙ্গে, ঠিক পৌঁছে দেব লালবাবার ডেরায়।

উলু কিছু সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে অল্প বয়স থেকেই মায়ের কাছে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখেছে। তবে সে এমন গোঁয়ার নয় যে কারু পরামর্শ কানে তুলবে না। চারদিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিল উলু। তার মনে হলো, ঋষির আন্দাজটাই ঠিক। অমনি সবার সঙ্গে সেও ঋষিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল।

ওরা যখন লালবাবার আশ্রমে এসে পৌঁছল তখন গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে শনশনিয়ে বইল হাওয়া, ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। টিনের চালের তলায় একটা লম্বা দাওয়ার চটের ওপর বসল সবাই হাঁটু মুড়ে। বহু যাত্রীর ভিড়ে জায়গাটাতে পা ছড়িয়ে বসার উপায় নেই।

গঙ্গোত্রী থেকে সারা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে ওরা।

ঋষি বলল, রাত ন'টার আগে ওদিকের বন্ধ ঘরগুলো খোলা হবে না। ওখানেই আসমুদ্র হিমাচলের মানুষের একত্রে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

ওদিকে শরীরের কষ্ট ভুলে সদানন্দবাবু, সুদীপা চৌধুরী আর সদানন্দের স্ত্রী ললিতা বোস গল্পে মেতে উঠেছেন। সদ্য দেখে আসা যমুনোত্রীর গল্প হচ্ছে।

সুদীপা বলছেন, মেয়ে কিছুতেই ঘোড়া নেবে না। অনেক বুঝিয়ে বললাম, বেশ, চড়তে হবে না, খালি সঙ্গে যাবে। মেয়ে অমনি বলে, মিছিমিছি এতগুলো টাকা গুনবে? বললাম, সে আমি বুঝব।

ললিতা বললেন, ঋষিটাও তাই, কিছুতেই ঘোড়া নিল না।

সদানন্দ বললেন, আমি কখনও ওদের ওপর কিছু চাপাই না। এ বয়সের ধর্মই হলো চাপিয়ে দেওয়া যা কিছু তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

সুদীপা বললেন, এখন ওদের ভেতর স্বাধীন ভাবনার বিকাশ ঘটছে। ওদের আত্মসম্মানে আঘাত না দিয়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করাই ভাল।

ললিতা বললেন, অনেক সময় পারিবারিক কোন পরামর্শে ঋষিকে আমি জড়িয়ে ফেলি।

সুদীপা বললেন, আপনার সঙ্গে আমি একেবারে একমত। আমিও তাই করি। তবে আমাদের আচরণ এমন হবে যাতে ওদের সুন্দর একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সদানন্দ বললেন, সবই ঠিক। আমাদের মত কিছুটা সচেতন যারা তারা এসব কথা ভেবেই চলি। তবু কঠিন এ পথে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় মাঝে মাঝে।

মাথা নেড়ে সমর্থনের হাসি হাসলেন সুদীপা।

ঋষি আর উলু ততক্ষণে ব্রহ্মচারীদের রসুইখানায় ঢুকে পড়েছে। বিরাট হাণ্ডায় চা বসান আছে। তার থেকে চারটে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে চা ঢেলে নিয়ে ফিরে এল বসার জায়গায়।

একেবারে গরম ধোঁয়া উঠছে।

উলু দুটো গ্লাস ঋষির বাবা মায়ের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নিন মেসোই, ধরুন মাসিমণি। কড়া শীত, এক এক মগ চায়ে জল হয়ে যাবে।

ততক্ষণে ঋষি সুদীপার হাতে চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছে। এবার একটিমাত্র গ্লাশ শূন্যে তুলে বলল, এটা কে নেবে?

উলু বলল, তুই খা শীতকাতুরে, আমার চা আমি আনছি।

ঋষি বলল, আর বলতে হবে না মেমসাহেব, গোমুখে জল ছুঁতে গিয়ে দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল না?

তুই থাম ভগীরথ, আর শাঁখ বাজাসনে। আয়, পরীক্ষা হয়ে যাক কে শীতকাতুরে। চল, কে পারে এই বর্ষার ভেতর দিয়ে গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে। পারবি? বল্ পারবি?

চল্।

দুজনেই ছুটতে যাচ্ছিল, সদানন্দ বললেন, মাদার, আমাদের একখানা করে বিস্কুট না দিলে যে জমছে না।

দিচ্ছি মেসাই, বলে উলু বিস্কুট খুঁজতে লেগে গেল। সেই ফাঁকে ঋষি ছুটল রসুইখানায় আর এক গ্লাশ চা আনতে।

এবার দু'গ্লাশ চা নিয়ে দুজনে বসে গেল পিঠোপিঠি হেলান দিয়ে।

সদানন্দবাবুরা বসে বসে গল্প করছেন এক জায়গায় আর এরা দুই বন্ধুতে বসেছে একটু তফাতে।

লালবাবা পুজোয় বসেছেন। যাত্রীরা সেই দাওয়াব ওপর এদিক ওদিক জটলা করে বসেছে যে যার সংসার আগলে।

গায়ে ভস্ম মেখে ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক এঁকে স্বল্পবাস লালবাবা বসেছেন পুজোয়। দাওয়ার একধারে পুজোর বেদী। নানা দেবদেবীর প্রতিকৃতি। মা গঙ্গাই বেদীর মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মচারীরা মন্ত্রপাঠ করছেন। এগিয়ে দিচ্ছেন আরতির উপকরণ। যাত্রীরা কেউ কেউ হাত জোড় করে বসেছে। ধূপ ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পূজার ফুল, পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা ব্রহ্মকমল, সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেদীতে।

বেদীর সামনে কাঠের একটি সছিদ্র বাক্স। ওতে যাত্রীরা স্বেচ্ছায় যা কিছু দান করে। দু'বেলা শুধু তরল খিচুড়ি প্রসাদ। যেদিন জোটে সেদিন খিচুড়িতে দু'চার কুচি আলু কিংবা শাকপাতা ফেলে দেওয়া হয়। তাছাড়া যে যখন পারছে লতাপাতা মেশানো ফুটন্ত চা গ্লাশ ভরে নিয়ে আসছে।

এসবের জন্যে কোন পয়সা দিতে হয় না। কেবল ঐ বাক্সে স্বেচ্ছা-দান করে যাত্রীরা কৃতার্থ হয়।

ঋষি বলল, কেউ যদি ওখানে কিছু না দিয়ে শুধু খেয়ে পালায়?

উলু গভীর বিশ্বাসের সুরে বলল, পাপ হবে।

জানিস, তুই যখন বাবাকে বিস্কুট দিচ্ছিলি আর আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম তখন এক ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখলাম।

কি কাণ্ড রে!—উলু ঋষির গা ঘেঁষে এল। কৌতূহল তার চোখেমুখে উপচে পড়ছে।

আমি বেমালুম কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

আরে ভনিতা রেখে বলে ফেল না।

রান্নাঘরের ওদিকে উঁচু গলার কথাবার্তা শুনে উঁকি দিলাম। দেখি লালবাবা একটা ছেলেকে ধমক দিয়ে বলছেন, কি বললে, গঙ্গার জল এখানে ঘোলাটে, ময়লা? বেরিয়ে যাও আমার ডেরা থেকে। গঙ্গামাঈএর নিন্দা! ভাগো এখান থেকে।

ছেলেটার তখন হয়ে গেছে। এই বৃষ্টিতে, অন্ধকারে যাবে কোথায়। আমি পেছন থেকে ওকে ইঙ্গিত করে বললাম, বাবার পায়ে পড়ে যাও।

ও তাই করে রক্ষে পেয়ে গেল। না হলে হয়েছিল আর কি।

ঋষির পিঠে একটা ঘুঁষি মেরে উলু বলল, দারুণ বুদ্ধি দিয়েছিস তো তুই। সত্যি ছেলেটার কি হত রে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে, বৃষ্টিতে, কনকনে ঠাণ্ডায়— ভাবতেই পারছি না। হ্যাঁরে কোন্ ছেলেটা?

ঐ যে তিনজন বসে আছে হাত জোড় করে। ডান দিকের ছেলেটা। মনে হয় তিন বন্ধুতে এসেছে।

অমনি উঠে গেল উলু। দাওয়ার ধারের খুঁটো ধরে উঁকি মেরে তিন মূর্তিকে দেখে ফিরে এল।

বেশ বড় ছেলে রে। তোর মতই লম্বাটম্বা হবে, তবে তোর আমার চেয়ে অনেকটা বড়।

ঋষি বিজ্ঞের মত বলল, বয়েস না হলে কি একা একা বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় কখনো।

উলু বলল, আমার মার সঙ্গে ঘুরতে খুব ভাল লাগে। একটুও খিচ খিচ করে না। যদি আমি কোন একটা ঘর-সাজানোর জিনিস কিনব বলি, অমনি মা বলে, কিনতে পার, তবে ভাল করে একটু ভেবে নাও, ঘরের কোন জায়গাটায় সাজিয়ে রাখবে।

ঋষি বলল, আমার বাবাও প্রতি ছুটিতে বাইরে যাবার সময় বলে, ঋষি, এবার কোথায় যেতে চাস ঠিক করে আমাকে বলবি।

ঠিক করার মানে বুঝলি? আমাকে সে জায়গাটা সম্বন্ধে পড়াশোনা

করে আর খোঁজখবর নিয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে। রেস্ট হাউসটাউসে চিঠি লিখে আমাকেই যোগাযোগ করতে হবে।

উলু বলল, এ ব্যাপারে আমার মা নিজেই যোগাযোগ করে। জায়গাটা ঠিক হলে আমাকে জানিয়ে দেয়। যতদিন যাওয়া না হচ্ছে, আমি সে জায়গাটা নিয়ে খালি ভেবেই যাই।

চল্ চল্, আরতি শেষ হয়ে এল।

ঋষি আর উলু এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল। ওদের মা বাবারা একেবারে লালবাবার ডানদিকে বসে আরতি দেখছে।

শেষে সকলে প্রণাম করল। গঙ্গামাঈ-এর জয়ধ্বনি উঠল। ঋষিরাও সে ধ্বনিতে যোগ দিল।

উলু ঋষিকে ঠেলা দিয়ে বলল, ঐ যে দেখ, সেই ছেলে তিনটে কেমন গলা ফাটিয়ে গঙ্গামাঈকী বলছে।

কলকাতায় স্লোগান হাঁকার অভ্যেস আছে তো।

বৃষ্টির ভেতরেই দাওয়ায় গুটিশুটি মেরে বসে গরম গরম খিচুড়ি খেল সবাই।

রসুইখানার পাশে ঝর্ণার জল রবারের পাইপের মুখ দিয়ে পড়ছিল। ঋষি আর উলু বড়দের কোন বারণ না শুনে এঁটো পাতা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

উরেব্বাবা, কামড়ে দিলে যেন।

একটুখানি বাইরের হাওয়া বৃষ্টিতে বেরিয়ে হাড়ে করাত চালান কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল।

দুজনে দুজনের হাতের তেলো ঘসে ঘসে গরম করতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে সিঙ্গার মেশিন চালাতে চালাতে হিহি হিহি করে কাঁপতে লাগল, আবার দুজনে দুজনের করুণ অবস্থা দেখে হিহি করে হেসেও উঠল।

ঠিক সাড়ে আটটায় গণ-শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলে গেল। উলু আর ঋষির কাছে সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা আর রোমাঞ্চ।

নিচু দরজায় মাথা হেঁট করে কাঠের ঘরে ঢুকতে হলো সবাইকে। তিন কামরার ঘর। একটি বড়, দু'টি ছোট। এবার সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ নিজের নিজের দলবল নিয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল কাঠের মেঝেতে। গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে হচ্ছে। এক চিলতে জায়গাও ফাঁক রাখার উপায় নেই। এক একজন শুচ্ছে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লালবাবা ব্রহ্মচারীর হাত থেকে একটা করে কম্বল নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তার দিকে।

কম্বলদান শেষ হলে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন বাইরে।

দুই মায়ের মাঝে উলু। বিপরীত প্রান্তে সদানন্দ আর রাজর্ষি।

উলু ফিসফিসিয়ে বলল, এ কম্বল আমি গায়ে দেব না মা। গা কুটকুট করবে।

আমরা তো গায়ে দিয়েছি মা। যিনি এই দুর্গম জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর সম্মান রাখতে হয়।

সারা ঘরে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের লোক। যে যার ভাষায় কথা বলে চলেছে। ঘরের ভেতর জানলা নেই। তিন চারটে ছোট ছোট ফুটো আছে মাত্র। ভেতরটা বেশ গরম। বাইরে যে এত ঠাণ্ডা তা মালুমই হয় না।

ঘর এখন অন্ধকার। আস্তে আস্তে কথা কমে আসছে। ঋষি চুপি চুপি বলল, জানিস উলু, জলপিপি এখন ডাঙায় সিঁধিয়েছে। ঐ জায়গাটাই ম্যানেজ করে নিয়েছে।

উলু বিস্ময়ে বলল জলপিপি! পরক্ষণেই বলে উঠল বুঝেছি, বুঝেছি, সেই হিপি। সুদীপা বললেন, হিপি আবার কোত্থেকে এলো রে?

তোমরা কিছু দেখনা মা। আশ্রমে ঢুকতে প্রথম যে ঘরখানা পড়ে তারই বন্ধ দরজার সামনে গেড়ে বসেছিল। একজন ব্রহ্মচারীকে বলেছিল, ঘরখানা আমাকে রাতের মত দিতেই হবে।

তারপর?

ব্রহ্মচারীজী কোন উত্তরই দেন নি। শুধু হাত নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন।

রাজর্ষি অমনি বলল, কিছু বোঝেন নি ব্রহ্মচারীজী। হিপি, মুখে যেরকম সিঙাড়া পুরে ইংরাজী বুকনি চালাচ্ছিল তা বোঝে কার সাধ্যি।

উলু বলল, থাম, হিপিরা বুঝি সিঙাড়া খায়?

ওরা সর্বভুক। সিঙাড়া তো সিঙাড়া, আরসুলা পেলেও খাবে।

নাকে কান্নার আওয়াজ তুলল উলু, দেখছেন মাসুমণি, কেমন ভয় দেখাচ্ছে ঋষি।

ললিতা বললেন, রাত হল, এখন ওসব কথা থাক। বেচারা আরসুলার নামে ভয় পেয়ে গেছে।

ঋষি অমনি বলল, অন্ধকারেই তো ওরা অভিযান চালায়। জানি না, কত অক্ষৌহিনী লালবাবা পুষে রেখেছেন। তবে সব গোরা সৈন্য। শীতে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে।

কেন বেচারাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বলতো?

ওদের ভয় কি মা, ওরা তো কামড়ায়না, সুযোগ বুঝে একটুখানি চেটে নেয় মাত্র।

উলুর গা শিরশিরিয়ে উঠল। সে আর কথা না বাড়িয়ে লালবাবার দেওয়া কম্বলখানা টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিল।

রাত বাড়ছে। নেড়া পাহাড় আর বরফের পাহাড়ে ঘিরে আছে চারদিক। ঘরের ভেতরে এতগুলো মানুষ অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি থেমে গেছে। কারণ, অদূরে ছুটে চলা কিশোরী গঙ্গার পায়ের নূপুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ভোরবেলা উঠে মুখ দেখা গেল না সূর্যের। পাতলা মেঘের কুয়াশায় চরাচর ঢাকা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ভাগ্যিস কাল গঙ্গোত্রী থেকে এত পথ হেঁটে এসেও লালবাবার ডেরায় থেমে থাকেনি। আরও তিন কিলোমিটার পথ এগিয়ে গিয়ে গোমুখ দেখে এসেছে। বড় কষ্ট হয়েছিল ঠিক, কিন্তু আজ ভোরবেলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে আর দেখা হত না। যারা অপেক্ষা করেছিল, এখন তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে শুধু বেরসিক মেঘের কাণ্ড কারখানা দেখছে।

সদানন্দ বললেন, গোমুখ তো দেখা গেল, এখন গঙ্গোত্রী ফিরি কি করে। সরু রাস্তা, জলে ভেসে যাচ্ছে। নুড়ি পাথর ওপরের পাহাড় থেকে নিশ্চয় গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পথে।

রাজর্ষি বলল, তুমি আবার ভয় পাইয়ে দিচ্ছো মাকে। ও কিছু হবে না, ঠিক পাশ কাটিয়ে ডিঙিয়ে চলে যেতে পারব।

সুদীপা বললেন, তা যাওয়া নিশ্চয় যাবে, কিন্তু মেঘ না সরলে দু'হাত দূরের পথ যে দেখা যাবে না।

পথ দেখার জন্যে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। আকাশ একটু চকচকে হতেই গায়ে রেইন কোট চড়িয়ে বেরুল সবাই। রাজর্ষি আর উলু গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল।

মায়েরা মুখে যতই বলুন, ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে, এক্ষেত্রে পদে পদে সাবধান না করে স্বস্তি পেলেন না।

একটু অসাবধানে নিচে গড়িয়ে পড়লে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে।

চিড়বাসে এসে কোমল গয়দের মত এক টুকরো রোদ দেখা গেল। বহু নিচে সুরধুনি বয়ে চলেছে। তার কূলে খানিক জায়গা জুড়ে চিড় পাইনের

বন। বনের সবুজে সোনালী মাখনের মত রোদ্দুর খেলছে। একটু এগিয়ে পাওয়া গেল দু'টি ভূর্জ গাছ।

উলু আর রাজর্ষি ভূর্জগাছের পাশে গিয়ে বালি কাগজের মত হাল্‌কা ব্রাউন বেশ খানিকটা ছাল তুলে নিল।

এবার উলু ঋষির দিকে ফিরে মুরুব্বির গলায় বলল, বল্ তো, রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ভূর্জ পাতার কথা আছে?

ঋষি আকাশের দিকে আধখানা চোখ মেলে ভাবতে লাগল।

কিছু সময় পরে উলু বলল, হবে না। হলে অনেক আগেই হয়ে যেত। তুই চাতক নয় যে তোর ডাকে মেঘ ঘনিয়ে উঠবে।

হেরে গেছি, বল্।

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গানের কলিটা মনে পড়ছে?

একটু ভেবে নিয়ে রাজর্ষি বলল, 'ভূর্জ পাতায় নব গীত কর রচনা'।

যেন তার নিজেরই জয় হয়েছে, এমনিভাবে উলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ঋষির হাত ধরে দোলাতে লাগল।

হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, কিন্তু দেখ, ভূর্জপাতা তো অশথ পাতার মত, ওতে গীত রচনা হবে কি করে!

রাজর্ষি বলল, এই বল্কলেই লেখা হত।

উলু বলল, গঙ্গোত্রীর দোকানে এই বাকলেই তো জিলিপি খাওয়ায় রে।

দু'বন্ধুতে কল কল কথা বলে চলেছে, পেছনে প্রায় নির্বাক হেঁটে আসছেন তিনজন। ওঁরা চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন, তবু উপভোগ করছেন ছেলে মেয়েদের সকৌতুক হাসি তামাসা। মনে পড়ে যাচ্ছে নিজেদের ছেলেবেলার কথা। তখন কো-এডুকেশান ছিল ঠিক কিন্তু ছেলেমেয়েরা এমন বন্ধুর মত হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াত না। মেলামেশার ক্ষেত্রে কোথায় যেন বেশ খানিকটা ব্যবধান ছিল। ভালমন্দের বিচার বাদ দিয়ে ওঁরা এখন দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে নিজেদের কৈশোরকে খুঁজে পেয়ে ভারী খুশী।

সদানন্দ সবার পেছনে। একবার চোখ তুলে সবাইকে দেখে নিচ্ছেন। রাজর্ষি বয়সের তুলনায় একটু বেশি বাড়ন্ত। গলার স্বরে প্রথম তারুণ্যের পরিবর্তন এসেছে। বেশ কয়েক বছর আগে ডিপথেরিয়ায় এই ছেলেকে নিয়েই যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল। তখন স্কুলে ভর্তি হবার পালা। কিন্তু অসুখের ব্যাপারে পিছিয়ে গেল একটা সেসান।

রাজর্ষি সারাক্ষণ বেশ আনন্দে থাকতে ভালবাসে। স্বভাবে বন্ধু বৎসল, পরোপকারী।

প্রায় তিনটে নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল সেই জলধারার পাশে, যা ওপরের পাহাড় থেকে নেমে এসে পথ ভাসিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গার ধারার সঙ্গে ধারা মিলিয়েছে। পথের ওপরেই এখানে বড় বড় বোল্ডার এসে পড়েছে। জল, হাততালি পাওয়া নর্তকীর মত পাথরের চারপাশ ঘুরে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে।

কি সুন্দর নাচের একটি মুদ্রায় দাঁড়াল উলু। মসৃণ একটি বোল্ডারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। আর একটি পাথরের ওপর বসে তাকে অবাক চোখে দেখছে রাজর্ষি। এ যেন অন্য কেউ। একে রাজর্ষি চেনেনা। পায়ের, হাতের, সারা দেহের, বিশেষ করে চোখের কয়েকটা কাজ আপন মনে করে গেল উলু।

রাজর্ষি স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছে উলুর নাচ, শুনেছে তার গান। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সময় হাততালিতে ফাটিয়েছে অডিটোরিয়াম। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চটি প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো। মাথার ওপরে মেঘ জমে আছে। কয়েকটা চিড়গাছ পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছে নিচে। তারা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে উলুর নাচ দেখছে। ঝর্ণার জল উলুর নাচের ছন্দে তাল মিলিয়েছে।

রাজর্ষির মনে হল, মেয়েটি তার অতি পরিচিত সতীর্থ নয়, কোন মানবীও নয়, যেন স্বয়ং গঙ্গা সুরলোক থেকে নেমে আসছেন নৃত্যছন্দে। সদানন্দরা এসে গেলেন। তাঁরাও বসে গেলেন এক একটা পাথরের ওপর। ঝর্ণার জল হাতে তুলে মুখে দিলেন। ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেল।

ততক্ষণ বোল্ডারটার ওপরে বসে পড়েছে উলু।

ললিতা বললেন, সুন্দর তোমার নাচের ভঙ্গী, আগে তো কখনও দেখিনি। থামলে কেন?

আমি আপনাকে নাচ দেখাব মাসুমণি। আগামী মাসে বাগেশ্বরীর প্রোগ্রাম আছে শিশির মঞ্চে।

সদানন্দ বললেন, আমি বুঝি বাদ পড়ব?

আমার মা বাদ না পড়লে আপনারা কেউ বাদ পড়বেননা।

সদানন্দ সহাস্তে সুদীপার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন; আপনার মেয়ে কিন্তু যথার্থ মাতৃভক্ত।

সুদীপাও হেসে উত্তর দিলেন, তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ললিতা বললেন, উলু আমাদের ভারি গুণের মেয়ে। যেমন হাসিখুশী, আসর জমানো, তেমনি আবার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।

ঋষি কি কম নাকি। ও. যেভাবে আমাদের সুবিধে অসুবিধেগুলো দেখল তাতে ওকে অন্তর থেকে আশীর্বাদ না করে পারা যায় না। ওর স্বভাবের ভেতরেই মানুষের উপকার করার ইচ্ছেটা রয়ে গেছে।

ছেলের সুনামে খুশী হয়ে উঠলেন ললিতা। বললেন, আশীর্বাদ করুন ভাই, ছেলে যেন সবার কাছ থেকে ভালবাসা পায়।

ঋষি বলল, আচ্ছা, তুই একটা গান শোনা আমাদের। না হয় নাচতে হবেনা।

এতটা পথ হেঁটে এসে দম পাব?

খুব পাবি। জানেন মাসীমা, ও আমার আগে আগে এসেছে। মেয়েদের ভেতর দৌড়ে ওর সেকেণ্ড প্রাইজ বাঁধা।

সুদীপার সে খবর আজানা নয়। তাই তিনি একটুখানি হেসে তাকালেন ঋষির দিকে।

সদানন্দ বললেন, দ্বিতীয় কেন? ফার্স্ট প্রাইজ পেতে বাধা কোথায়?

রাজর্ষি বলল, সে তুমি বুঝবেনা। আমাদের ইলেভেন সি-তে এক পি, টি, উষা আছে। কেরালার মেয়ে। তাকে হারায় কার সাধ্যি।

ললিতা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, হাঁরে, মেয়েটার নাম সত্যি সত্যি উষা?

না মামুমণি, ওর আসল নাম, মণিকুট্টি। ওকে ছেলেরা পি, টি, উষা নাম দিয়েছে।

ঋষি কিন্তু ভোলেনি আসল কথাটি। সে বলল, কি রে গানের কি হলো?

উলু মুখ নিচু করে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল। ভাবখানা—গাইছি, একটু ভেবে নিতে দে।

গান এল উলুর গলায়।

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে॥'

চাঁছাছোলা বলিষ্ঠ গলা, দরদে ভরা। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল অল্প বয়সে গলা চিকন আর সুরেলা হয়।

গান শেষ হলে সদানন্দ বললেন, কল্যাণী, আমাদের উলুকে অনেক প্রসাদ দিয়েছেন। যত্নে রক্ষা করতে পারলে নিজেও আনন্দ পাবে, অন্যকেও আনন্দ দিতে পারবে।

রোদ্দুরের সোনালী সুরা পান করতে বেরিয়ে পড়েছে ইন্দ্রের হাতিশালার পাল পাল হাতি। কিছুক্ষণের ভেতরই আকাশের সোনালী রঙ মুছে গেল। ওরা দ্রুত পা চালিয়ে চলল গঙ্গোত্রীর দিকে। এখন উৎরাইএর পথে নেমে চলেছে সবাই। চড়াই ভাঙতে বুক চড়চড় আর উৎরাই পথে পায়ের আঙুল টনটন।

মনে হল নিচে থেকে পথের বাঁক পেরিয়ে কেউ উঠে আসছে। একটু পরেই পরস্পর মুখোমুখি হল। একি! দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে উঠছেন ওপরে।

সদানন্দ শঙ্কিত বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, এই অসময়ে আপনি গোমুখের পথ ধরেছেন। পৌছতে তো রাত দশটারও বেশী হয়ে যাবে। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যাবেন কি করে ?

আমাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

ভদ্রলোক হিন্দি ভাষাভাষি।

সদানন্দ বললেন, কোত্থেকে আসছেন ?

উত্তর কাশী থেকে। কাছাকাছি গাঁওতে আমার ডেরা। লঙ্কায় বাস থেকে নেমে গঙ্গোত্রী হয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।

আপনি এই ঠাণ্ডা আর ঝড়ো আবহাওয়ায় কিছুতেই গোমুখে পৌছতে পারবেন না। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকার ঘনাবে। তখন এই ভাঙাচোরা পথে এগোনো আর সম্ভব হবেনা। তারচেয়ে ফিরে চলুন। আজ রাতটা গঙ্গোত্রীতে কাটিয়ে কাল ভোরে রওনা হবেন।

বৃদ্ধ তবুও সংকল্প থেকে এক চুল নড়লেন না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, তাঁর একটিমাত্র ছেলে গোমুখ থেকে আরও উঁচুতে তপোবনে গিয়েছিল। সেখানে প্রবল ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনরকমে সে নেমে এসেছে গোমুখে। ইউ, পি, গভর্ণমেন্টের যে ডাকবাংলো তৈরী হচ্ছে তারই দাওয়ায় পড়ে আছে। এক যাত্রীর কাছে ঠিকানা দিয়েছিল। দয়ালু যাত্রীটি উত্তরকাশী থেকে একটা পোস্টকার্ডে খবরটা জানিয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, আজ পাঁচদিন পেরিয়ে গেল, না জানি সে কেমন আছে। তার মা বড় উতলা হয়ে অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ বৃদ্ধকে বাধা দেবার কোন ভাষা ছিলনা। এরা সকলেই মূক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কোনরকম সহজ সমাধানই সম্ভব ছিলনা।

কথা বলল রাজর্ষি, বাবা আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাব।

ললিতা বললেন, সে কি! এই পরিস্থিতিতে যাওয়া কি সম্ভব!

ওরা বাংলায় কথা বলছিল। ভদ্রলোক কিছুই বুঝছিলেন না।

সদানন্দ চিরদিনই ছেলেকে ভাল কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মূক হয়ে রইলেন।

রাজর্ষি আবার বলল, আমার জন্যে চিন্তা কর না তোমরা, আমি ঠিক বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে পৌঁছে যাব।

সদানন্দ এবং ললিতা জানেন, ছেলের মুখের কথা খসলে আর তাকে ফেরানো যাবে না। তাই ললিতা শুধু কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই যতক্ষণ না ফিরিস আমি ভাবনায় মরে থাকব বাবা।

সুদীপাকে কানে কানে কি যেন বলল উলু। ঋষি ঠিক বুঝে ফেলেছে। সে অমনি বলল, না মাসীমা, উলু আমাদের সঙ্গে যাবে না। অসুবিধেয় পড়লে সবাই মিলে বিপন্ন হওয়ার কোন মানেই হয় না। আমি কাল ঠিক গঙ্গোত্রীতে ফিরে আসব উলু। তুই একদম কিছু ভাবিস না।

উলু কোন কথা না বলে গঙ্গোত্রীর দিকে হন হন করে হেঁটে চলল। ঋষি ছুটল তার পেছন পেছন। দু'বন্ধুতে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তুই কি চাস না উলু আমি ঐ বুড়ো মানুষটির সঙ্গে যাই?

একবারও বলেছি সে কথা? আমি শুধু তোর সঙ্গে যাবার কথা মাকে বলেছিলাম।

তুই আমাকে ভুল বুঝিস না উলু, তিনজন একই সঙ্গে বিপদে জড়িয়ে পড়লে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারব না। দিনের আলো থাকলে তোকে নিয়ে যাবার কোন অসুবিধেই ছিল না, কিন্তু রাতে পিছল পথে তোকে ধরব না ঐ মানুষটিকে সামলাব।

উলু অবুঝ নয়, কেবল তরুণ বয়সের প্রাণের জোয়ারে সে এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে চেয়েছিল।

রাজর্ষির কথায় শান্ত হলো উলু। পরক্ষণেই বলল, তুই না ফেরা অব্দি আমি কিন্তু ঘুমুতে পারব না।

উলুর এই একছত্র কথার ভেতর কি শক্তি ছিল জানি না, তা মুহূর্তে আর একটি তরুণ প্রাণে প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলল, একটুও ভাবিস না, আমি কাল ঠিক তোর কাছে ফিরে আসব।

বৃদ্ধ নমস্কার করে চলবার জন্যে পা বাড়াতেই ঋষি চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়ান, আমি আসছি।

সব কথা শুনে বৃদ্ধ ঋষির হাত ধরে বললেন, বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করবেন বাবা। তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম, তিনি তোমার মত একটি কিশোরের মধ্যে এত বড় একটা প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু···।

কিন্তুর কিছু নেই। বলল রাজর্ষি।

বৃদ্ধ বললেন, আমি জীবনের শেষে এসে দাঁড়িয়েছি বাবা, মরণের ভয় আমার নেই। তোমার সামনে এখন বিরাট জীবনের পথ পড়ে আছে। অকারণে তুমি কেন জীবনের ঝুঁকি নেবে।

ঋষি বলল, আমি যদি আপনাকে না দেখতাম তাহলে আপনি নিশ্চয় একাই যেতেন, কিন্তু যখন দেখেছি তখন একা আপনাকে কিছুতেই এ বিপদে ছেড়ে দিতে পারব না।

গত্যন্তর না দেখে বৃদ্ধ থেমে দাঁড়ালেন।

উলু তার ঝোলা থেকে চার ব্যাটারীওলা নতুন কেনা টর্চটা বের করে ঋষির ব্যাগে ভরে দিল। ড্রাইফুড, বিস্কুটের প্যাকেট যেখানে যা ছিল টেনে বের করে গুছিয়ে দিল বন্ধুর ব্যাগ।

যখন যাত্রা শুরু হল তখন রাজর্ষি আর উলু এক সঙ্গে খানিক পথ গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল। সেই চির পুরাতন অথচ নিত্য নবীন গান।

'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার
তোমারে করি নমস্কার॥'

ফিরে এল উলু। পথের বাঁকে অদৃশ্য হল রাজর্ষি আর সেই বৃদ্ধ।

গঙ্গোত্রীতে ওরা যখন এসে পৌছল তখন মেঘের সঙ্গে শেষ বেলার ছায়া মিশে গেছে। সারা আকাশ থমথমে। ফেরার পথটুকু ওরা কেউ কারু সঙ্গে কথা বলেনি। ললিতা ছেলের কল্যাণ কামনায় শুধু দুর্গা নাম জপ করে গেছেন। সদানন্দ ভেবেছেন, মানুষের উপকার যে করে ঈশ্বর সব সময় তার

সহায় হন। সুদীপা অবাক হয়ে ভেবেছেন, এত মহৎ একটি হৃদয় ছেলেটি পেল কোথা থেকে। একি শুধু তারুণ্যের উন্মাদনা, না রক্তের ভেতর পরোপকারের এই বীজ রয়েছে!

উলু কিন্তু সারাটা পথ মজার একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে এসেছে। সে গঙ্গোত্রীকে ভেবে নিয়েছে গোমুখ। সে যেন ঋষি আর ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে ফেলে হেঁটে চলেছে। বৃদ্ধ মানুষটি ভারী সুন্দর সব কথা বলতে পারেন। আমি একদিন তোমাদের মত ছিলাম। কত পাহাড় ডিঙিয়েছি। কত মানুষকে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে কত বৃদ্ধকে পথ থেকে পৌছে দিয়েছি তার ডেরায়। তাই ঈশ্বর সব সময় আমাকে করুণা করেছেন! এই যে রাতের অন্ধকারে আমি একা পথ চলার জন্যে তৈরি হয়েছিলাম, তিনি কিন্তু তোমাদের আমার সঙ্গী করে পাঠিয়ে দিলেন। তোমরা বৃদ্ধকে শেষ পথটুকু পার করে দিও, সে তোমাদের সঙ্গে চলতে চলতে তার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলবে। তোমরা অন্ধকে পথ পেরিয়ে যেতে সাহায্য কর, সে তোমাকে আনন্দের জগতের খবর শোনাবে। খঞ্জকে একটি যষ্টি দাও, সে তোমাকে দুর্গম গিরি পেরিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে।

আসলে ক্লাশে পড়াতে গিয়ে ভবদেববাবু একদিন এই কথাগুলো বলেছিলেন। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল উলুর। আজ সেগুলোই বৃদ্ধের মুখ দিয়ে আবার সে নিজেকে শোনাচ্ছে।

সরকারী ডাকবাংলোর দুটো রুম তারা আগেই বুক করে গিয়েছিল। এখন একটু ব্যবস্থা করে পাশাপাশি নিয়ে নিল।

সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু তাকে দূর করার কোন চেষ্টাই কেউ করতে পারল না। চৌকিদার খাবার ব্যাপারে জানতে এসে ঘর অন্ধকার দেখে ফিরে গেল।

মেসোই, আমি তোমাদের ঘরে ঢুকব?

সদানন্দ ললিতার পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছিলেন। উলুর গলা শুনে বললেন, দাঁড়াও মা, আমি আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।

আলো জাললেন সদানন্দ। উলু সিধে ললিতাদেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মাসুমণি তুমি এত ভাবছ কেন বল তো? দেখো, কাল যখন ঋষি ফিরে আসবে তখন তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

উলুর মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে ললিতা বললেন, মন বলছে আমার

মেয়ের কথা কখনো মিথ্যে হবার নয়। ঋষি ঠিক সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়তেই কনকনে একটা ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ল। অন্য সময় হলে দরজা বন্ধের তোড়জোড় পড়ে যেত, কিন্তু এ সময় কেউ উঠে গিয়ে সেটা বন্ধ করল না! একটা দুঃসাহসী ছেলে উন্মুক্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মুখোমুখি চলেছে, তার কথা ভেবে এই সামান্য ঠাণ্ডার কামড়কে সকলে উপেক্ষা করল।

সদানন্দ বললেন, তুমি এ ঘরে কিছুক্ষণ থাকতে পারবে মা? তোমার মাসুমণি তোমার সঙ্গে গল্প করে খুশি হবে। মা কোথায়?

ওঘরে জানলার ধারে অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। তাই তো মাসুমণির সঙ্গে গল্প করব বলে চলে এলাম।

বেশ করেছ।

ললিতা উলুকে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন।

তোমার কথা প্রায়ই বলে ঋষি।

তাই বুঝি?

স্কুলের অডিটোরিয়ামে ফাংসান হলে তোমার নাচ গানের খুব প্রশংসা করে ও।

ওরা সব্বাই আমাকে খুব ভালবাসে কিনা।

তুমি কার কাছে গান শিখেছ?

মায়ের কাছে।

সুদীপা গান জানেন, তা তো জানতাম না।

উলু হেসে বলল, নাচ কিন্তু মায়ের কাছে শিখিনি।

সদানন্দ বললেন, কোন্ ধারার নাচে তোমার বেশি আগ্রহ?

সব নাচই আমার ভাল লাগে, তবে সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশি দেখার পর থেকে ঐ নাচটাই আমাকে যাদু করে রেখেছে। জানেন মেসোই, ওড়িশার মন্দিরে মন্দিরে মায়ের সঙ্গে আমি মূর্তি দেখে বেড়িয়েছি। খাজুরাহো, দিলওয়ারা, বেলুর, দক্ষিণ ভারতের কত মন্দির ঘুরে ঘুরে ভাস্করদের কাজ দেখেছি। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন জায়গার শিল্পীদের বিভিন্ন রকম দক্ষতা। তবে ওড়িশার শিল্পীদের মত মুখের ভাব ফোটাতে আমি সারা ভারতে আর কোথাও দেখিনি। সংযুক্তা নাচতে নাচতে হঠাৎ মন্দিরের গায়ের ঐ মূর্তি হয়ে যান। মেসোই, সে মুহূর্তগুলো কি যে অপূর্ব, কি বলব।

ললিতা বললেন, তুমি আমাকে শিশির মঞ্চে নাচ দেখাবে বলেছ কিন্তু। ভুলে যেও না যেন, আমি টিকিট কেটেই তোমার নাচ দেখব।

মা-সু-ম-ণি আপনি আমার নাচ দেখবেন টিকিট কেটে, এখনও এমন তালেবর আমি হইনি। বাগেশ্বরী নাটকের অনুষ্ঠান করবে। তার আগে কয়েকখানা গান আর মিনিট পঁচিশ-তিরিশ আমার নাচ, ব্যস ঐ পর্যন্ত।

তাই দেখব।

উলু বলল, সঙ্গতকার আর গায়ককে ওঁরা কিছু টাকা দেবেন। আমি ওঁদের কাছে দশখানা কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড চেয়েছি। তার তিনটেতে আপনি, মা আর মেসোই যাবেন। বাকি সাতখানার বিলি ব্যবস্থা ঋষির। ও যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

সব ক'টা অনুষ্ঠানে এমনি করে ওদের কার্ড বিলিয়ে দাও?

না দিলে রক্ষে আছে! পেছনে বসে বিনুনি ধরে হ্যাঁচকা টান দেবে না?

তাই করে বুঝি?

শুধু তাই। কেউ ক্লাসে ঢোকার আগেই ওরা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে আমার নাচের একখানা কার্টুন এঁকে তার তলায় লিখবে,—

ঐ আসে খঞ্জনা, কি নাচের ভঙ্গী
খাঁড়া হাতে তেড়ে আসে যেন রণরঙ্গী!

আবার কখনো লেখে,—

অমাবস্যার রাতে শ্যাওড়ার ডালে
বলিহারি শাঁকচুন্নি নাচে তালে তালে।

ললিতা বললেন, এরকম লেখে বুঝি? ভারী দুষ্টু ছেলে তো সব।

উলু অমনি বলে উঠল, না মাসুমণি, আমি কিচ্ছু মনে করি না। সবার সঙ্গে মিলে আমিও হাসি।

তুমি একটি বোকা মেয়ে, আমি হলে ক্লাশ টিচারের কাছে নালিশ করে দিতুম।

ওরা সব বন্ধু তো, ওদের আর কি বলব। যখন প্রাইজ পাই তখন ওরা যা করে না, আপনি ভাবতে পারবেন না। সারা অডিটোরিয়াম ফাটিয়ে দেবে চিৎকারে।

ঋষি তোমাকে জ্বালায় না?

একটুও না। ও বড় একটা হৈ-চৈ করে না, বেশ চুপচাপ থাকে। কিন্তু

আমরা জানি সব দিকে ওর নজর। যে কোন কাজে ক্লাশ টিচার, এমনকি হেডস্যার ওর ওপরেই সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সদানন্দ কৌতুক করে বললেন, ও একটু মোড়লি করতে ভালবাসে, তাই না?

মেসাই, এমন করে বলবেন না। সকলের ঐ ক্ষমতাটা থাকে না। ও সবার জন্যে সব কিছু করে, তাই ওর কথা মানতে হয়।

ললিতা বললেন, ছেলেটা আমার একদম পাগল। দেখলে না, এই ঝড় আর অন্ধকারে কেমন বুড়ো মানুষটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

উলু বলল, মাসুমণি, আপনি জানেন কিনা জানি না, ও মস্তবড় একটা কাজ করেছে।

সদানন্দ অমনি বললেন, কি কাজ মা, আমরা কিছু জানি না তো।

একটি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড ছেলে ছিল আমাদের ক্লাশে। সে আরও কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছিল। হেডস্যার তার অভিভাবককে ডেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। ঋষি হেডস্যারকে অনেক অনুরোধ করে বলল, স্যার, ওকে একটিবার সুযোগ দিন।

হেডস্যার বললেন, ও রোগ ক্যানসারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওর থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

ঋষি বলল, স্যার, শুধু আমরা নই, সব স্কুলের পড়ুয়ারাই আপনার ছাত্র। ছাত্র না হলেও ছাত্রতুল্য। আপনি ওকে আমাদের স্কুল থেকে তাড়ালেন, ও কিন্তু গিয়ে ঢুকবে অন্য আর একটা স্কুলে। সেখানেও এই একই কীর্তি করবে।

হেডস্যার বললেন, তুমি কি বলতে চাও ওকে শোধবানো যাবে?

ঋষি বলল, একবার চেষ্টা করে দেখব স্যার।

হেডস্যার বললেন, আমি ভাবছি, তুমি আবার না বিপদে জড়িয়ে পড়।

ঋষি বলল, আমি খুব সাবধানে থাকব স্যার।

হেডস্যারের ঘর থেকে ফিরে এসে ঋষি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে এইসব কথা বললে।

আমি গোপনে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি করবি?

ও গম্ভীর হয়ে বলল, কিচ্ছু ভাবিনি উলু। শুধু ঝোঁকের মাথায় স্যারের কাছে ওর জন্যে একটু সময় চেয়ে নিলাম।

এর পরের ঘটনাগুলো আমাদের জিজ্ঞেস করবেন না মেসাই। ঋষি আর আমি ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড হয়ে গেলাম। ঋষি আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড বলে বলছি না,

ও সত্যি যাহু জানে। ছেলেটাকে ঐ ভয়ঙ্কর ক্রিভাসের একেবারে মুখ থেকে টেনে আনল।

ললিতা বললেন, আশ্চর্য! ও আমাদের কিচ্ছু বলে নি।

আপনি খুশি হন নি মাসুমণি?

এখন ঋষির জন্যে গর্ববোধ হচ্ছে। অবশ্য তোমার জন্যেও। তবে সে সময় জানতে পারলে আমি সত্যি বাধা না দিয়ে পারতাম না।

তাই তো ঋষি আপনাকে ওসব বলেনি।

তোমার মা জানতেন?

আমি মার কাছে কিছু লুকোই না। মা সব জানতেন।

বাধা দেননি?

মা শুধু বলেছিল, তোমার বয়েস আর অভিজ্ঞতা, দুটোই কম। অবুঝের মত কাজ কর না, হুঁশিয়ার হয়ে চলবে।

একটা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি এলো। ঘরের পর্দা উড়তে লাগল। এবারও ওরা জানলা বন্ধ করতে পারল না। সবাই নিশ্চুপ বসে ঋষির কথা ভাবতে লাগল।

উলু বলল, আলোটা কি নিভিয়ে দেব মেসোই?

সদানন্দ বললেন, যদি তোমার অসুবিধে না হয় তাহলে নিভিয়ে দাও।

টুক করে আলোটা অফ করে দিয়ে উলু বলল, আপনারা বরং সামান্য বিশ্রাম করে নিন, আমি ওঘরে মায়ের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসছি।

ললিতা বললেন, অনেকক্ষণ একা একা আছেন তোমার মা, ওঁর কাছে একটু বস। আমি জানি, উনিও ছেলেটার জন্যে ভাবছেন।

উলু চলে গেল পাশের ঘরে। গঙ্গোত্রীর মন্দিরের মাথায় আলো জ্বলছে। বৃষ্টিতে সে আলো কখনো উজ্জ্বল, কখনো আবছা মনে হচ্ছে। সুদীপা ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে বসে বাইরের অশান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছেন।

উলু একটা চেয়ার টেনে মায়ের কাছে বসল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুড় গুড় করে ডেকে উঠছে মেঘ। সে ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

রাত তখন কত জানা নেই, উলুর ঝিমুনিটা হঠাৎ ভেঙে গেল। দরজা খোলার শব্দ একটা কানে এসেছিল। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। বন্ধ কাচের জানলার ওপারে গঙ্গার জলধারা যেখানে গৌরীকুণ্ডে প্রবলবেগে ঝরে পড়ছে সেখানে মায়াময় জ্যোৎস্না খেলা করছে।

স্বইচ অন করতেই উলু দেখল মা ঘরের ভেতর কোথাও নেই। উলু বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। করিডোর পেরিয়ে একেবারে নদীর ধারে এসে দেখল, সুদীপা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ে রয়েছেন গঙ্গাদেবীর মন্দিরের দিকে।

মা, তুমি এখানে!

সুদীপা বললেন, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ জোরালো একটা টর্চের আলো গঙ্গাদেবীর মন্দিরের ওপরের পাহাড়ে দেখলাম। দু'তিনবার আলোটা পাইন বনের ফাঁকে ঝলসে উঠল। আমার কেমন যেন মনে হল, ঋষির টর্চ নয়তো, যেটা তুই ওকে দিয়েছিলি। আমি অমনি বেরিয়ে এলাম। ওটাই তো গোমুখের পথ।

আর একবার ব্রীজের ওপর টর্চটা পড়তেই উলু চেঁচিয়ে উঠল, মা, ঐ তো ঋষি; আমি ওকে ঠিক চিনতে পেরেছি।

চাঁদের আলোয় ব্রীজের দিকে ছুটল উলু। এই তো ঋষি, এই তো এসে গেছে।

ওকে উলু হাত ধরে নিয়ে এল বাংলোতে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন সদানন্দ আর ললিতা। সুদীপা দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওদের তুললেন।

ললিতা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে রইলেন কতক্ষণ। সুদীপা বললেন, ঋষি, তুমি স্নানের ঘর থেকে পোশাক বদল করে এসো। কিছু খেয়ে নাও।

ফেরার পথে সুদীপা গঙ্গোত্রীর বাজার থেকে কিছু পুরী তরকারী আর ফ্লাস্কে গরম চা ভরে এনেছিলেন। সেটা বাংলোতে এসে কেউ আর খেতে পারেন নি। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি নেমে আসার জন্যে সবার মনই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। খাবারটা খোলাই হয়নি। এখন সুদীপা প্লাস্টিকের প্লেট বের করে সবার জন্যে খাবার সাজালেন। ঋষির প্লেটে দু'চারটে বেশি পুরীই দিলেন। ফ্লাস্ক থেকে গরম চা বের করে ঢাললেন প্লাস্টিকের গেলাসে।

ঋষি বাথরুম থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এল। সুদীপা তার হাতে খাবার প্লেট ধরিয়ে দিলেন, সঙ্গে গরম চা।

ঋষি খাচ্ছিল। উলু হঠাৎ তার পায়ের দিকে চেয়ে বলল, রক্তের দাগ দেখছি, হোঁচট খেয়েছিস?

সঙ্গে সঙ্গে তুলোয় স্যাভলন ঢেলে ঋষির ঐ চোটলাগা আঙুলে লাগিয়ে দিল। ব্যাণ্ড-এড্ সেঁটে দিল তার ওপর।

এবার খাবার খেতে খেতে সদানন্দ বললেন, তুই এত রাতে কি করে একা ফিরে এলি ঋষি? তুই কি গোমুখে যাসনি? সেই ভদ্রলোকই বা কোথায়?

ঋষি বলল, আমরা চার-পাঁচ কিলোমিটার এগিয়েই হঠাৎ দেখলাম ভদ্রলোকের সেই ছেলে আসছে। ওদিকে প্রবল বৃষ্টি, তাই ওর দেরী হয়েছিল বেরুতে। ছেলে সুস্থই আছে।

ওঁরা কোথায়?

গঙ্গামাঈর মন্দিরের পাশে পাহারাদারের আস্তানা রয়েছে, ওখানে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাল খুব ভোরে উঠে লংকায় বাস ধরে উত্তরকাশী পালাবে।

সুদীপা বললেন, তুমি আজ এই দুর্যোগে যে কাজ করলে তা কখনও ভুলতে পারব না। তোমার বন্ধুরা সবাই যেন তোমার মত এ রকম মন পায়।

উলু নিজের প্লেট থেকে একখানা পুরী আর খানিকটা তরকারী ঋষির প্লেটে ঢেলে দিতে দিতে বলল, নে পেটুক, খা। তোর আজকের বীরত্বের প্রাইজটা তোলা রইল।

উলুর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। এখন মনের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝলমল।

॥ ২ ॥

সুদীপা শেষ রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই বলিষ্ঠ দেহ। বয়সের ছাপ চুলে ছাড়া কোথাও পড়েনি।

সুদীপা কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ বললেন, মনে হচ্ছে চিনতে পারনি আমাকে?

সুদীপা বললেন, খুব কাছের মানুষই তো সব চেয়ে অচেনা থেকে যায়।

উলু কোথায়?

এদিক ওদিক কোথাও রয়েছে।

আমি ওকে দেখতে এসেছি। সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

কোন্‌টা চাও? দেখতে না নিয়ে যেতে? যদি দেখা করতে চাও বসার ঘরে চলে যাও, ও এখুনি আসবে। আর যদি সঙ্গে নিয়ে যাবার মতলব থাকে তাহলে সোজা যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।

ইন্দ্রনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। শেষে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, আসি।

কোন উত্তর দিলেন না সুদীপা। একবার তাকালেন শুধু।

ইন্দ্রনাথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় স্কুল থেকে উলু ফিরল।

তোমার বাবা এসেছিল।

কোথায়?

বললাম তো, তোমার বাবা এসেছিল, চলে গেছে।

একটু বসাতেও পারলে না!

বলেছিলাম, বসল না।

তবে বাবা এসেছিল কেন?

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

এবার চুপ করে গেল উলু। কিছু পরে বলল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা।

হাত মুখ ধোও, খেতে দিচ্ছি।

উলু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে খেতে বসল। সুদীপা পাশে বসে বললেন,- বাবার জন্যে মন কেমন করছে?

কোন কথা বলল না উলু। মুখ নীচু করে খেতে লাগল।

ইচ্ছে করলে তুমি দেখা করে আসতে পার, ওর কাজের জায়গার ঠিকানা আমার জানা। বড় হয়েছ, একাই যেতে পারবে।

মাথাটা দু'দিকে নেড়ে নির্বাক উলু জানাল, সে নিজে কখনও দেখা করতে যাবে না।

সুদীপা মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, যত প্রিয়জন হোক্, যত গুরুজন হোক্, আত্মসম্মান তার চেয়েও বড়।

কি বলছ মা? উলু বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে সুদীপার গায়ে ঠেলা দিলে।

সুদীপা চোখ মেলে দেখলেন, সামনে উলু দাঁড়িয়ে। মেঝেতে একফালি নরম মিঠে রোদ লুটিয়ে পড়েছে।

আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল উঠতে। বলতে বলতেই তিনি বিছানা ছাড়লেন।

আমি কিন্তু আগে একবার তোমাকে চায়ের জন্যে ডেকে গেছি। এখন আমি আর ঋষি এক নেপালী সাধুবাবার কুঠি দেখে ফিরছি।

সাধুবাবা?

হ্যাঁ, মস্তবড় সাধু। তবে মৌনী, কারু সঙ্গে কোন কথা বলেন না।

সুদীপা বললেন, দু'বন্ধুতে তাহলে খুব নিরাশ হলে বল? পরীক্ষার আগাম ফলটা জানতে পারলে না সাধুবাবার কাছ থেকে।

উলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি বুঝি তাই জানতে গিয়েছিলাম মা? তুমি যে কি ভাবো না।

আগের পরিকল্পনা মত সদানন্দ সপরিবারে বেরিয়ে গেলেন লংকার উদ্দেশ্যে। ঐখানে গাড়ি ধরে ওঁরা ফিরবেন হৃষিকেশ। সুদীপা আরও একদিন গঙ্গোত্রীতে থাকার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিলেন। তিনি মেয়েকে নিয়ে সরকারী রেস্ট হাউসে থেকে গেলেন। জীপ-স্ট্যাণ্ডের কাছ অব্দি উলু ঋষিদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। দুজন দুজনের হাত ধরে দোলাতে দোলাতে চলেছে।

উলু বলল, দূর ভাল্লাগ্‌ছে না।

ঋষি বলল, দেখা না হলেই ভাল হত, কি বলিস?

ঠিক তাই।

এবার কোথাও বেরুবার আগে আমরা দুটো ফ্যামিলি প্ল্যান করে নেব।

আমি মাকে বলব, মা নিশ্চয়ই মত দেবে।

ঋষি বলল, মাসীমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

উলু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, মা তোর সম্বন্ধে কি বলে জানিস? দেশের সব ছেলে যদি ঋষির মত হতো তাহলে দেশটা হয়ে যেত দুনিয়ার সেরা।

আর তোর সম্বন্ধে কিছু বলে না মাসীমা?

মুখে প্রশংসা করতে শুনিনি মাকে। প্রাইজটাইজ নিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে বুকে জড়িয়ে ধরে। কোন কথা বলতে পারে না। এক একদিন বলে, কুঁড়িতেও গন্ধ, ফোটা ফুলেও গন্ধ। কুঁড়িতে গন্ধ থাকে বন্ধ হয়ে আর ফোটা ফুল তার গন্ধ উজাড় করে দেয়। এখন তোমাকে ছড়িয়ে দিতে হবে তোমার শ্রেষ্ঠ গুণ। সময় এসে গেছে।

জীপে উঠে পড়ল সবাই। হাত নাড়তে লাগল দু'বন্ধু, যতক্ষণ না গাড়ী বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্নটা দেখার পর সুদীপার চিন্তায় ইন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে আসতে লাগলেন। এগারোটা বছর সংসার জীবনে দুজনে কাটিয়েছেন একসঙ্গে। একাদশ বিবাহ-বার্ষিকীও উদ্‌যাপন করেছেন দুজনে একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু দ্বাদশ বিবাহ বার্ষিকাটি তাঁদের জীবনে টেনে আনল বিচ্ছেদ।

আদর্শবান হেডমাস্টারের একমাত্র মা-মরা মেয়ে সুদীপা। বাবার সঙ্গে ছায়ার মত থাকত সে। মায়ের অভাব নাকি কখনও দূরে করা যায় না। কথাটা

নিশ্চয় সত্যি। কিন্তু যাঁরা হেডমাস্টার হেরম্ববাবুকে দেখেছেন তাঁরা বলবেন, এত বড় একটা ডিস্ট্রিক্ট কলেজিয়েট স্কুলের গুরুদায়িত্ব নিয়েও তিনি কিভাবে মেয়ের যত্ন নিতেন। গানবাজনা, খেলাধুলো, লেখাপড়া শেখানো থেকে স্বাধীন চিন্তা বিকাশের জন্য সব রকম পরিবেশই তিনি তৈরি করে দিতেন। তাই মেয়ে হল তাঁর স্বাধীনচেতা। লেখাপড়া, গানবাজনা, সব বিষয়েই আদর্শ।

বিয়ের সময় হলো। তখন সুদীপা বিয়ে পাশ করে এম, এ-তে ভর্তি হয়েছে। দেখতে খুবই আকর্ষণীয়া। আচার আচরণে সংযত-শ্রী। হেরম্ববাবুর পরিচিতরা অনেকেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, কিন্তু তিনি সবিনয়ে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করলেন। বিত্তবানেরা বাদ পড়ল। অশিক্ষিত ধনশালীকে তিনি চিরদিনই ঘৃণা করে এসেছেন। বিত্তের জোরে স্কুল কমিটির মেম্বার হয়ে মূর্খ অথচ দাম্ভিকের মত আচরণ করতে দেখেছেন তাদের। আই-এ-এস অফিসার পাত্রের জন্য প্রস্তাব এল। হেরম্ববাবু মত দিতে পারলেন না। তাঁর মেয়ে সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত কিন্তু অত্যন্ত আত্মসচেতন। সেখানে ব্যক্তিত্বের সংঘাত আসবে। তাছাড়া তাদের চলাফেরা যে সমাজে সেখানকার আচার আচরণের সঙ্গে মিলবে না তাঁর মেয়ের এতদিনের জীবনযাপন পদ্ধতি।

এইভাবে বর্তমান সমাজের আকাঙ্ক্ষিত বহু পাত্রকে তিনি মেয়ের জীবনসঙ্গী-রূপে মনোনীত করতে পারলেন না।

শেষে একদিন পাত্র নিজেই হাজির হলো হেরম্ববাবুর সামনে।

আমি ইন্দ্রনাথ।

স্কুল থেকে ফিরে হেরম্ববাবু নিজের কোয়ার্টারে আসছিলেন। গেটের ভেতর ঢুকেই দেখলেন সামনের বাগানে পায়চারি করছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক।

আজকাল চোখে স্পষ্ট দেখতে পান না হেরম্ববাবু। ছানি অনেকখানি এগিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কে ?

আমি ইন্দ্রনাথ। বলতে বলতেই ইন্দ্রনাথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে হেরম্ববাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সামান্য সময় থমকে দাঁড়িয়ে স্মৃতির পাতা থেকে ইন্দ্রনাথকে বের করলেন।

আরে এসো এসো, কখন এলে ?

খানিক্ষণ আগে।

দীপা কি জানে, তুমি এসেছ ?

হ্যাঁ, সুদীপাই গেট খুলে দিয়েছে।

হেরম্ববাবু মুখে বললেন, এসো।

বারান্দায় উঠে বললেন, বস এখানে, আমি এখুনি আসছি।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলেন, একি আচরণ দীপার! দেখেছে, চেনে, দরজা খুলে দিয়েছে, অথচ বসতে বলেনি!

ভেতরের ঘরে মুখোমুখি হলেন দীপার।

তুমি ইন্দ্রকে বসতে বলনি মা?

মৃদু হেসে দীপা বলল, আজকাল দেখছি আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস কমে আসছে।

লজ্জিত হলেন হেরম্ববাবু।

আমারই ভাবনার ভুল হলো মা।

হেরম্ববাবু জামাখানা খুললেন। সুদীপা বাবার জামা হাতে নিয়ে আলনায় হ্যাঙারে রেখে দিল। তারপর এগিয়ে এসে নিজেই হেরম্ববাবুর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে টেবিলে রাখল।

হেরম্ববাবু স্নানের ঘরে ঢুকে মুখে চোখে ভাল করে জল দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আসা মাত্রই সুদীপা তাঁর চোখে পরিয়ে দিল চশমা।

বলল, জামা পরে কাজ নেই বাবা। তুমি গেঞ্জি পরেই চলে যাও। আমি ওখানেই তোমাদের খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

হেরম্ববাবু বাইরে এসে দেখলেন, ইন্দ্রনাথ তখনও বাগনারে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এসো, বস আমার পাশে।

ইন্দ্রনাথ সংকুচিত হচ্ছিল। হেরম্ববাবু জোরের সঙ্গে বললেন, এখন তুমি আমার ছাত্র নও ইন্দ্র, তুমি আমার মতই একজন শিক্ষক।

আমি চিরদিনই আপনার ছাত্র থাকব মাস্টারমশাই।

ইন্দ্র এবার একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে একটু দূরে বসল।

তোমাদের স্কুলের খবর বল। এ বছর পাশের হার কি রকম? তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট?

আমি এ বছরই হেডমাস্টার হিসেবে স্কুলের দায়িত্ব পেয়েছি।

খুব আনন্দের খবর। দীপা, দীপা, শুনে যা, তোর ইন্দ্রদা হেডমাস্টার হয়েছে।

দীপা জানে মাস্টারমশাই।

কি রকম ? ও জানল কি করে ?

পরক্ষণেই বললেন, বুঝেছি বুঝেছি। আমার আসার আগেই তোমার মুখ থেকে খবরটা শুনেছে।

ইন্দ্রনাথ সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার উত্তর দিচ্ছি। এবার আমাদের স্কুল থেকে পাঠান হয়েছিল একুশজনকে। সবাই পাশ করেছে। প্রথম বিভাগে পাঁচ। দ্বিতীয় বিভাগে বাকি সব। একটি স্টার মার্ক পেয়েছে।

হেরম্ববাবু বললেন. হেডমাস্টার হিসেবে তুমি দায়িত্ব পেলে আর সঙ্গে সঙ্গে এই রেজাল্ট ! তোমার এই বছরটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিন।

একটু থেমে বললেন, গভর্ণিংবডির মেম্বাররা কেমন ?

ইন্দ্রনাথ বলল, সবাই ছড়ি ঘোরাতে চান। নিজেদের ভেতরে দলাদলি।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুদীপা দু'থালা খাবার এনে রাখল টেবিলে। দু'গ্লাস জল আনল ভেতর থেকে। পাশে পড়ে থাকা চেয়ারখানা খাবার টেবিলের সামনে রেখে বলল, আসুন ইন্দ্রদা, বাবার মুখোমুখি বসুন। চায়ের সময় হয়ে গেছে।

এখন ইন্দ্রকে মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি বসতে হল।

তুইও বোস দীপা, অনেকাল পরে ইন্দ্র এলো।

আমি চাটা নিয়ে এসে একেবারে বসব। তোমরা খেতে খেতে ততক্ষণ গল্প কর।

এক সময় ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে ঢুকল সুদীপা। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্র আর হেরম্ববাবুর হাতে দু'কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে একটা মোড়ার ওপর বসল।

হেরম্ববাবু বললেন, মনে আছে ইন্দ্র তুমি মাঝে মাঝে বোর্ডিং থেকে এসে দীপাকে অঙ্ক কষাতে ?

ইন্দ্রনাথ হেসে বলল, দীপার কিন্তু অঙ্ক একটুও ভাল লাগত না।

সুদীপা বলল, তা কেন হবে ইন্দ্রদা। কেবল আমি জিওমেট্রিটা আয়ত্ব করতে পারতাম না। আচ্ছা, তুমি ঠিক করে বল, এরেথমেটিকের অঙ্কগুলো আমার প্রায় রাইট হত কিনা ?

ইন্দ্র বলল, মনে আছে দীপা, যেদিন তেল মাখানো বাঁশে বানরের ওঠানামা নিয়ে অঙ্কটা কষতে বসলাম সেদিন তুমি তো হেসেই গড়ালে।

আহা, বেচারার জন্যে দুঃখ হয় এখন। একটু একটু কত পরিশ্রম করে উঠছে কিন্তু স্লীপ করে আবার নেমে আসছে কতখানি। রাঠে মারা যাচ্ছে বেচারার

পরিশ্রম।

হেরম্ববাবু দার্শনিকের মত বললেন, তাই হয়, সফলতার শীর্ষে উঠতে হলে অনেক পতন উত্থান পেরিয়ে যেতে হয়।

একটু থেমে আবার বললেন, ইন্দ্র, তুমি আমার স্কুলের ফার্স্ট বয়ই শুধুই ছিলে না, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ করেছ। তাই তোমার কথা বিশেষভাবে আমার মনে আছে!

মাস্টারমশাই, এম, এ, পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের পর আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম। সেও ক'বছর হয়ে গেল।

তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?

দু'বছর হল তিনি মারা গেছেন।

একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। হেরম্ববাবু উচ্ছাসের সঙ্গে বললেন। গ্রাম্য মানুষ, হাঁটুর ওপর মোটা ধুতি, কথাবার্তায় চেষ্টাকৃত বাঁধুনি নেই, কিন্তু নির্ভেজাল খাঁটি মানুষ। এ যুগে এসব মানুষ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে আসছে।

দীপা বলল, আমার বেশ মনে আছে, উনি একবার আমার জন্যে ওঁব বাড়ীর গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে এনেছিলেন। দারুণ মিষ্টি পেয়ারাগুলো।

ইন্দ্র বলল, এখনও সে গাছটা ফল দিচ্ছে। তেমনি মিষ্টি।

হেরম্ববাবু বললেন, কলকাতায় নিশ্চয় বাসা করে আছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশায়। তবে দেশের বাড়ীটা ছাড়িনি।

ছাড়বে কেন? গ্রামের এক টুকরো জায়গার ওপর দিয়েও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বয়ে যায়। বুক ভরে এখনও প্রাণবায়ু টানা যায়। তাছাড়া সবুজের দিকে তাকালে চোখ জুড়োয়। পুকুরে নাইলে সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

এরপর কিছু সময় চুপচাপ থেকে হেরম্ববাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলেন, বৌমাকে ঘরে এনেছ?

হঠাৎ একটা জরুরী কাজের আছিলায় ভেতরে উঠে গেল সুদীপা। যাবার সময় খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপ ট্রেতে তুলতে তুলতেই শুনতে পেল এতদিন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিকে তাকাবার ফুরসুৎ ছিল না, এখন অবশ্য কিছুটা গুছিয়ে বসেছি।

হেরম্ববাবু বললেন, মা নেই, স্ত্রী নেই, সংসার চালাবে কে? এবার বিয়ে থা কর। সংসারে শ্রী আসুক।

ইন্দ্রনাথ চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে রইল।

সুদীপা ভেতরের ঘরে বসে একটা পর্দা সেলাই-এর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু জানলার ভেতর দিয়ে ভেসে এল বাবা আর ইন্দ্রদার কথা।

হেরম্ববাবু বললেন, ম্যাথমেটিক্সে তুমি তো ফার্স্টক্লাশ পেয়েছিলে, কোন কলেজে অ্যাপ্লাই করলে না কেন?

আমি সে সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের ইউনিভারসিটির হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনিই একটা কলেজে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক ভাবলাম। মনে হল, যদি স্কুলে থেকেই ছেলেদের ভাল করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ওরা অনেক বেশী সফল হতে পারবে। তাই কলেজের মোহ ছেড়ে স্কুলেই থেকে গেলাম মাস্টারমশাই। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। হিস্ট্রিতে আপনিও তো ফার্স্টক্লাশ।

সেলাই থেমে গেল সুদীপার। ইন্দ্রনাথকে সে যেন আজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করল।

সে রাতে হেরম্ববাবুর অনুরোধে ইন্দ্রনাথ থেকে গেল সুদীপাদের বাড়ীতে। জ্যোৎস্নারাতে সামনের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে টুকরো কথায় নিজেদের মন মেলে ধরল সুদীপা আর ইন্দ্রনাথ।

এর চার মাস পরে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সুদীপা এল ইন্দ্রনাথের সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। বিয়ের ক'মাস পরেই সে বাবার সাবজেক্টে এম, এ, পরীক্ষা দিলে, কিন্তু আশানুরূপ ফল হলো না। না হোক, ইন্দ্রনাথের মত সে স্কুলেই কাজ করবে। আর পেয়ে গেলও একটা চাকরি।

দু'বছরের ভেতর উলু ভূমিষ্ঠ হল। সুদীপার চাকরির জায়গাটা ছিল ইন্দ্র-নাথের ডেরা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তাই সুদীপার স্কুলের কাছাকাছিই সুদীপার নামে নেওয়া হল। নতুন বাসা। ইন্দ্রনাথ তার পুরোনো বাসা ছেড়ে দিলে।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল একটা সুন্দর সুখী সংসার।

স্কুলকে নিজের চেষ্টায় আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করল ইন্দ্রনাথ চৌধুরী। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

পাবলিশাররা এগিয়ে এল তার অঙ্কের বই ছাপার জন্যে। বিশেষ এক পাব-লিশার আগাম অনেকগুলো টাকাও দিলে।

পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারটা এতদিন ইন্দ্রনাথের ভাবনার বাইরে ছিল। এখন গভীরভাবে সেটাতেই মনঃসংযোগ করল সে।

ছাপা হল বই। নামজাদা পাবলিশার। সারা বাংলাদেশের স্কুলে স্কুলে বইএর ক্যানভাসিং চলল। কয়েক হাজার টাকা প্রথম বছরেই রয়ালটি মিলল।

নেশা ধরে গেল ইন্দ্রনাথের। ছোট থেকে বড় সব ক্লাশের বই লেখা শুরু হয়ে গেল। এখন ইস্কুল আর ধ্যানজ্ঞান নয়। নতুন নতুন পুস্তক রচনাতেই সময় চলে যায়। টাকাও আসছে আশাতীত।

ইন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সুদীপা। তার মনে হলে, ইন্দ্রনাথের এতদিনের সাধনায় কোথায় যেন তালভঙ্গ হচ্ছে। হেড মাস্টারের তীক্ষ্ণ নজর এখন আর স্কুলের প্রতিদিনের কাজকর্মের ভেতর নেই। এখন তার নিজের কোয়ার্টারেই বসছে প্রতিদিনের ইন্দ্রসভা। প্রকাশকেরা ঘিরে রয়েছে তাকে। যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান এখন বড আকারে করতে হয়। তাতে সুদাপা আর ইন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গজন ছাডা উপস্থিত থাকে পাব-লিশার মহলের অনেকেই।

ইন্দ্রনাথের হেডমাস্টার জীবনের প্রথম আঘাত এল, যেদিন স্কুলের রেজাল্টে দেখা গেল, তিরিশজনের ভেতর সাতজন ফেল। তিনজন মাত্র ফার্স্ট ডিভি-জনে গেছে।

ইন্দ্রনাথ স্কুল থেকে ফিরতেই সুদীপা বলল, বেশ মুষডে পডেছ মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার?

ইন্দ্রনাথ হেসে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসির ঐটুকু আলোতে মুখের গ্লানি ঘুচল না।

আমার কাছে লুকয়ে লাভ নেই, বল কি হয়েছে?

এবার নিজেকে চেপে রাখতে পারল না ইন্দ্রনাথ। বলতে হল, রেজাল্ট খুবই খারাপ।

এরপর কোন মন্তব্য এল না সুদীপার দিক থেকে। শুধু বললে, সারাদিন পরে এলে, বড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চোখে মুখে জল দিয়ে এসো, আমি খাবার আনছি।

উলু ফেবে নি?

এখনও ওর বাস এসে পৌছয়নি।

দুজনের খাবার নিয়ে বসল সুদীপা। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। ইন্দ্রনাথ বলল, কো-এডুকেশানে না দিয়ে মেয়েটাকে তোমার স্কুলে রাখলেই ভাল হত।

ওসব চিন্তাধারা একেবারে বাতিল করা দরকার। ছেলে মেয়েদের ভেতর সুস্থ সম্বন্ধ গড়ে উঠুক, এটাই আমরা চাইব।

ইন্দ্রনাথ বলল, কু-ফলও তো দেখছি অনেক। সে তো হতেই পারে। তাবলে সুস্থ, প্রগতিশীল একটা পরিকল্পনাকে তো বাতিল করা যায় না।

উলুর গাড়ীর শব্দ ভেসে এল। খাবার রেখে হাতে একটুখানি জল ছুঁইয়ে সুদীপা দরজা পেরিয়ে মেয়েকে আনতে গেল।

স্কুল বাস থেকে নেমে মেয়ে ছুটে এল। সুদীপা দেখল, মেয়ে চোখ মুছছে।

কি হলো তোমার মা ?

আমি জানালার ধারে বসব বলে আগে বাসে উঠতে গিয়েছিলাম, আন্টি হাত ধরে টেনে নামিয়ে দিলেন।

তুমি লাইন ভেঙে গিয়েছ নিশ্চয়ই ?

বারে, রোজ লাইনে থাকি, কোনদিন জানলার ধারে বসতে পাই না। আমার বুঝি ইচ্ছে করে না।

সুদীপা কাছে থেকে উলুকে জামা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে সাহায্য করল। বেড়ানোর পোশাক পরিয়ে দিয়ে বলল, বাবার কাছে যাও, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

সুদীপা এসে শুনতে পেল, বাবার কাছে আন্টির বিরুদ্ধে মেয়ের নালিশ হচ্ছে। বুঝলে, হাত ধরে টেনে নামানোর অপমান মেয়ে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সুদীপা বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও উলু, আমরা আজ বেড়াতে যাব।

সুদীপা নিজের খাবার খেতে লাগল।

ইন্দ্রনাথ বলল, জানো, ওর আন্টি ওকে কি বলেছে !

সুদীপা শুধু তাকাল।

বাবা মা তোমাকে এ রকম শিক্ষা দিয়েছে বুঝি ?

সুদীপা চোখের ইঙ্গিতে ইন্দ্রনাথকে চুপ করতে বলল। নিজের খাবারটা খেয়ে নিয়ে উলুকে বলল, তোমারও তো দেখছি খাওয়া শেষ। হাত মুখ ধুয়ে মুছে রেডি হয়ে নাও।

উলু উঠে গেল। সুদীপা বলল, আন্টির বিরুদ্ধে ওর স্বপক্ষে কোন কিছু বোল না। ওর মনের ভেতর আন্টিদের সম্বন্ধে গভীর অশ্রদ্ধা এসে যাবে।

ইন্দ্রনাথ তখনও উত্তেজিত। বলল, আমরা শিক্ষকতা করছি কিন্তু জানি না কেমন করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

সুদীপা অনুত্তেজিত গলায় বলল, অনেকেই হয়ত সাংসারিক নানা ঝামেলায় সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। তাই বলে সবাই রূঢ় ব্যবহার করেন,

এমন নয়। আচ্ছা, এ কথা এখন থাক, চল না আমরা আজ সন্ধ্যায় ওকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আনি। ট্যাক্সি নেব, ও বসবে জানলার ধারে। খুশীতে বকবক করবে। রেড রোডের ওপর দিয়ে গাড়ী যখন যাবে তখন হু হু করে বাতাস বইবে, উলুর চুলগুলো উড়বে। দেখতে ভারী ভাল লাগবে।

আমার একটুও সময় হবে না আজ। এক নতুন পরিকল্পনার ব্যাপারে বেঙ্গল বুক হাউসের মালিক আসতে পারেন।

সুদীপা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার নতুন বইএর প্রুফগুলো দেখে ফেলেছ?

স্কুলে বসেই দেখেছি। দুটো ক্লাশ ছিল, নিতে পারিনি। অন্যকে দিয়ে ম্যানেজ করেছি।

সুদীপা বলল, তোমার স্কুলের রেজাল্ট পর পর খারাপ হয়ে যাবার কারণ এটাই।

কি বললে?

আমি কি খুব আস্তে কথাগুলো বললাম।

তুমি মনে কর আজকাল আমি স্কুলের কাজে ফাঁকি দিচ্ছি, তাই এ রেজাল্ট?

নিজেকে প্রশ্ন কর, উত্তর পাবে।

উলু এসে গেল। সুদীপা তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে ইন্দ্রনাথের গলা শোনা গেল, রাতেভিতে ট্যাক্সিতে একা একা ঘোরার গোঁয়ার্তুমি কোর না।

কোন উত্তর না দিয়েই সুদীপা চলে গেল।

ট্রামে মেয়েকে নিয়ে ঘুরে আসবে। জানলার ধারে আজ বসিয়ে নিয়ে যেতে হবে মেয়েটাকে। বড্ড আঘাত লেগেছে কোমল মনে।

টার্মিনাসে গিয়ে ট্রামে উঠল সুদীপা। বসল দুজনের সিটে। জানলার ধারে বসে সত্যিই খুশী হয়ে উঠল উলু। রাতের কলকাতা আলোর মালা গেঁথে, দোকান পসার সাজিয়ে, পোশাক আশাক পরা লোকজনকে দ্রুত হাঁটিয়ে এক অপরূপ উৎসবের মিছিল বের করেছে।

হু হু হাওয়া, আলো, গাছপালা, ফাঁকা মাঠ, মানুষজন উপভোগ করতে করতে ঐ গাড়ীতেই ফিরল সুদীপা মেয়েকে নিয়ে।

খেতে বসে ইন্দ্রনাথ বলল, ভাগ্যিস যাইনি, খুব বড় একটা প্ল্যান তাহলে আমার হাতছাড়া হয়ে যেত।

সুদীপা ও বিষয়ে একেবারে নীরব। বলল, আর খানিকটা ডালনা দেব?

থাক্। প্ল্যানটা কি জানো, খুব কনফিডেনসিয়াল কিন্তু। বান্ধবীদের কাউকে যেন বলে বস না।

বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না সুদীপা, চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল।

দেয়ালও যাতে না শুনতে পায় এমনি সাবধানতা অবলম্বন করে ইন্দ্রনাথ রাজহাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে বলল, শিক্ষক সংসদ যে টেস্টপেপার বাজারে ছাড়ে তার চাহিদা কি পরিমাণ, সে কথা নিশ্চয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখন ঐ টেস্টপেপারের সব খরচ খরচা আগাম শিক্ষক সংসদকে দেয় বেঙ্গল বুক হাইস।

থামল ইন্দ্রনাথ। এর পরের কথাগুলো কিভাবে গুছিয়ে বলবে তাই ভাবতে লাগল।

সুদীপা প্রথম কথা বলল, বিনা উদ্দেশ্যে বেঙ্গল বুক হাউস এতগুলো টাকা আগাম দিচ্ছে শিক্ষক সংসদকে? উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে।

কি রকম?

টেস্টপেপার ডিষ্ট্রিবিউশানের পুরো ভারটা নিজেরা নিয়ে নেয়। এতে নিজেদের দাদন দেওয়া টাকাটা উঠে আসে, কিছু কমিশানও পায়।

সদীপা বলল, তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এতে তোমার ভূমিকা কি থাকতে পারে?

ওরা ঐ টেস্টপেপারের প্রতিটি বিষয়েরই উত্তরপত্র বের করে। প্রতি বছর এমনি অনেকগুলো উত্তরপত্র বের হয়। এখন থেকে অঙ্ক আর ভূগোলের আনসারগুলো আমার ওপর করে দেবার দায়িত্ব পড়ল। লাভ যথেষ্ট কিন্তু নাওয়া খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

তুমিও তাহলে জড়িয়ে পড়লে ঐ চক্রের ভেতর?

আমার ভূমিকা পরিষ্কার। প্রতি বছর দুটো উত্তর পত্রের বই লিখব, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাব একটা মোটা টাকা।

সুদীপা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তুমি ভাল করেই জান, ঐ প্রকাশক কিভাবে উত্তরের বইগুলো বিক্রি করে। চার টাকার চটি বইএর দাম করে বার চোদ্দ টাকা। একখানা টেস্টপেপারের জন্যে যখন অভিভাবকরা হন্যে হয়ে ঘোরেন তখন তাঁদের এক একখানা টেস্টপেপারের পিছনে দু'চারখানা আকাশ ছোঁয়া দামের ভুলে ভরা উত্তরপত্র কিনতে হয়।

তাতে আমার অন্যায়টা কোথায় দেখলে?

সুদীপা বলল, যে প্রতিষ্ঠানের ভেতর অন্যায় আছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অন্যায়েরই সামিল।

হো হো করে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, এরপর চোর ডাকাতের ছেলেরা পড়াশুনো করতে চাইলে তাদের অ্যাডমিশান দেওয়া হবে না। চিকিৎসার জন্য সুদখোর এলে তার চিকিৎসার সুযোগও মিলবে না।

এই ধরনের উদাহরণ দিয়ে তুমি যদি নিজেকে দায়মুক্ত মনে কর তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে নিজের বিবেকের কাছে একদিন তোমাকে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে।

সুদীপার কোন কথাই রাখতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। সে দুটো আনসার পেপারই তুলে দিয়েছে বেঙ্গল বুক হাউসের হাতে। না দিয়ে উপায়ও ছিল না তার। প্রকাশক একটি ভয়ঙ্কর প্রলোভনে ভরা টোপ তার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সরকারে তদ্বির করে এ বছর জাতীয় শিক্ষকের সম্মান তাকে এনে দেওয়া হবে।

এ সংবাদে যে কোন স্ত্রীরই খুশি হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু সুদীপার সৃষ্টি অন্য ধাতুতে। সে বলল, প্রথমতঃ ঐ টেস্টপেপার সংক্রান্ত টাকা আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান এনে দেবার জন্যে যারা নাওয়া খাওয়া ভুলে তদ্বির করছে তাদের পায়ের ধুলো যেন আমার বাড়ীতে না পড়ে।

ক্ষেপে গেল ইন্দ্রনাথ।

বল, কোন্ মানুষটি সামান্যতম তদ্বির না করেই জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন? তাঁরা যদি থেকেও থাকেন তবে কোটিতে এক।

সুদীপা বলল, তোমার অনুমান সত্য বলেই ধরে নিচ্ছি। সম্মানের লোভে যে মানুষ অনেক নীচে নামতে পারে তাও আমার নয়। আর এতসব মেনে নিয়েও একটি কথা আমার বলার আছে, তদ্বিরের পুরস্কার পেয়ে সে পুরস্কার রাখবে কোথায়। নিজের মন, বিবেক, কেউই তাকে স্থান দেবে না।

আমার সম্মানপ্রাপ্তির ব্যাপারে তুমি ঈর্ষায় কাতর হচ্ছ দীপা।

ঈর্ষায় নয়, লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছি।

লজ্জা! লজ্জা কেন?

সম্মান, খেতাব, পুরস্কার, সবই তদ্বির করে পেতে হয়। এর চেয়ে দুঃখের, লজ্জার, আত্মগ্লানির আর কি থাকতে পারে। সম্মান পাওয়ার পর সবাই তোমার জয়ধ্বনি দেবে, কিন্তু আমি তো মনে মনে জানি কতবড় গ্লানির পাহাড় চেপে বসবে বুকের ওপর।

ক্ষেপে গেল ইন্দ্রনাথ। সে সুদীপার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত হানল। দেখ, তোমার বাবার এ মান্ধাতার যুগের আদর্শগুলো এখন একেবারে অচল।

দোহাই তোমার, আমাকে যা খুশি তাই বল, কিন্তু যিনি গত হয়েছেন তাঁকে আমাদের তুচ্ছ পারিবারিক ব্যাপারে টেনে এনো না।

এবারের বিবাহ-বার্ষিকী নতুন তাৎপর্য পেল। সুদীপা, তার দিকে থেকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দু'চারজনকে মাত্র নিমন্ত্রণ জানাল। অন্যদিকে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ল ইন্দ্রনাথের। সে এখন শিক্ষক সংসদের অন্যতম প্রধান।

মানুষজন এলেই তাদের আপ্যায়ন গৃহকর্ত্রীর ধর্ম। সুদীপা ইন্দ্রনাথের বন্ধুদের সাধ্যমত তদারকি করতে লাগল।

সামনের উঠোনে ফুলের টবের চারদিক ঘিরে চেয়ার পাতা হয়েছে। কানে আসছে প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক সমিতি সম্বন্ধে নানা রকম কুৎসা। তাদের চূর্ণ করার বহুবিধ পরিকল্পনা। ইন্দ্রনাথকে বার্ষিক সম্মেলনে পরবর্তী সেক্রেটারী করার কলাকৌশল।

সুদীপা প্লেট সাজিয়ে এনে ধরিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকের হাতে।

ললিত সেন হাতে প্লেটখানা নিয়েই বলে উঠলেন, বৌঠান, আর ক'দিন পরে কিন্তু হাতে প্লেট ধরে খাব না, পাত পেড়ে খাব।

পাশে বসে যাঁরা শুনতে পেলেন তাঁরা ললিত সেনকে সমর্থন করে হেসে উঠলেন। একটু দূরে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা কি হলো, কি হলো বলে হাসির কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সুদীপা ঘরের ভেতর ঢুকে একটু থমকে দাঁড়াল। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী, কেউ তো তা নিয়ে কোন সুন্দর মন্তব্য করছেন না।

কেবল ইন্দ্রনাথদের স্কুলের তরুণ ইংরাজীর শিক্ষকটি একগুচ্ছ হলদে গোপাল আর রবীন্দ্রনাথের পুষ্পিত বসন্তের মাদকতায় ভরা 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটি সুদীপার হাতে দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর কি রকম লাজুক চোখ-মুখ করে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল উঠোনের পাশের বাগানটায়।

সুদীপা জানালা দিয়ে দেখল, সেই তরুণ শিক্ষক অনির্বাণ এখন উলুকে প্রজাপতি ধরার খেলায় সাহায্য করছে।

সুদীপা সাজানো প্লেটের থেকে একটা তুলে নিয়ে পেছনের দরজা খুলে অনির্বাণের দিকে এগিয়ে গেল। তার মনে হল, একমাত্র অনির্বাণই আজকের দিনটির মর্যাদা রেখেছে। সে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি।

কতকগুলি স্বার্থসন্ধানী মানুষের কোলাহল এক সময় স্তিমিত হয়ে এল। সুদীপা এতক্ষণ শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথকে। সেই আদর্শবান মানুষটা কিভাবে স্বার্থের চক্রে জড়িয়ে পড়ছে। সে আর কোনদিন মুক্তি পাবে না। মুক্তি চায়ও না।

সবাই চলে গেলেন ইন্দ্রনাথের উষ্ণ অভ্যর্থনার ভেতর দিয়ে। এরপর ইন্দ্রনাথ ঢুকল তার অফিস কাম স্টাডি রুমে। একবারও সুদীপার কাছে এল না। একগাদা প্রুফ দেখার ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল জানলার বাইরে গেটের দিকে।

সুদীপা পাশে বসে উলুকে রাতের খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে রাজকাহিনীর গল্প বলতে লাগল।

কিছু পরেই, আরে আসুন, আসুন, আওয়াজ তুলে ঘর থেকে গেটের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। সুদীপা তাকিয়ে দেখল, বেঙ্গল বুক হাউসের সেই মানুষটি।

পেছনের আলো আঁধারিতে মনে হলো, একটা লোক মাথায় কি যেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কি ওতে? ইন্দ্রনাথের কৌতূহলী গলা শোনা গেল।

সুদীপা দেবী কোথায়? তাঁর জন্যে বিশেষ করে এই উপহারটুকু এনেছি।

সুদীপা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। লোকটি এখন এগিয়ে এসেছে। আলো পড়েছে তার মাথায় ধরে রাখা বস্তুটার ওপর। প্ল্যাস্টিকে জড়ানো একটা টি-ভি বলে মনে হচ্ছে।

সুদীপার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। যে ঘরে পড়ুয়া অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা রয়েছে, সে বাড়ীতে টি-ভি রাখার ঘোরতর বিপক্ষে সুদীপা। শুধু পড়া নয়, টি-ভি দেখতে দেখতে নানা জিনিসই হারানোর সম্ভাবনা। সে তার কলিগদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই নানা ধরনের রিপোর্ট পেয়েছে। পরীক্ষার সাতদিন বাকি, মা বাবার ছেলের জন্যে উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলের জেদ, সে 'চিত্রহার' দেখবেই। মা জোর করে টি-ভি বন্ধ করে দিলে ছেলে মাকে ঠেলে সরিয়ে সুইচ অন করল।

এ তো বহু ঘটনার একটি। সন্ধ্যার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর তরুণ বয়স্কদের জন্য নানা রকম অনুষ্ঠান। অনেক সময় শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্যও। কিন্তু তখন তো ছেলেমেয়েদের পড়া তৈরির সময়, তাহলে?

এবার ইন্দ্রনাথই এগিয়ে আগাম জানান দিল, দেখ, ভুবনেশ্বরবাবু তোমার জন্যে, মানে এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কি এনেছেন।

সুদীপার মনে হলো, সেটটা সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ দেয়। কিন্তু না, নিজের ক্ষোভকে সংযত করল সে। এটা তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আসল প্রাপক ইন্দ্রনাথ। তাকে হাতে রাখার জন্যেই এই দামী কালার টি-ভি-টি এতদূর বয়ে আনা হয়েছে।

সুদীপার সামনেই টেবিলের ওপর রাখা হলো সেটটি। ভুবনেশ্বরবাবু যেন কিছু বলছিলেন, মৃদু মৃদু হাসছিলেন তার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না সুদীপা। ক্ষোভ প্রকাশের অক্ষমতা তার কানের ভেতর ভোমরার মত বন বন করছিল।

সে অত্যন্ত সংযতভাবে বলল, বসুন, আপনার খাবার আনছি।

ভেতর থেকে খাবার নিয়ে এসে টেবিলে পরিবেশন করল। মাঝে মাঝে কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করল। চপের প্রশংসা করতে আরও দু'খানা চপ ভেতর থেকে এনে দিল।

আমাকেও এখানেই ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে দিয়ে দাও। রাত হয়েছে।

প্রতিটি বিবাহ-বার্ষিকীতে ইন্দ্রনাথ সুদীপার সঙ্গে বসেই খায়। এই দিনটিতে দুজনের স্মৃতির ফুল তুলে তুলে মালা গাথা যেন শেষই হতে চায় না। কিন্তু আজই তাঁর ব্যতিক্রম ঘটল।

সুদীপাকেও লেখার কাজে নামাবে, এ রকম একটা একতরফা আশ্বাস ছুঁড়ে দিয়ে ভুবনেশ্বরবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! দু'একবার নতুন টি-ভির গায়ে হাত বুলিয়ে ইন্দ্রনাথ হাই তুলল। ঘুম পাবারই কথা। সারাদিন বন্ধুদের আপ্যায়নে এবং গভীর সব আলোচনায় গেছে। তারপর চলে যাবার সময় ভুবনেশ্বরবাবু বলে গেছেন জাতীয় শিক্ষকের সম্মান তিনি তার জন্য এনে দেবেনই। যারা বলছেন এখনও ইন্দ্রনাথ প্রবীণের দলে পড়েনি, সুতরাং এ সম্মান এত তাড়াতাড়ি কেন? তার উত্তরও তাঁদের দিয়েছেন ভুবনেশ্বরবাবু। প্রবীনতাই জাতীয় সম্মান প্রাপ্তির মাপকাঠি নয়। একজনের কর্মদক্ষতা, শিক্ষা-দানের যোগ্যতা, দেশের তরুণ কিশোরদের গড়ে তোলার জন্য আত্মনিবেদন, সব মিলিয়ে তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন। সে সব গুণের প্রতিটিই একটু বেশি পরিমাণে আছে না কি ইন্দ্রনাথের ভেতর? তাহলে সম্মানে ভূষিত হতে তার বাধাটা কোথায়?

এই সব নানা উত্তেজক চিন্তায় ভারাক্রান্ত মাথাটাকে ঘুমের ভেতর সঁপে দিতে চাইল ইন্দ্রনাথ।

রাত ভোর হলে ইন্দ্রনাথ জেগে উঠে অবাক হয়ে গেল। সুদীপা তার

স্যুটকেশ, বেডিং প্রায় গুছিয়ে ফেলেছে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ, হচ্ছেটা কি ?

ততোধিক অনুত্তেজিত গলায় সুদীপা বলল, চলে যাচ্ছি।

কোথায় ?

যেখানে আত্মসম্মান বজায় রেখে থাকা যাবে সেখানে।

জায়গাটা কোথায় শুনি ?

সে উত্তর আগেই দিয়েছি, আর কিছু বলার নেই।

দেখছি বংশগত পাগলামি রয়েছে তোমার মাথায়।

এরপর আর কোন কথার জবাব দেবার প্রবৃত্তি হলো না সুদীপার। সে ঘরের ভেতর থেকে উলুর হাত ধরে নিয়ে এসে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও উলু, আমি গাড়ী ডেকে আনছি।

উলু আমার মেয়ে, আমি ওকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

এবার সুদীপা কঠিন গলায় বলল, তুমি কি কোর্টকাচারি করতে সত্যিই চাও ? তাতে তোমার শত্রুপক্ষেরই সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি। জাতীয় সম্মান-প্রাপ্তির পথটা অত সুগম হবে না।

একটু কি ভেবে নিল ইন্দ্রনাথ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ বাসাটা আমার নয়, তোমার। সুতরাং আমিই সরে যাচ্ছি। মেয়েকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর কতকগুলো সংস্কারের চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাক এখানে।

চলে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। সুদীপা বলল, তোমার জিনিসপত্র, এই উপহার, সব নিয়ে যাও এখান থেকে। আর ইচ্ছে করলে পাঠিয়ে দিও বিচ্ছেদ-পত্র, আমি সই করে তোমাকে মুক্তি দেব।

সেই থেকে ছ'বছর হলো এই বাসাতেই সুখে-দুঃখে কাটিয়ে যাচ্ছে মা আর মেয়ে। স্বাধীন অথচ সংযত চিন্তার বিকাশ যাতে ঘটে মেয়ের মধ্যে সেই চেষ্টাই নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে সুদীপা।

ছ'বছরের ভেতর ইন্দ্রনাথ একটিবারের জন্যেও মেয়েকে দেখতে আসেনি। হয়ত অভিমান, হয়ত বা সুদীপার কাছে হেরে যাবার ভয়। নারীর কাছে পৌরুষ হারানোর ভয়।

কেবল ক্ষীণ একটি সুতোর সংযোগ রয়েছে এখনও। উলুর জন্মতিথিটি কখনও ভোলে না ইন্দ্রনাথ। ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় কিছু উপহার।

হঠাৎ পাওয়া উপহারে খুশি হয়ে ওঠে উলু, আবার ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকায়।

সুদীপা বলে, ইচ্ছে হলে তুমি নিশ্চয়ই নিতে পার। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যেমনই হোক্, ভুলে যেও না তুমি ইন্দ্রনাথ চৌধুরীরই মেয়ে।

উলু বাবার দেওয়া উপহারগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চোখ দুটো উদ্গত অশ্রুতে ভিজে ওঠে।

॥ ৩ ॥

কলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়ছে উলু। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিংএ এখন বেশ নামকরা ছাত্র রাজর্ষি বোস। কিন্তু স্কুলের সেই আনন্দ মুহূর্তগুলো মুছে যায়নি দুজনের মন থেকে। দু'টি পরিবার এখন অনেক ঘনিষ্ঠ। সদানন্দবাবু সপরিবারে যখন দেশের বাড়িতে যান তখন তাঁদের সঙ্গে যান সুদীপা আর উলু। আনন্দ-ভ্রমণে সবাই তখন এক হয়ে মিশে যান।

প্রায় প্রতি রবিবার সুদীপার ডাইনিং হলে একটি চেয়ার অধিকার করে বসে রাজর্ষি! '

কি রান্না করেছ আজ মাসীমা আমার জন্যে ?

উলু উত্তর দেয়, ইস্ তোর একার জন্যে, আমার জন্যে বুঝি নয়।

ভেতর থেকে সুদীপা বলেন, ঝগড়া না করে গল্প কর, আমি এখুনি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

উলু বলল, একটা কবিতা পড়বি ?

নতুন লিখেছিস ?

মাথা নেড়ে জানাল উলু, লেখাটা নতুনই।

ঋষি বলল, আমি পড়ব, না তুই পড়বি ?

তুই পড়।

না না, তোর লেখা তোর মুখেই শুনব।

উলু উঠে গিয়ে তার কবিতার খাতাখানা আনল। শুরু হল পড়া!

যে পাখিরা এখনও বাঁধেনি নীড়
তারা পাখা টেনে টেনে
আকাশ সাগরে ভেসে যায়।
সোনালী ঢেউএর খেলা
রুপোলী ঢেউএর খেলা
পার হতে হতে সেই ভেলা

কোন নামহারা সবুজের
সীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
যেতে যেতে নোঙর নামায়।
সব বন, সব গাছ তাদের আশ্রয়।
বিশেষ বনের কাছে তাদের মনের
কোন দায় নেই,
বাঁধনের নেই কোন টান।
আকাশের সীমানা কোথায়?
নাকি সীমানাবিহীন?
সোনালী রূপোলী ঢেউ
সে কি অনাদিকালের ওঠাপড়া?
সবুজ কি মরে না কখনো?
শুকনো বীজের মধ্যে
নিজেকে লুকিয়ে রাখে বন;
সমস্ত রঙকে ঐ বীজের কৌটোয়
বন্দী রাখে।
হে আকাশ,
সোনালী রূপোলী ঢেউ,
আমাদের ভাসাও ভাসাও।
হে অরণ্য পান্থশালা
দাও দাও ক্ষণিক আশ্রয়।
আবার ভাসাও—
অফুরন্ত এই প্রাণ নীড়হারা আনন্দ-যাত্রায়।

ঋষি বলল, দারুণ! মাসীমা শুনেছ উলুর কবিতা?

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, এইমাত্র শুনলাম। একেবারে নিজেদের ছবি এঁকেছে। কোন মুখই অচেনা নয়।

ডাইনিং হলের ভেতর দু'টি তাজা কণ্ঠের হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এই আনন্দ কলরব, এই হাসি গান একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল। সুদীপার ঘরে অপ্রয়োজনে আর একটিও অতিরিক্ত বাতি জ্বলল না। ভেঙে গেল ছুটির দিনে আনন্দের হাট। একটা চাপা কান্না দেওয়ালগুলোর কোণ থেকে, বালিশের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

এক রোববার রাজর্ষি আসতে সুদীপা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা। আমি তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম বলতে পার।

উলু কোথায় মাসীমা ?

ও পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

শুয়ে আছে কেন ?

তাই বলতে তোমাকে ডেকে এনেছি এখানে।

রাজর্ষি উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল সুদীপার দিকে। অত্যন্ত শক্ত মনের মেয়ে সুদীপা। তার বাইরের নম্র সংযত আচরণ দেখে কখনও বোঝা যাবে না তার ভেতরের ভাব ভাবনার গতি প্রকৃতি।

শোন ঋষি, কাল থেকে উলু চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

সে কি ! কেন মাসীমা ?

বিচলিত হয়ো না। কাল ওর টি-ভি রেকর্ডিং ছিল। রেকর্ডিং শেষ করে অনেক দৌড়ঝাঁপের পর একটা ট্যাক্সি পেলাম। ট্যাক্সিতে এসে নামলাম বাড়ির সামনে। আর ঠিক তখনই মনে হলো, ওর রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। সন্ধ্যা কিন্তু তখনও গাঢ় হয়নি। ওর হাত ধরে বারান্দার চেয়ারে এনে বসালাম। ভাবলাম, ভেতরের দুর্বলতায় অনেক সময় মানুষ চোখে অন্ধকার দেখে। একটু বিশ্রাম করলেই কেটে যাবে। কিন্তু বেশ কিছু সময় বসার পরেও যখন ওর সে অবস্থা কাটল না তখন ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মনে হল, দীর্ঘ সময় ঘুমের ভেতর থাকলে ওটা কেটে যাবে।

কিছু খায়নি রাতে ?

মাঝখানে একবার তুলে দুধ পাউরুটি খাইয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর ?

ভোরবেলা দেখলাম, চোখের অবস্থা আরও খারাপ।

ডাক্তার সোমকে ডাকনি ?

এইমাত্র সেখান থেকে এলাম। কোন ওষুধ দেন নি। সব শুনে বললেন, আই স্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এখন রোববার, কার কাছে যাই। বড় ভাবনায় পড়লাম ঋষি।

কিছু চিন্তা কোর না মাসীমা, আমি দেখছি।

রাজর্ষি উলুর ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে বলল, কি হল রে তোর ?

উলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

ও ঠিক হয়ে যাবে। রেডি হয়ে থাক, আমি এসে চোখের ডাক্তারের কাছে তোকে নিয়ে যাব।

রোববার অনেক খুঁজে ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে অ্যাপায়েণ্টমেণ্ট করে ফিরে এল ঋষি। একটা ট্যাক্সি ডেকে সুদীপা আর উলুকে তুলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল চোখ দেখাতে।

অনেক সময় নিয়ে ডাক্তার মুখার্জী চোখ দেখলেন, হঠাৎ কি মনে হলো, প্রেসার দেখে তিনি কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

উলুকে ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ঋষি আর সুদীপাকে বললেন, আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ব্যবহার করলেই দু'চারদিনের ভেতর ভিসনেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু ওব আসল রোগ চোখে নয়, ওর অ্যাবনরমাল হাই ব্লাড প্রেসারই চিন্তার কারণ। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তাব সেনের কাছে নিয়ে যান। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার সেন প্যাথলজিকাল টেস্ট, এক্স-রে ইত্যাদি করে শেষ পর্যন্ত বললেন, কিড্‌নি ড্যামেজ হয়েছে। এখুনি ডায়ালিসিসের দরকার।

ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যাতে সুদীপা সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু উলুর মুখোমুখি হলেই তিনি মুখে প্রসন্নতার ছবি ফুটিয়ে বলতেন, অসুখ করেছে, একটু ভুগতেই তো হবে মা।

এদিকে ডাক্তার সেনের কাছ থেকে জানা গেছে, এসব রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নেই। তবে দক্ষ সার্জেন যদি কিড্‌নি ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করেন তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর নিরাময়ের সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্যই এই ট্রান্সপ্ল্যাণ্টের ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তিন-চার লক্ষ টাকা দিতে হবে হস্‌পিট্যালে। কিড্‌নির ডোনার চাই। যে কেউ কিড্‌নি দিলেই চলবে না। রোগীর সঙ্গে রক্তের গ্রুপের মিল থাকা চাই। তাছাড়া কিড্‌নির টিস্যু ম্যাচিং হওয়া চাই।

কোথায় এত অর্থ, কি করেই বা মিলবে ম্যাচিং কিড্‌নি।

সুদীপা মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলেন, আমি জ্ঞানত কোনদিন কারো ক্ষতি করিনি মা। আমি গভীরভাবে তাই বিশ্বাস করি আমাদের ওপর হঠাৎ নেমে আসা এই মেঘ কেটে যাবেই যাবে।

উলু বলে, আমিও তাই বিশ্বাস করি মা। এই যে প্রতিদিন ঋষি এসে আমাদের এত কিছু করে যাচ্ছে, এর কি কোন মূল্য নেই? আমি সেরে উঠবো মা। তোমাদের সকলের ভালবাসা আমাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দেবে।

ঋষি এসে ঘরে ঢুকল। মা মেয়ে দুজনের মুখই ভাবাবেগে গম্ভীর দেখে সে ফিরে যাচ্ছিল, পেছন থেকে উলু তার হাতখানা টেনে ধরল।

ছেড়ে দে এখন, বাইরে একটু কাজ সেরে আমি আবার ফিরে আসব।

কোন উত্তর না দিয়ে উলু জোর করে রাজর্ষির হাতখানা চেপে ধরে রইল।

ডায়ালিসিস চলছে। এখন ঘন ঘন ডায়ালিসিসে বেরিয়ে যাচ্ছে জলের মত টাকা। সুদীপা বেচে দিয়েছেন তাঁর সোনার গয়না। শুধু প্রাণ ধরে বেচতে পারেন নি মায়ের সোনায় বাঁধানো চিরুণীটা। এটা নাকি মাকে দিয়েছিলেন তাঁর মা। দিদিমা বলতেন এটা আমার সৌভাগ্যের শিরোভূষণ। সত্যিই তিনি সৌভাগ্যবতী ছিলেন। খ্যাতিমান ডাক্তার-স্বামীর কোলে মাথা রেখেই চোখ বুজেছিলেন। তার ওপর সুদীপার মা তাঁর স্বামীকে পেয়েছিলেন একজন বিদ্বান, সৎ ও ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হিসাবে। তিনিও স্বামীর সেবা পেয়েই চলে গেলেন।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়ল সুদীপার কিন্তু কেন জানি না, সে কথা ভেবেও চিরুণীটা বেচতে পারল না।

ভেলোর অথবা চণ্ডীগড়ে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে, শেষ চেষ্টা করতে হবে বাঁচাবার।

ইতিমধ্যে পত্রিকার অফিসগুলোতে ঘোরাঘুরি করে বিনি পয়সায় সর্বসাধারণের কাছে আবেদন পৌঁছে ব্যবস্থা করেছে রাজর্ষি। রোগী বিব্রত হতে পারে তাই সমস্ত দাতাকে তারই বাড়ীর ঠিকানায় সাহায্য পাঠাবার জন্য আবেদন জানান হয়েছে। কোথাও রোগিণীর নামের উল্লেখ পর্যন্ত হয়নি। অবশ্য পরবর্তী অধ্যায়ে রোগিণীর নাম দিয়েই রিপোর্টাররা খবর ছাপতে শুরু করেছিলেন।

সুদীপা আর উলুর সঙ্গে রাজর্ষি গেল চণ্ডীগড়ে। ওদের ওখানে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করে দিয়েই ও ফিরে আসবে। নিজের লেখাপড়ার জন্যেই শুধু নয়, বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের বিরাট দায়িত্ব তার ওপর। অবশ্য এ গুরু দায়িত্ব সে নিজেই তুলে নিয়েছে কাঁধে।

চণ্ডীগড়ে নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ শর্মা রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, অল্প দূরেই গোলাপ বাগ, তোমরা ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পার। খুবই সুন্দর।

সুদীপা অবাক হলেন ডাক্তারের কথায়। যেখানে রোগীর জীবন মরণ সমস্যা সেখানে হঠাৎ ডাক্তার দিচ্ছেন গোলাপ বাগের সন্ধান।

রাজর্ষি বলল, গোলাপ বাগ থেকে ফিরে এসে আমরা হসপিট্যালে অ্যাডমিশান পাব তো ডাক্তার?

অবশ্যই।

রোগীর অবস্থা কি রকম দেখলেন?

ফিরে এসো, কথা হবে।

ওরা একখানা অটো ভাড়া করে গোলাব বাগে পৌঁছে গেল।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাগানটি বড় বিস্তৃত। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যায় না। এই স্বর্গীয় বাগানে শুধু গোলাপ ফুটে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে সংগ্রহ করা গোলাপ।

সুদীপা আপন মনে এগিয়ে চলেছেন। বুক ভরে প্রার্থনা, হে গোলাপ, তুমি তোমার বর্ণ গন্ধ দিয়ে ফুটিয়ে তোল আমার উলুকে। এই ফুটে ওঠার কালে তাকে ঝরিয়ে দিও না।

রাজর্ষি ডান হাতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলেছে উলুকে। সম্পূর্ণ না হলেও উলু আংশিক ভার রেখেছে ঋষির ওপর। খুবই আস্তে চলেছে তারা।

রাজর্ষি বলল, সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা এসেছে বিউটি কণ্টেস্টে। দেখ দেখ, পোশাকের কি বাহার! তুইও নাম দিবি নাকি রে?

আচ্ছা ঋষি সত্যি করে বল, এখন না হয় রোগে চেহারাটা আমার খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু কিছুদিন আগেও কি আমি এমনি ছিলাম?

রাজর্ষি বলল, আমি মজা করছি তোর সঙ্গে। আর তুই কথাটা অন্যভাবে নিলি। অসুখের সময় কার শরীর ভাল থাকে রে। আবার অসুখ সেরে গেলে সব আগের মত হয়ে যায়।

একটু হেঁটেই হাঁপাচ্ছিল উলু। রাজর্ষি তাকে ধরে এক জায়গায় বসাল। নিজেই তার পাশে বসল।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে উলু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

দেখ দেখ, প্রজাপতিগুলো পাখনা মেলে কেমন নাচছে! সিওলে এশিয়াড হল। ওদের দেশের মেয়েরা সাদা পোশাক পরে ডানা কাঁপিয়ে নাচল। ঠিক যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি।

হঠাৎ রাজর্ষির একখানা হাত নিজের দু'হাতের ভেতর চেপে ধরল উলু। হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। চোখ দুটোতে জলছায়া।

কি হল আবার?

আমি কি আর প্রজাপতির মত, সিওলের ঐ নর্তকীদের মত নাচতে পারব?

না, তা তুই পারবি না, কোনদিনও তেমনটি পারবি না। তবে উলু চৌধুরী যা পারবে তারা তা কোনদিনও পারবে না। তোর নাচ, তোর গান একেবারে তোর নিজস্ব। তোকে আমি আগামী বছর আমাদের সোস্তালে গান গাওয়াবই।

উলুর খুব ভাল লাগল রাজর্ষির কথাগুলো। তবু বলল, বেঁচে থাকলে গাইব।

তোকে মরতে দিলে তো। অত সহজ নয় রে মরা।

সত্যি, রাজর্ষির কত প্রাণশক্তি! ও কাছে থাকলে মনে হয়, তিল তিল করে রাজর্ষির প্রাণের ছোঁয়া সঞ্চারিত হচ্ছে ওর ভেতর।

সুদীপা ফিরে এসে বসলেন ওদের কাছে।

উলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, শোন মা, ঋষি বলছে ও নাকি আগামী বছর ওদের ফাংশানে আমাকে ইনভাইট করে নিয়ে গিয়ে গান গাওয়াবে।

তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে নিশ্চই গাইতে পারবে মা। আমার গভীর বিশ্বাপ তোমাকে আমরা একেবারে আগের মত সুস্থ করে তুলতে পারব।

চণ্ডীগড়ে পি, জি, আই, হস্পিট্যালের নাম ভারতেব বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে ভেলোর, যশলোক, অন্যদিকে চণ্ডীগড়। সেরা ডাক্তারদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিভাগ।

ডাঃ শর্মা বসেছিলেন ওঁর রুমে। ওদের দেখে বললেন, কেমন লাগল?

উলুই প্রথম কথা বলল, না গেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু হারাতাম।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমি সারাদিনে একবার অন্তত ওখানে যাই।

কেন যান? শুধু ভাল লাগে বলে?

কেমন করে বাঁচতে হয় তাই শেখার জন্যে। কত স্বল্প সময় তার ডালে থাকার মেয়াদ তবু কি আনন্দ, কি গৌরবে তার বেঁচে থাকা।

সুদীপা বললেন, ডাক্তার শর্মা, আপনি একজন কবি ও দর্শনিক, তা না হলে এমন করে কথা বলতে পারতেন না।

ডাক্তার শর্মা হেসে বললেন, এখন কিন্তু আমি পুরোপুরি ডাক্তার। মিস চৌধুরীকে আমি পরীক্ষা করে অ্যাডমিট করে নেব। আপনারা আপনাদের আস্তানায় নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।

রাজর্ষি বলল, ডাক্তার শর্মা, আজ রাতের গাড়িতে আমি ফিরে যাচ্ছি। কেবল মা আর মেয়ে এই হাসপাতালেই থাকবে। মেয়ে রোগী, মা তার সেবিকা।

ডাক্তার সুদীপার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি হোটেলে থাকবেন না?

ওটুকু টাকাও এখন আমার কাছে একান্ত দরকারী। আমি এই হস্পিট্যালের কোথাও না কোথাও ঠিক থেকে যেতে পারব।

রাজর্ষির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন সুদীপা। উলুকে নিয়ে নার্সরা চলে গেল ভেতরে।

রাজর্ষি বলল, এখানে তুমি কোথায় থাকবে মাসীমা?

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, বিরাট হাসপাতালের একটা কোণে আমি ঠিক থেকে যাব। তাছাড়া চলার পথে নার্সদের মুখে আমি যে মিষ্টি হাসিটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে বিপদে ওদের সাহায্য ঠিকই পাব।

আমি তোমাকে কোন ঠিকানায় টাকা পাঠাব?

সুদীপা খুবই শক্ত মনের মেয়ে, তবু এই মুহূর্তে চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠল। তিনি রাজর্ষিকে কাছে টেনে নিয়ে তার হাতটা কিছুক্ষণ চেপে ধরে রইলেন। এই নিঃস্বার্থ যুবকটির ভেতর সমুদ্রের মত বিশাল একটি মনের পরিচয় পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। অসুস্থ বন্ধুর জন্য এতখানি করা, সে বোধকরি এই বয়সের তরুণরাই পারে।

সুদীপা বললেন, আমার গয়না বিক্রির কিছু টাকা সঙ্গে এনেছি। ডায়ালিসিস্ কয়েকবার ঐ টাকাতেই চালিয়ে নেব। পরে অপারেশনের দরকার হলে টাকা লাগবে।

আরো কিছু টাকা হঠাৎ কোন দরকারের জন্য কাছে রাখা ভাল। আমি কি ডাঃ নেগীর নামে এই হাসপাতালের ঠিকানায় পাঠাব?

সুদীপা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন।

ইউরিমিয়া স্টার্ট করে গিয়েছিল। এখন ঈশ্বরের হাতের সূক্ষ্ম সুতোর ওপর বাঁচা মরা নির্ভর করছে। লাংসে, পেটে জল জমে গিয়েছিল। সারা শরীর ফুলে উলুকে আর কোন রকমে চেনা যাচ্ছিল না। ডায়ালিসিসের ফলে উপসর্গগুলো কমে গেল। শেষে ফোলা কমে গিয়ে সারা শরীর কংকালের আকার ধারণ করল। ভেতরে চেতনা আছে রোগীর কিন্তু বাহ্যজ্ঞান প্রায়ই থাকে না।

সুদীপা তাঁর আশ্চর্য এক আকর্ষণীয় প্রভাবে হাসপাতালের সমস্ত নার্স আর রোগীদের বড় প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন। নার্সরাই তাঁকে স্টোভ আর রান্নার সামান্য সরঞ্জাম এনে দিল। দিনান্তে একবার মাত্র তিনি খাবার তৈরি করে নিতেন। হাসপাতালের একটি প্রান্তে শতরঞ্চি বিছিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন।

কোন রোগীর কাছে গিয়ে বললেন, কেমন আছেন বাবা? আজ মুখ-চোখের চেহারাটি বেশ ভালই মনে হচ্ছে।

অন্যজনের কাছে গিয়ে বললেন, অত দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? মিঃ সিথাপ্প মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই এসে পড়বেন। আমি তাঁকে অফিস রুমে কথা বলতে দেখে এলেছি। হয়ত দু'একদিনের ভেতর তোমার ছুটি হয়ে যাবে।

নতুন বউটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

স্বামী দরজা দিয়ে ঢুকতেই বেডের কাছ থেকে সরে গেলেন সুদীপা। হলের কোণ থেকে বলে উঠলেন শুভ্র শ্মশ্রুওয়ালা এক বৃদ্ধ, কি মা, তুমি তো আমার কাছে এলে না আজ ?

সুদীপা হেসে বললেন, আসছি বাবা।

নিচে নেমে গেলেন সুদীপা। এ সময় একটা লোক ফুল নিয়ে বসে। সুদীপা তার কাছ থেকে সুন্দর একটি গোলাপ কিনে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। হলের সেই বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে গোলাপটি দিয়ে বললেন, এটি আপনার জন্য এনেছি বাবা।

বৃদ্ধটি গোলাপটি হাতে নিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। সুদীপা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সে সময় শুধু তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার মুখখানা।

বৃদ্ধ বললেন, কেমন আছে মা তোমার মেয়ে ?

আপনাদের সকলের কাছে আমি আসি বাবা, ওর জন্য দয়া ভিক্ষা করতে।

বৃদ্ধ বললেন, ভগবান্ যদি আমার সামান্য পরমায়ু টুকু ওকে দেন তাহলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে মা।

আমি মেয়ের জন্য কারু পরমায়ু চাই না বাবা, কেবল চাই আশীর্বাদ।

বৃদ্ধ চোখ দু'টি বন্ধ করে করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে সুদীপার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সেদিন সুদীপা করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা ভেতরের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দুই গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সুদীপা সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েটিকে টেনে নিলেন বুকের কাছে।

কি হয়েছে বোন, কাঁদছ কেন ?

জানা গেল মেয়েটির স্বামী সেরিব্রাল অ্যাটাকে চেতনা হারিয়ে এখানে রয়েছেন। ডাক্তারেরা বলেছেন, বাহাত্তর ঘণ্টার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়।

সুদীপা বললেন, কিছু ভেব না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুদীপার আন্তরিক ব্যবহারে মেয়েটি বড় শান্তি পেল। সুদীপা যখন শুনল বাহাত্তর ঘণ্টা না পেরুলে মেয়েটি কিছুই খাবে না তখন জোর করে তাকে নিজের ঐ আস্তানায় টেনে নিয়ে গিয়ে দুধ আর ফল খাওয়ালেন। বললেন, মনে আনন্দ রাখ, না হলে আনন্দময়ের আশীর্বাদ পাবে কি করে।

ক'দিন পরে মেয়েটি পেছন থেকে সুদীপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমাকে

সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি দিদি।

সুদীপা ঘুরে দেখলেন, সেই মেয়েটি। একটু দূরে তার স্বামী দাঁড়িয়ে হাসছেন। এইমাত্র রিলিজ অর্ডার পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

তোমাদের দেখে খুব খুশি হলাম বোন। তুমি তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি যোগাযোগ রাখব। আর দিদির একটা কথা মনে রেখ, যত বিপদই আসুক, মনটাকে যতদূর সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করবে।

এক সন্ধ্যায় ডাক্তার শর্মা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ সুদীপাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে হাসপাতালের বাইরে দেখা করতে বললেন।

সুদীপা বেরিয়ে এলেন হাসপাতালের বাইরে।

ডাক্তার শর্মা বললেন, চলুন, পায়ে হেঁটে একটু সান্ধ্যভ্রমণ করি। সেই সঙ্গে আপনাকে কয়েকটা কথা বলার আছে।

ডাক্তার তাঁর গাড়িখানা বিশেষ একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মিসেস চৌধুরী, প্রায় দু'মাস মেয়েকে নিয়ে আপনি এখানে রয়েছেন। আপনি কিভাবে রয়েছেন তা আমার অজানা নয়। তাছাড়া হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে আপনার আচরণ কেবল সিস্টারদের নয়, আমাকেও অভিভূত করেছে। অন্যদিকে আমি আপনার ঐ ফুলের মত সুন্দর মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারছি না।

এইখানে সুদীপা বাধা দিয়ে বললেন, ডাক্তার শর্মা, আপনি যেভাবে আমার মেয়ের চিকিৎসা করছেন, তাকে স্নেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছেন, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। এরপর আমার ভাগ্য আর আমার মেয়ের ভাগ্য।

কিন্তু মিসেস চৌধুরী, স্নেহ আর সেবা দিয়ে এ ধরনের রোগীকে যে সারিয়ে তোলা যায় না, তা আপনি জানেন।

সুদীপা বললেন, আমাকে তো আপনারা পরীক্ষা করেছেন, আমার রক্তের গ্রুপ 'ও'। ম্যাচিং টিসু। সুতরাং আমার একটা কিড্‌নি মেয়েকে দিতে কোন অসুবিধেই নেই।

সে সব ঠিক আছে মিসেস চৌধুরী। কিন্তু এ দেশে কিড্‌নি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারটা এখনও অনেকটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। এখানকার সার্জেন রোগীদের নিয়ে একটা পরীক্ষা চালাচ্ছেন মাত্র। আপনি কি চান আপনার মেয়ে এখানে একটা গিনিপিগের মত অপারেশান টেবিলে উঠুক?

আপনার কথা শুনে বড় অসহায় মনে হচ্ছে ডাঃ শর্মা। শুনেছি দেশের বাইরে গিয়ে অপারেশান করাতে চাইলে কয়েক লাখ টাকার দরকার। আমি যে কপর্দকশূন্য।

আমি আপনার মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেই আমার ছোট মেয়েটির মুখের সঙ্গে বড় সাদৃশ্য দেখতে পাই। তাই ওকে আমি এই পরীক্ষার ভেতর ফেলে দিতে চাইছি না। আপনি যে করে পারেন ওকে ইণ্ডিয়ার বাইরে নিয়ে চলে যান।

কোথায় নিয়ে যাব আপনি বলে দিন?

ডাঃ শর্মা বললেন, লস্‌এঞ্জেলসে সেণ্ট ভিনসেণ্ট মেডিকেল সেণ্টার রয়েছে। ওখানে ডাক্তার রবার্ট মেঙেস যদি রোগীকে হাতে নেন তাহলে আপনার মেয়ে পুনর্জীবন লাভ করতে পারে।

সুদীপা মেয়েকে নিয়ে এক মুহূর্ত দেরি না করে কলকাতায় ফিরে আসতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই কি আসা যায়। সার্জেনরা কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। শেষে ডাক্তার শর্মা বিলিজ অর্ডার লিখে মা আর মেয়েকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। ট্যাক্সি ছুটে চলল এয়ারপোর্টের দিকে। হাতে এমন পয়সা নেই সুদীপার যে তিনি প্লেনের দুটো টিকিট কিনতে পারেন। তবু তাঁর মনে হলে প্রায় একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে তিনি তাঁর মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

বিধাতার আশ্চর্য খেলা, পথের ধারে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি দেখেই হাত তুললেন। ড্রাইভার পাশ করে চলে যাচ্ছিল, সুদীপা তাকে ট্যাক্সি থামাতে বললেন।

ট্যাক্সি থামলে ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন।

অত্যন্ত করুণ গলায় বললেন, আমার প্লেন ছাড়তে আর বেশি বাকি নেই কিন্তু একটা অটো অথবা ট্যাক্সি পাচ্ছি না। আপনারা কি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন?

সুদীপা বললেন, হ্যাঁ। উঠে আসুন।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে গাড়িতে উঠলেন। সুদীপা কথায় কথায় জানতে পারলেন ভদ্রলোক ভাকরা নাঙালের চিফ ইনজিনিয়ার।

উমুর অসুখের কথা শুনে এবং কেমন করে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে মা হসপিট্যাল ছেড়ে চলে এসেছেন জানতে পেরে অভিভূত হলেন ইনজিনিয়ার সাহেব।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলেন, তাঁর ফ্লাইট বিশেষ কারণে ক্যানসেল হয়েছে। অমনি ভদ্রলোক টিকিট কেটে আনলেন।

অসহায়ের মত লাউঞ্জে বসেছিলেন সুদীপা, মেয়ের মাথাটা কোলে নিয়ে। ভদ্রলোক টিকিট দুখানা উলুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই সামান্য উপহারটুকু তোমাকে দিলাম। তারপর সুটকেশ খুলে চেক বই বের করে আড়াই হাজার টাকার একটা অঙ্ক লিখে নাম সই করলেন। সুদীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ট্যাক্সি ফেয়ারের কিছুটা অংশ আমাকে শেয়ার করতে দিলে খুবই তৃপ্তি পাব।

ভদ্রলোক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মা আর মেয়েকে প্লেনে তুলে দিলেন।

সুদীপা জানলার ধারে বসে শুধু চেয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। ঈশ্বরের করুণা যে কোন্‌পথে নামে তা কে বলতে পারে।

॥ ৪ ॥

রাজর্ষি চণ্ডীগড থেকে ফিবে এলে সদানন্দবাবু আর ললিতা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সদানন্দ বললেন, সংবাদপত্রে 'একটি তরুণী মেয়ের জীবনসংশয়,' বিজ্ঞাপনটি বেরুনোর পর থেকে প্রতিদিন এই ঠিকানায় অজস্র চিঠি আসছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা ইতিমধ্যেই জমে গেছে ঋষি।

এত বিপদের ভেতরেও খুশী হয়ে উঠল রাজর্ষি। তাহলে মানুষ এখনও পুরোপুরি মেসিন হয়ে যায়নি। প্রাণের ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করতে পারলে করুণার ধারা এখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

খানিক বিশ্রামের পর সে চিঠিগুলো নিয়ে বসল।

গ্রাম বাংলার এক দর্জির চিঠি তার হাতে পড়ল। লোকটি লিখেছেন, সারাদিন রোজগার করে আমি আমার সংসার চালাতে পারি না। কিন্তু কাগজের খবরটা শুনে দিলটায় বড কষ্ট হলো। তোমার জন্যি পাঁচটা টাকা পাঠালাম মা, আর আল্লার দোয়া মাঙছি।

আর এক ছাপোষা কেরাণীর চিঠি—আমার বৃদ্ধা মা মরণাপন্ন। তাঁর টিনের সুটকেশে সারা জীবনের সঞ্চয় পাঁচশো তেইশ টাকা। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী টাকাটা আপনাদের ঠিকানায় পাঠালাম। সঙ্গে যোগ হলো আমার সাত বছরের ছেলের টিফিনের পয়সা থেকে জমানো এগারোটি টাকা।...

একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা ভবতারিণীর চরণে উলুর নিরাময়ের জন্য পুজো দিয়ে একটি প্রসাদী বেলপাতা আর একশো এক টাকার নোট পাঠিয়েছেন। টুকরো বেলপাতাটি এসেছে খামে আর টাকা এসেছে মণি অর্ডারে। দু'ছত্র চিঠিও লিখেছেন, আমার মেয়েটি স্কুলে পড়তে পড়তেই ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে। আমার আর মা ভবতারিণী ছাড়া কেউ নেই। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে তোলেন।

গীর্জায় উলুর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করে নানেরা ললিতা দেবীর কাছে একটি অতি সুন্দর ব্যাগে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। ঐ ব্যাগের ভেতর লাল, সবুজ, হলুদ কাগজের একটা গোছা। তার প্রত্যেকটির ওপর প্রভু যীশুর অমরবাণী লেখা রয়েছে।

শুধু টাকা নয়, শুধু হৃদয়ের উত্তাপে ভরা চিঠি নয়, একাধিক মানুষ তাদের রক্তের গ্রুপ জানিয়ে কিডনি দেবার জন্য প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে রাজর্ষির মনে হল, সে ছুটে যায় উলুর কাছে। পড়িয়ে আসে চিঠিগুলো। বলে আসে, মানুষ মরেনি, মরে না কখনও।

রাজর্ষির হাতে তখনও ধরা আছে একটা চিঠি। ইনসিওর করে একটা টাঙাওয়ালা চিঠি আর সোনার দুটো চুড়ি পাঠিয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকে।

লিখেছে, আমি আগে ডাকাতি করতাম, এখন টাঙা চালাই। খুব বর্ষা পড়ছিল এক রাতে। পথঘাট জলে ডুবে গিয়েছিল, কোন গাড়ী বের হল না রাস্তায়। আমি এক ভদ্র ঘরের জেনানাকে ঠিক সময়ে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দিলাম। তাঁর ছেলের ভারি বিমারের টেলিগ্রাম এসেছিল। ট্রেনে উঠতে পেরে তিনি এমন খুশী হয়েছিলেন যে আপনার হাত থেকে দুটো চুড়ি খুলে দিলেন। আমার কোই নেই। চুড়ি দুটো পাঠালাম। খুকির বিমার ভাল হলে বহুৎ শান্তি মিলবে।

এ চুড়ি বেচবে না রাজর্ষি। এমন চুড়ি জীবনের বিনিময়েও বেচা যায় না। আর ঐ দর্জির পাঁচটা টাকা সে বাঁধিয়ে রেখে দেবে।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে কয়েকখানা চিঠি নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একখানাতে চোখ আটকে গেল। এক ভদ্রলোক লিখেছেন: রাজর্ষিবাবু, সংবাদপত্রে অল্পবয়সী মেয়েটির অসুস্থতার খবরে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছি। আমার বাসার ঠিকানা ও পথনির্দেশ দিয়ে পাঠালাম। আশাকরি খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। নির্দিষ্ট স্টপেজে বাস থেকে নেমে যে চায়ের দোকানটি দেখবেন ব্রজগোপাল বিহারের নাম জিজ্ঞেস করলেই ওদের কেউ আপনাকে এখানে পৌঁছেও দিয়ে যেতে পারে। আপনি এলে সব কথা হবে। আমি ঐ

অসুস্থ মেয়েটির ব্যাপারে আপনাকে হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারি।

নাম প্রকাশে আমি অনিচ্ছুক। যে কোন দিন চারটের পর 'ব্রজগোপাল বিহারে' এলেই আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

চিঠিখানা পকেটে নিয়েই কলেজ থেকে গড়িয়া এসে সোজা নরেন্দ্রপুরের বাস ধরল রাজর্ষি। নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে সেই চায়ের দোকান। দু'তিনটি যুবক চা খাচ্ছিল। তাদের কাছে 'ব্রজগোপাল বিহারের' নাম করতেই একটা ছেলে বেরিয়ে এল। হাত উঁচিয়ে খোয়া ফেলা একটি রাস্তা দেখিয়ে বলল, ঐ রাস্তায় চলে যান। যেতে যেতে নারকেল গাছ ঘেরা একটা পুকুর আর টালির বাড়ি পাবেন।

বলতেই বলতেই ছেলেটি থেমে গেল। চায়ের দোকানের কাউকে বলল, আমি এখুনি আসছি। তোরা যেন আবার চলে যাস না।

রাজর্ষিকে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজর্ষি ছেলেটির পাশে পাশে যেতে যেতে বলল, ওখানে কি কাজটাজ হয় ভাই।

তাও জানেন না, ওখানে অনাহারি মাস্টারমশায় থাকেন। বিনি পয়সায় এ তল্লাটের সব ছেলেমেয়েদের পড়ান।

অনাহারি মানে?

ঐ তো বললাম, মাইনে নেন না।

ওটা কি ফ্রি স্কুল?

না মশায়, স্কুলটুল নয়। আশপাশের ইস্কুল থেকে ছুটির পর দল বেঁধে ছেলে মেয়েরা আসে। তারা বিনি পয়সায় অঙ্ক শেখে, ইংরাজীর পড়াটড়া গ্রামেরট্রামার বুঝিয়ে নেয়। এমন মাস্টার নাকি ভূ-ভারতে নেই। আমার ভাইটাও আসে।

যুবকটি রাজর্ষিকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। রাজর্ষি কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে দেখল, সৌম্য চেহারার একটি মানুষ বাঁধান ঘাটের পাটে বসে আছেন। সে মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি কোত্থেকে বাবা?

আমাকে আপনি দেখা করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। আমিই রাজর্ষি। ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিংএর ছাত্র। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে রাজর্ষির হাত ধরে বললেন, আমি সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির তলায় আপনার নাম দেখে ভেবেছিলাম, আপনি মেয়েটির নিশ্চয়ই অভিভাবক। বয়স্ক ব্যক্তি।

না, আমি ওর অভিভাবক নই।

মেয়েটি কি আপনার বোন ?

না, বন্ধু। স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম। দেখুন, আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে খুব খারাপ লাগবে।

ঠিক আছে। খবরের কাগজে মেয়েটির নাম ছিল না, কি নাম ওর ?

উলু চৌধুরী।

কি বললে !

রাজর্ষি আবার নামটা উচ্চারণ করে বলল, আপনি চেনেন নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন, প্রায় সবাই ওকে চেনে। রেডিওতে ও অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান গায়। ওর গান শুনলে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখে জল এসে যায়।

হ্যাঁ, গানের ব্যাপারে আমার বন্ধুটি অনেকেরই পরিচিত।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি এসো বাবা আমার সঙ্গে।

ঘরের ভেতর রাজর্ষিকে এনে বসালেন। বাইরের আলোয় তখন কাঁচা হলুদের রঙ লেগেছে।

ভদ্রলোক রাজর্ষির পাশে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জিজ্ঞেস করলেন। শেষে বললেন, চণ্ডীগড়ের লেটেস্ট খবর কি ?

ভাল নয়। আজ সকালেই একটা চিঠি এসেছে, ওরা ওখানে অপারেশান করাবে না, অনেক অসুবিধে দেখা দিয়েছে। ওখানে থেকে চলে আসার চেষ্টায় আছে।

কিন্তু কলকাতায় তো অপারেশান হবে না।

না, উলুকে এখন আমেরিকা পাঠাবার জন্য শেষ চেষ্টা করতে হবে। বহু টাকার দরকার।

ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বললেন, কিভাবে যোগাড় হচ্ছে ? কত টাকাই বা দরকার ?

প্রথমে অন্তত লাখ পাঁচেক টাকা হাতে নিয়ে যেতে হবে। তারপর প্লেনের ভাড়া আছে।

বিপুল অঙ্কের বোঝা, ভদ্রলোক চিন্তাক্লিষ্ট মনে হলো। তুমি কয়েকদিন পরে এসো, আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করব। একদিন ছিল যখন চেষ্টা করলে হয়ত সবই পারতাম, কিন্তু এখন প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছি। সমস্ত সম্পদ আমি পেছনে ফেলে রেখে এসেছি।

ভদ্রলোকের কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল রাজর্ষি। বলল, এই যে আপনি

মুখে সাহায্যের কথা বললেন এতেই আজ আপনার কাছে আসাটা আমার সার্থক হয়ে গেল। আমি নিশ্চয়ই আর একদিন আপনার কাছে আসব।

রাজর্ষি নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক তার পেছন পেছন এলেন।

কিডনি যোগাড় করতে পেরেছে?

রাজর্ষি বলল, ইতিমধ্যে ষাটজন কিড্‌নি দেবার জন্য তৈরি। সবারই রক্তের গ্রুপ 'ও"। তবে মাসীমা চণ্ডীগড়ে পরীক্ষার পর লিখেছেন, তাঁর কিড্‌নি মেয়ের জন্যে একেবারে ম্যাচিং।

ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তাহলে একটা সমস্যার সমাধান হলো। এখন প্লেনের ভাড়া আর অপারেশানের ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ।

রাজর্ষি বলল, আমার মন বলছে, এত মানুষের শুভেচ্ছা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। উলু ঠিকই চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যেতে পারবে।

রাজর্ষি তার ব্যাগ হাতড়ে ছ'খানা চিঠি বের করল। ভদ্রলোকের হাতে চিঠি দুটো ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন।

ঢাকা থেকে শান্তনু হাসান খান লিখেছেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তর সালের যুদ্ধে অনেককেই হারিয়েছি। আমার কোন ছোট বোন নেই। আমার ব্লাড গ্রুপ 'ও'। সানন্দে আমি আমার হিন্দু বোনটিকে একটি কিড্‌নি উপহার দিতে চাই। চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম।

ভদ্রলোকের চোখে জল এসে গেল। তিনি কাপড়ের কোণে মুছে নিলেন।

সৌদি অ্যারেবিয়া থেকে মিঃ করুণাকরণ লিখেছেন, হিন্দুস্থান টাইমস্ পড়ে তোমার অসুখের খবর জানতে পারলাম। তোমার এই কষ্ট আমাদের সকলেরই কষ্ট। আমরা ছুটিতে সপরিবারে ইউরোপে বেড়াতে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার অসুখের খবর জেনে আমাদের খুশীর ভ্রমণে যাবার ইচ্ছে একেবারে চলে গেছে। ভ্রমণের জন্য আমরা যে অর্থ খরচ করব ঠিক করেছিলাম তা তোমার কাছে পাঠালাম। তুমি রোগমুক্ত হলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না।

চিঠি পড়া শেষ করে ভদ্রলোক দু'খানা চিঠিই রাজর্ষির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কয়েকদিন পরে, তুমি চলে এসো আমার এখানে। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, আমি বাবা নামের প্রত্যাশী নই। তাই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবার ব্যাপারটা যেন তৃতীয় আর কেউ জানতে না পারেন।

রাজর্ষি বলল, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ঘরে ফিরে বাবার কাছ থেকে রাজর্ষি জানতে পারল উলুরা প্লেনে কলকাতা ফিরে এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সদানন্দের অফিসে ফোন করে সুদীপা খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন।

কেমন আছে উলু ?

কালই ডায়ালিসিসে নিয়ে যেতে হবে।

পরের দিন বেশ কয়েক ঘণ্টা উলুর ডায়ালিসিস চলল। রাজর্ষি কলেজ কামাই করে বসে রইল সেখানে। জোর করে সুদীপাকে পাঠিয়ে দিল তাঁর স্কুলে।

ডায়ালিসিসের শেষে ক্লান্ত উলুকে রাজর্ষি নিয়ে এল ঘরে।

উলু বিছানায় শুয়ে ঋষির হাত ধরে বলল, তুই আমার কাছে থাক'বি। আমাকে ছেড়ে যাবি না তুই ?

রাজর্ষি ওর ক্ষতবিক্ষত হাতখানায় ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি তোকে ছেড়ে চলে যাব, এ ভাবনা তোর মাথায় এলো কি করে উলু। যদি কোথাও যাই তাহলে জেনে রাখ, তোকে সঙ্গে না নিয়ে যাব না।

উলু অনেক অবসন্নতার ভেতর থেকে নরম এক টুকরো রোদ্দুরের মত হেসে বলল, তুই এমন মজা করতে পা'বিস না ঋষি।

যাব্বাবা সত্যি, বললেও যদি তুই বিশ্বাস না করিস তাহলে আমার কি বলার আছে বল।

এবার উলু নিজেই মজা করে বন্ধুর দিকে একটা চোখ টিপে হাসল।

কয়েকদিন পরে সুদীপার ঘরে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। রাজর্ষি এল একখানা চিঠি হাতে করে। প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তর থেকে এসেছে। উলুকে অ্যাড্রেস করে লেখা।

তোমার এবং তোমার মায়ের জন্য প্লেনে আমেরিকা যাতায়াতের দুখানা টিকিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মিনিস্ট্রি অব ট্যুরিজিম এবং মিনিস্ট্রি অব হেলথ্-এর সঙ্গে যোগাযোগ কর।

সুদীপা বললেন, এ অঘটন কি করে ঘটল ঋষি !

রাজর্ষি বলল, নানা দিক থেকে চেষ্টা হচ্ছে মাসীমা, এ তারই ফল।

কলেজ শেষে প্রাইম মিনিস্টারের সেক্রেটারিয়েট থেকে লেখা চিঠি পকেটে নিয়ে রাজর্ষি ছুটল ব্রজগোপাল বিহারে।

চিঠি দেখলেন মাস্টারমশায়। বললেন, কাজ হয়েছে। কিন্তু তুমি আমার চেষ্টার কথা বলনি তো কোথাও?

আপনি আমাকে আগেই তো বারণ করে দিয়েছেন।

তবু আর একবার মনে করিয়ে দিলাম। শ্রেয় কাজে বাধা অনেক। এখন আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি আবার ঐ অসুস্থ মেয়েটির নামে ট্যুরিজিম আর হেল্‌থ্‌এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তোমার ঠিকানাতে উত্তর আসামাত্রই আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোর।

নিশ্চয়ই মাস্টারমশায়।

উত্তর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলে। একেবারেই নৈরাশ্যজনক। দু'টি ডিপার্টমেন্ট থেকেই জানান হয়েছে, ভারতের চারটি হাসপাতালে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট চলছে। তুমি এদেশেই চেষ্টা কর। আমরা দুঃখিত, তোমাকে বাইরে যেতে দিতে পারছি না বলে।

চিঠি নিয়ে আবার ছুটল ঋষি মাস্টারমশায়ের ডেরায়। সে এখন রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

বেশ খানিক সময় স্থির হয়ে বসে থেকে মাস্টারমশায় বললেন, চেষ্টা আমাদের করে যেতেই হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি এক কাজ কর রাজর্ষি, ঠিক দু'দিন পরে এমনি সময়ে চলে এস আমার এখানে।

রাজর্ষি ফেরার পথে কেবল মাস্টারমশায়ের কথাই ভাবতে লাগল। জীবনের যা কিছু পার্থিব সম্পদ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষটি তপোবনের আচার্যের মত সাধারণ জীবন যাপন করছেন। বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে চলেছেন ছাত্রদের। সারাদিনের সামান্য আহার নিজের হাতেই তৈরী করে নিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, কত বিশাল একখানা হৃদয় নিয়ে জন্মেছেন মানুষটি।

ঠিক পাঁচদিন পরেই সন্ধ্যার ডাকে একটি সরকারী খাম এল। তার ভেতর আমেরিকা যাবার টিকিট আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

পরের দিন সেই সব সঙ্গে নিয়েই মাস্টারমশায়ের ডেরায় ছুটল রাজর্ষি।

রাজর্ষিকে দেখে দূর থেকেই তিনি বললেন, যাবার টিকিট পেয়ে গেছ তো?

রাজর্ষি কাছে গিয়ে বলল, আজ আমাকে বলতেই হবে, এ অসাধ্যসাধন আপনি কি করে করলেন।

সুস্থির মানুষ। মুখে কোন ভাবাবেগ নেই। বললেন, এক নামী ইংরাজী পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুকে নিয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিলাম। তাঁরই চেষ্টায় এত তাড়াতাড়ি জট খুলে গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাটাও সহজ হয়ে যাবে।

একটু থেমে বললেন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে রাজর্ষি। বন্ধুর জন্য ক'জনই বা এমন নিঃস্বার্থ চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে! শোন, পঁচাত্তর হাজার টাকার মত একটা সঞ্চয় আমার আছে, আর এই বাড়ি, বাগান, পুকুর মর্টগেজ, রেখে তিরিশ হাজার পেয়েছি। এই এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা আমি তোমার বন্ধুকে দিতে পারলাম।

রাজর্ষি কোন কথা বলতে পারল না, সে মাস্টারমশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মাস্টারমশায় আবার বললেন, তুমি আমাকে বার বার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে, তাই আগেভাগে সব কিছু বলে দিলাম।

রাজর্ষির আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। সে শুধু বলতে পারল, মানুষের জন্যে এত ভালবাসা আপনার ?

ও কথা বল না রাজর্ষি। আমি খুবই ছোট মাপের মানুষ। আমারও স্বার্থ রয়েছে এখানে। একটি তরুণ অথবা তরুণী মেয়ে পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই ঝরে পড়ছে জানতে পারলে আমি নিশ্চয়ই তার জন্যে সাধ্যমত করতাম। কিন্তু উলু চৌধুরীর জন্যে কিছু করার ভেতরে আমার একটা ঋণ শোধের ব্যাপার আছে।

ঋণ শোধ! আপনার!

হ্যাঁ বাবা। কত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ঐ মেয়েটির হৃদয় আকুল করা গান শুনে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। সে ঋণ তো আমাকে শোধ করে যেতে হবে। পৃথিবীর কাছে, মানুষের কাছে আমরা যে কতভাবে ঋণ করি তার লেখাজোখা আছে।

সংবাদপত্র লিখল, অবশেষে তরুণী উলু চৌধুরীর আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, '—'নম্বর ফ্লাইটে আমেরিকা যাত্রার ছাড়পত্র মিলল। আমরা তার শুভগমন ও সুস্থদেহে প্রত্যাবর্তন কামনা করি। লস্‌এঞ্জেলসে ডাক্তার মেণ্ডিসের চিকিৎসাধীনে থাকার অভিপ্রায় তাঁদের।

যাত্রার আগে একটি চিঠি এল। এক অত্যন্ত শুভার্থী মানুষ লিখেছেন। অসুখের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়।

তোমার যাত্রা শুভ হোক। তোমার মহীয়সী মা তাঁর একটি কিড্‌নিই শুধু তোমাকে দান করছেন না, পক্ষীমাতা যেমন করে তার পক্ষপুটে শাবককে আগলে রাখে, তেমনি করে তোমাকে আগলে নিয়ে চলেছেন অচেনা আমেরিকার পথে।

ভয় নেই, ওদেশে কয়েকবারই আমি গিয়েছি। আমি রাজনীতির ছাত্র নই। আমি শুধু বলতে পারি, রাজনীতির খেলার বাইরেও আর একটা আমেরিকা

আছে, যেখানে হরগোবিন্দ খোরানা রিসার্চের সুযোগ পায় এবং নোবেল পুরস্কারও।

তুমি যখন যাত্রা করবে তখন জানবে ভারতের শত শত মন্দির, মসজিদ আর গীর্জায় তোমার জন্য প্রার্থনা হচ্ছে। তুমি যে বিমানে যাত্রা করছ তা ভারী হয়ে উঠবে ভারতের তগণিত নরনারীর ঐকান্তিক শুভকামনা ও ভালবাসায়।

উলু রাতে তার ডায়েরীর পাতায় লিখল: ঋষিকে ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে। ও আমার প্রাণের বন্ধু, ও আমার নিভৃত অন্তরের সখা। আমি ঠিক যখনই ওর কথা ভাবি, একটু গভীরভাবে ভাবি, ও প্রায় তখনই আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। কখনও রক্ত মাংসের শরীরে, কখনও আমার কল্পনায়।

আমি অনেকদিন ভেবেছি, বন্ধুত্বের সংজ্ঞা কি? একের সুখদুঃখ অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা? পরস্পরের সমবেদনার অশ্রু নিজেদের তপ্ত বুকে মেখে নেওয়া? না আরও অতিরিক্ত কিছু? বন্ধুর জন্য বন্ধুর অনেক ত্যাগ স্বীকার? জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুর তুলনা করা চলে? বন্ধু বোধহয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককেও ছাড়িয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হতে পারে, সাংসারিক সম্বন্ধে চিড় ধরতে পারে, স্বার্থের সংঘাত আসতে পারে, কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধুত্বে কোন খাদ নেই, বিচ্ছেদের কোন প্রশ্ন নেই, আর পরস্পরের সাংসারিক জীবন থেকে দুজনে দূরে থাকে বলে ভাঙনের কোন ঢেউ এসে লাগে না পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে।

ঋষি চিরদিনই আমার বন্ধু হয়ে থাকবে, এ কথা যখনই ভাবি তখনই প্রথম বর্ষার ফুটে ওঠা কদম্বের মত রোমাঞ্চিত হই।

আচ্ছা, বন্ধুত্বের সঙ্গে ভালবাসার সীমারেখা কোথায়? আমি কি ঋষির সঙ্গে ভালবাসার সূক্ষ্ম বাঁধনে বাধা পড়ে গেছি? এটা কি বন্ধুত্বের অতিরিক্ত কিছু?

সে যাই হোক্, ঋষিকে ছেড়ে আমি অন্য গোলার্ধে যাচ্ছি।

আজ সন্ধ্যায় ঋষি এসে আমার কাছে বসেছিল। কতক্ষণ আমরা গল্প করলাম, আবার কতক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটল। সারাক্ষণ ওর হাত ছিল আমার হাতের মুঠোয়। আমরা ঐ নীরবতার সময়গুলোতে দুজনকে বুকের গভীরে অনুভব করছিলাম।

কথা বলল ঋষি, আমরা পৃথিবীর দুটো বিভিন্ন দিকে থাকব, উলু। তুই যখন সূর্যের আলোয় স্নান করতে থাকবি তখন আমি রাতের গভীরে ডুবে থাকব। আবার তোর চন্দ্রোদয়ে আমার সূর্যস্নান।

আমি বললাম, আয়, আমরা একটা প্ল্যান তৈরী করি। যখন এ গোলার্ধে তুই ঘুমোবি তখন আমি শুধু তোর কথা ভেবে যাব। আর আমি যখন ঘুমের ভেতর ডুবে যাব তখন তুই ভাববি আমার কথা।

ঋষি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, দারুণ প্ল্যান। অক্ষরে অক্ষরে আমরা মেনে চলব।

কিন্তু ঋষি…

ও তাকাল আমার দিকে।

যদি দিনের আলোয় আমি ঘুমিয়ে পড়ি আর সে ঘুম কোন দিনও না ভাঙে?

ঋষি তেমনি তাকিয়ে রইল।

আমি আবার বললাম, তাহলে সে অবস্থায় পরিকল্পনা ভাঙার দায়ে দায়ী করতে পারবি না আমাকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ঋষি। আমি তাকে ঠ্যালা দিয়ে বললাম, কি হল, একটা উত্তর তো দিবি?

ও এবার মুখ খুলল, প্রতিজ্ঞা করেছিলি না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে আনবি?

করেছিলাম।

তাহলে, সে ঘুম আর কোনদিনও ভাঙবে না, সে প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? নিজের মনের দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞাকে আবেগ দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করছিস কেন?

বশ, আমি আমার ঘুমের কথাটা না হয় ফিরিয়ে নিচ্ছি।

ও আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর পুরে নিয়ে বলল, উলু আমার বন্ধু, সে কখনও হারতে জানে না। সে লড়াই করে বাঁচার মত বাঁচতে জানে।

আমি তখুনি মনে মনে বললাম, ঋষি, তুই যদি আমাকে তোর মনের মধ্যে এমনি করে ধরে রাখিস চিরদিন, তাহলে আমি মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে লড়াই করে নিশ্চয়ই জয়ী হব।

আজ ঋষি চলে যাবার পর কেন জানি না রবীন্দ্রনাথের গানের এই কটি ছত্র বুকের ভেতর গুঞ্জন করে ফিরছে।

'চিরসখা, ছেড়োনা মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর,
নির্জনসজনে সঙ্গে রহো॥'

॥ ৫ ॥

তখন সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠেছে। ঝলমল করছে এয়ারপোর্ট।

সিকিউরিটি জানতে চাইল টাকার পরিমাণ।

সুদীপা বললেন, তাঁর কাছে যে ডলার আছে তার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'লাখ টাকা।

তারা সুদীপার মুখ থেকে মেয়ের অসুখের কথা শুনে বেশি নাড়াচাড়া করল না। শুধু বলল, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে কোন বন্ধু এসেছে?

না।

তবে এয়ারপোর্ট থেকে এতগুলো ডলার নিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে গুলি করে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেবে।

সুদীপা বড় বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি সিকিউরিটির আওতার ভেতর একটি কোণে কাচের এনক্লোজারের ধারে বসে রইলেন। ক্লান্ত উলু মায়ের বুকে মাথা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নির্বান্ধব দু'টি অনভিজ্ঞ মহিলা।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একটি মুখ ভেসে উঠল কাচের এনক্লোজারের বাইরে। একটি তরুণীর মুখ। সন্ধানী দু'টি চোখের তারা এদিক ওদিক কাকে যেন খুঁজে ফিরছে।

চার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ মিলে গেল। মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল উলু। এস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে বাইরে দাঁড়ানো তরুণীটির দিকে।

জয়া।

বিস্ময়ে আনন্দে একাবার হয়ে গেল উলু। সুদীপা ততক্ষণে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও বিস্মিত।

জয়া আর তার স্বামী বিজয়তিলক ধরাধরি করে ওদের সুটকেশ দুটো বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

গাড়ি চালাচ্ছে বিজয়তিলক। পাশে বসে রয়েছেন সুদীপা। পেছনে উলু আর জয়া দুজন দুজনকে জড়িয়ে বসে আছে। স্কুল জীবনের দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

উলু বলল, এখন বলত, কেমন করে আমাদের আসার খবর পেলি?

জয়া অমনি সুদীপাকে লক্ষ্য করে বলল, বলুন তো মাসীমা, আমি কোথা থেকে খবর পেলাম, কেন ওকে বলতে যাব। ও কি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল ওর এই অসুখের কথা?

সুদীপা বললেন, ক্রটিটা অবশ্যই আমাদের দিক থেকে মা।

আপনাকে জড়াব না মাসীমা, ও কি দুটো বছর বন্ধুর কোন খোঁজ রেখেছে?

তুই তো বিয়ে করেই দেশ ছাড়লি, আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিলি? কাউকে দিসনি। তীর্থ একদিন আমার কাছে এসেছিল তোর ঠিকানার খোঁজে। আমি ফুলরাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর ঠিকানা জানে কিনা, কিন্তু সেখানেও ভোঁ ভোঁ। মাসীমা, মেসোমশাই শান্তিনিকেতনে উঠে গেছেন। এবার বল্, দোষটা আমাদের কোথায়?

জয়া মুহূর্তে ও প্রসঙ্গের ইতি টেনে দিয়ে উলুর ডায়ালিসিস করা হাতখানায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, নাচের সময় স্কুলের স্টেজে তোর এই হাতে কত মুদ্রা ফুটে উঠতে দেখেছি, কি করে ডাক্তাররা এমন সুন্দর হাতখানায় ছুঁচ ফোটায় রে !

উলু বলল, ভাগ্য জয়া।

থাম্, ঠিক জায়গায় ঐ ভাগ্যের দেবতাই তোকে এনে ফেলেছে। এখানে ডাক্তার মেণ্ডিস তোকে দেখবেন তো ?

সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি জয়া, তুই কি করে জানলি যে আমি ডাক্তার রবার্ট মেণ্ডিসকে দেখাব বলে এখানে এসেছি ?

লস্এঞ্জেলস্এ এসেছিস যখন ঐ ধন্বন্তরী ছাড়া কাকে আর দেখাবি বল্ ? এ রোগে ওঁর জুড়ি সার্জেন দুনিয়ায় মেলা ভার।

জয়া ডাক্তার মেণ্ডিস সম্বন্ধে এ ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যখন করছিল তখন সুদীপার ক্লান্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাহলে ডাক্তার নির্বাচনে তাদের কোন ভুলই হয়নি। এখন অবশ্য ভাগ্যের দেবতাদের আশীর্বাদের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।

সুদীপা বললেন, আমরা প্রায় লাস্ট মোমেন্টে টিকিট পেয়ে চলে এসেছি। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের সময় সুযোগ কোনটাই হয়নি।

জয়া বলল, সবই হয়ে যাবে মাসীমা। আপনি জেনে রাখুন, উলু এখান থেকে সুস্থ হয়ে ফিরবে।

উলু বলল, আসল রহস্যের সমাধান কিন্তু এখনও হয়নি জয়া।

বেশ, ধাঁধার উত্তর এখুনি পেয়ে যাবি, আগে বল্, ক'দিন আমার ওখানে থাকবি ?

কম করে বছরখানেক।

এবার উলুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জয়া ফিসফিসিয়ে বলল, পারব না ভাই অতদিন রাখতে। আমার সুন্দরী বন্ধুটির দিকে পতিদেবতার নজর চলে যাবে।

দু'বন্ধুতে এই সামান্য রসিকতায় খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে জয়া বলল, শুনুন মাসীমা, (এাই, তুই কান চেপে রাখ) আমি এখান ইংরাজীর সঙ্গে একখানা করে বাংলা খবরের কাগজ রাখি। সেই খবরের কাগজে আগাম বিজ্ঞপ্তি ছিল কোন তারিখে, কত নম্বরে ফ্লাইটে আপনারা এখানে আসছেন। তার থেকেই আপনাদের আসার হদিস পাই। উলু এখানে আসছে

অথচ আমি তাকে দেখতে পাব না, সে কি হয় নাকি।

উলু বলল, আমরা কত আনন্দ করতাম ইস্কুলে। কে কোথায় যে সরে গেল, কেউ আর কারুর কথা মনে রাখে না।

জয়া অমমি বলল, আমি দূরে সরে এসেছি ঠিক কিন্তু তোকে অন্তত ভুলিনি জয় কে জিজ্ঞেস কর, ও আমার চেয়েও তোকে বেশী চেনে।

আবার হেসে উঠল উলু। অমনি বেজে উঠল গান। বিজয়তিলক টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছে। উলুর গলার ছ'খানা গান টেপ করা।

সুদীপা বিস্মিত। উলু অবাক।

কোথায় পেলি এ গান?

জরা বলল, কি ভুলো রে তুই, একটুও মনে পড়ছে না?

উলু মাথা নাড়ল। এতগুলো গানের উৎস সে আবিষ্কার করতে পারল না।

আমার বিয়ের বাতটা তোর মনে পড়ে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোব বাসরে বসে অনেকগুলো গান গেয়েছিলাম। তবে একসঙ্গে তো গাইনি, কথা, হাসি, হুল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে গেয়েছিলাম।

সবই জয়ের বন্ধুরা টেপ করে রেখেছিল, তার থেকে জয়ই যড ঋতুর সংকলনটি আলাদা টেপ করে রেখেছে।

বাজছিল গান। আশ্চর্য! প্রতি ঋতুর বাছাই করা একটি করে গান ও গেয়েছিল। প্রস্তুতি আর প্রেম পর্যায় থেকে নির্বাচিত গান। বর্ষা বসন্তের গানে ছিল প্রেমের রোমাঞ্চ আর শিহরণ। অন্য ঋতুগুলির কেবল মহিমার বর্ণনা। বড দরদী গলায় সেদিন গানগুলো গেয়েছিল উলু। আজ নিজের গলার গান শুনে নিজেকে চিনতে পারল না। একটা কান্না মেঘের মত গুমরে গুমরে উঠতে লাগল তার বুকের মধ্যে। চোখে সজল মেঘের ছায়া। আর কি কখনো সে এমন করে গান গাইতে পারবে। যা একবার হারায় তাকে কি সহজে ফিরে পাওয়া যায়। সে সুরের পাখি কণ্ঠের খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে বনের কোন্ বিজনে। আয়, আয় করে ডাকলেও, ভোগের থালা নিয়ে সাধলেও সে পাখি আর ফিরবে না।

শেষ গানটি বেজে উঠল ডি, এল, রায়ের গান।

'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা
ওগো সযতনে তুমি নাশিবে।
... ...

আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
ওগো তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
আমার মুখপানে চেয়ে হাসিবে।'

এ গানের সুরে এমন একটি সকরুণ প্রতীক্ষার ভাব আছে যা প্রতিটি পিপাসু হৃদয়কে স্পর্শ করবেই।

গানটি শেষ হলে জয়া বলল, বিজয়তিলকের এটি ববচেয়ে প্রিয় গান। ও যে কতবার এ গানটা বাজায় তার হিসেব নেই। তুই এখন গান গাইতে পারবি না ?

উলু শুধু মাথা নাড়ল। সে অক্ষম। চোখ দুটো তার বিপুল জলভারে টলমল করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ী এসে ঢুকলো জয়াদের কম্পাউণ্ডের ভেতর।

পরের দিনই অসুস্থ উলুকে সামনের একটি হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। ক'দিন দুর্বলতার ভেতর কাটল তার কিন্তু মনের মধ্যে সব সময়ই আনন্দের আসা যাওয়া। এখানেও বন্ধুর জন্য বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপ।

জয়া বলে, তুই স্কুল ম্যাগাজিনে কত ভাল কবিতা লিখতিস, এখন সে সব চর্চা কি ছেড়ে দিয়েছিস ?

উলু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে জানায়, সে কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছে। মুখে বলে, ডায়েরী লেখার অভ্যেসটা এখনও যায়নি। ঐ ডায়েরীর ভেতর কখনও কখনও দু'চার ছত্র এসে যায়।

ওদের কথায় ভেতর ঘরে নক করে বিজয়তিলক।

আসতে পারি ?

জয়া বলে, মহিলা মহলে নাক গলাবার দরকার কি মশাই ?

উলু বিছানার ওপর উঠে বসে মিষ্টি হেসে বলে, আসুন আসুন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে বিজয়তিলক।

জয়া বলে, ও তোর গান শুনতে এত ভালবাসে, তুই আসবি শুনে ক্যাসেট রেডি করে রেখেছে।

উলু ম্লান হেসে বলে, আমার দুর্ভাগ্য, এ যাত্রায় গৃহস্বামীকে গান উপহার দিতে পারলাম না।

বিজয় বলে, তাতে কি হয়েছে, সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে একখানা ক্যাসেট গানে ভরে পাঠিয়ে দেবেন।

আবার হাসল উলু : মনে থাকবে।

সেই সন্ধ্যায় সবার চোখের আড়ালে ও একটা কবিতা লিখল।

যখন ওরা স্বামী-স্ত্রীতে সুদীপাকে নিয়ে সামান্য টুকিটাকি মার্কেটিংএ বেরুল তখন বিজয়তিলকের পড়ে থাকা ক্যাসেট আর টেপ রেকর্ডার নিয়ে উপু বসে গেল সেই কবিতাটা টেপ করতে। বার বার নিজের কণ্ঠস্বর মুছে ফেলল। শেষে নিজে যখন নিজের স্বাভাবিক গলার স্বরটুকু চিনতে পারল তখন কবিতাটা ক্যাসেটের মধ্যে ধরে যথাস্থানে রেখে দিল।

লস্‌এঞ্জেলস্‌এ সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেণ্টারে যাবার দিন গাড়ীতে বসে উলু বলল, জয়া, এবার তোদের কোন গান উপহার দিতে পারলাম না। তুই কবিতার কথা বলেছিলি না? তোদের জন্যে অক্ষম হাতের এক টুকরো কবিতা রেখে এসেছি।

কোথায় রেখে এলি ?

সংগোপনে, সবার অগোচরে বন্ধু বিজয়তিলকের নতুন ক্যাসেটে তুলে রেখে এসেছি।

সেদিন সুদীপা আর উলুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে রাতে ফিরে এল জয়া আর বিজয়তিলক। বিশ্রামের মাঝে চালিয়ে দিল টেপরেকর্ডার। নতুন ক্যাসেটে বেজে উঠল উলুর মিষ্টি গলা। পুরনো গানের মত সতেজ নয় এ কণ্ঠ, তবু মায়াময়। ক্লান্তির ভেতরেও আশ্চর্য এক জীবনের স্পন্দন আছে।

প্রবাসে স্বজন বন্ধুর আশ্রয়ে
যে আতিথ্য পেলাম,
তার উষ্ণতা ভরে নিয়ে গেলাম
আমার হৃদয় পাত্রে।
ভোরবেলা জানালা খুলে
প্রতিদিনই দেখেছি আমি সেই পাখিটিকে,
যে আমাকে গান শুনিয়ে যেত,
সুন্দর সোনালী জীবনের স্বপ্নেভরা গান।
সে গানে সে বলত—
তোমাকে দিলাম আমার সুর
যে সুর তোমাকে পৌঁছে দেবে
জীবনদেবতার আনন্দ ভবনে।

রোজই কোন না কোন ফুল

কুঁড়ির ঘোমটা খুলে তাকাত।
তাদের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলেই
দুলে দুলে বলত, দেখ জীবন কত সুন্দর!
অফুরন্ত আনন্দের রঙ লাগিয়ে দিলাম
তোমার চোখে।

অনন্ত ঘুমের অতলে যদি কোনদিন
তলিয়ে যাই আমি—
তখনও এই পাখির গানে,
এই ফুলের ঘোমটা খোলার উৎসবে
আমি বেঁচে থাকব।
বেঁচে থাকব, রোদের মত সোনালী উত্তাপে ভরা
তোমাদের ভালবাসায়।

সুন্দর একটি চ্যাপেল। সংলগ্ন খ্রীষ্ট সেবিকাদের আবাস। তাঁদের দ্বারা পরিচালিত (ডটারস্ অব চ্যারিটি) হাসপাতাল—সেন্ট ভিনসেন্ট মেডিকেল সেন্টার।

কো-অর্ডিনেটার বারবারা এগিয়ে এসে বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, আপনারা অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন! আপনাদের প্রয়োজন কি? কোত্থেকেই বা আসছেন?

সুদীপার গলা কাঁপছে, আমরা ইণ্ডিয়া থেকে আসছি, এই হাসপাতালের ডাইরেক্টর ডাক্তার মেণ্ডেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আগে কি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছ?

না, একেবারে ইণ্ডিয়া থেকে সোজা তাঁর কাছে চলে এসেছি।

অপেক্ষা কর—বারবারা ভেতরে চলে গেলেন। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা সামনের ঐ রুমে চলে যাও, ডাক্তার মেণ্ডেস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সুদীপা ঘরে ঢুকেই দেখলেন, দীর্ঘদেহী সৌম্যদর্শন এক পুরুষ বসে রয়েছেন। মুখে প্রসন্নতার একটা আলো এসে পড়েছে।

সুদীপার এতদিনের রুদ্ধ আবেগ, বেদনা এই মানুষটির কাছে মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠল। ডাক্তার মেণ্ডেসের সামনে তিনি নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

ডাক্তার মেণ্ডেস উঠে দাঁড়ালেন। উলুর মনে হলো, ঐ পোশাকের আড়ালে যীশুখ্রীষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন।

সুদীপার হাত ধরে তুললেন মেণ্ডেস। সামনের চেয়ারে দুজনকে বসতে বলে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

বল, আমি তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?

সুদীপা তখনও আবেগমুক্ত হন নি। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, দুটো কিড্‌নিই নষ্ট হয়ে গেছে আমার মেয়ের। তুমিই ডাক্তার এই দুঃখী মেয়েটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পার। বহু কষ্টে বহুদূর থেকে আমি তোমার নাম শুনে ছুটে এসেছি। অতি সামান্য ক'টি ডলার আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

ডাক্তার মেণ্ডেস সুদীপার সঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। তিনি কো-অর্ডিনেটর বারবারাকে ডেকে বললেন, নার্সদের টেবিল রেডি করতে বল, আমি এখুনি এই পেসেন্ট'কে এগজামিন করব।

একজামিন শেষ করে ডাক্তার নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন। সুদীপাকে বললেন, কিড্‌নি কোথায়?

আমি দেব, ডাক্তার মেণ্ডেস। এই দেখুন আমার ব্লাড, টিস্যু এবং অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্ট।

ডাক্তার ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মনে মনে কিছু ভাবলেন। আবার বারবারাকে ডাকলেন ডাক্তার মেণ্ডেস।

পেসেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ, এখুনি ব্লাড দেবার ব্যবস্থা কর। অপারেশানের একটা ডেট তাড়াতাড়ি ফিক্স করলে ভাল হয়। হ্যাঁ আর একটা কথা, মাদার কিড্‌নি দেবে। এই মহিলার বাইরে না থাকাই ভাল। নানারীতে কয়েকদিন থাকার একটা ব্যবস্থা করে দাও। অপারেশানের আগে হসপিট্যালে এনে রাখবে।

উলু আর সুদীপা বারবারার সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন।

নার্স এল উলুকে বেডে নিয়ে যাবার জন্য।

আমি যাচ্ছি মা।

দীর্ঘদিন পরে মা আর মেয়েতে এই ছাড়াছাড়ি। সুদীপা বললেন, কোন ভয় নেই মা, তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

উলু বলল, না মা, আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না। তুমি তো রয়েছ।

উলু চলে গেলে সুদীপার বুকটা হুহু করে উঠল। তিনি উদাস দৃষ্টিতে সামনের গীর্জার চূড়ার দিকে চেয়ে রইলেন।

বারবারা এবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বাস্তবে। হাতে একটা বিল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই অ্যামাউণ্টটা এখন দিয়ে দিতে হবে।

সুদীপা দেখলেন কুড়ি হাজার ডলারের একটা বিল।

সব কুড়িয়ে আমার কাছে বার হাজার ডলারের মত রয়েছে, এর বেশী একটিও নেই।

এবার বারবারা একাই ডাইরেক্টর মেণ্ডেসের চেম্বারে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, দাও, যা আছে তাই দাও। তুমি দারুণ লাকি, ডাইরেক্টরের সুনজরে পড়ে গেছ। ডাক্তার মেণ্ডেস বললেন, অলৌকিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ও যা দিতে পারে তাই নাও, ওকে প্রেসার দিও না।

কনভেণ্টে সাময়িক ভাবে থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হলো সুদীপার।

ঠিক পনের দিন পরেই ফিক্স হলো অপারেশানের ডেট।

পাঁচদিন থাকতেই হাসপাতালে আনিয়ে নেওয়া হল সুদীপাকে।

অপারেশানের দু'দিন আগে ঋষির চিঠি নিয়ে এল জয়া আর বিজয়তিলক। ওদের ঠিকানা দিয়েই ঋষিকে চিঠি লিখেছিল উলু।

ঋষির হাতের লেখা দেখেই উলু উল্লসিত হয়ে উঠল। চিঠিখানা ওদের সামনে খুলে পড়ল না সে। বালিশের পাশে রেখে দিল।

তোদের কত কষ্ট দিচ্ছি জয়া। পরশু এসেছিস, আবার আজ এলি।

তোকে হাসপাতাল থেকে যেদিন মুক্ত করে আমার ডেরায় নিয়ে যেতে পারব সেদিনই হবে আমাদের ছুটোছুটির শেষ।

ম্লান একটা হাসি উলুর মুখে ফুটে উঠতে দেখেই জয়া বলল, হাসছিস যে বড়? এই বলে যাচ্ছি, কিছুদিনের ভেতরেই দেখবি তোর সেই চেনা পাখিটা উড়ে এসে জানলার বাইরে গাছের ডালে বসে গান গাইছে আর তুই বিছানায় বসে ওর গান শুনছিস।

উলু বলল, সেদিনটা যেন ফিরে পাই। তাহলে সবাই মিলে গান আর গল্পের মজলিস বসাব।

বিজয়তিলক বলল, অবশ্যই।

জয়া বলল, আজ উঠছি রে। ওকে কাজের ব্যাপারে খানিকটা দূরে যেতে হবে। যাবার আগে মাসীমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

ওরা পাশের ঘরে উঠে যেতেই ঋষির চিঠিখানা প্রবল আগ্রহে হাতে তুলে

নিল উলু। উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল তার।

চিঠিতে ঋষি লিখেছে :

প্রিয় উলু, দমদম থেকে তোদের প্লেন আকাশে মিলিয়ে যাবার পর সেই যে মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিলাম, আজ তোর চিঠি পেয়ে তার অবসান হল।

তুই জয়ার কথা লিখেছিস, ওকে চিনব না কেন। সবার পেছনে লাগত, কিন্তু ওর কথায় কোন খোঁচা ছিল না। আনন্দ কৌতুকে ও আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তুই জয়ার সঙ্গে তোর হঠাৎ যেভাবে দেখা হয়ে যাবার কথা লিখেছিস, তা পড়ে যে কোন লোকের মনে হবে, এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

জয়ার বিয়েতে আমরা পনেরজন বন্ধু চারটে ব্যাচকে সমানে পরিবেশন করে গেছি। তুই তো গানে মাৎ করে দিয়েছিলি।

ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়ে যাওয়াটা আমাকে এমনি নাড়া দিয়েছে যে আমি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বসে আছি, একটা অঘটন ঘটবেই। আর সে অঘটন ঘটাবেন ডাঃ মেণ্ডেস। তোর সুস্থ হয়ে ফিরে আসাটা আমার বুকের মধ্যে খোদাই হয়ে গেছে।

বহুদিন একটি মানুষের কথা বলব বলব বলে বলা হয়নি। সেই নিঃস্বার্থ, পরোপকারী মানুষটি না থাকলে আজ আমার পক্ষে সব আয়োজন করে তোকে আর মাসীকে ওখানে পাঠান সম্ভব হত না। তিনি নাম প্রচারে অনিচ্ছুক তাই দেশে থাকতে ওঁর কথা তোকে বলিনি। সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আয়, ওঁর সঙ্গে তোর আর মাসীমার আলাপ করিয়ে দেব। প্রাচীন কালের ঋষিদের মত উনি প্রায় তপোবনের জীবন যাপন করেন। ছেলেদের পড়া বুঝিয়ে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। এ যুগে এ কথা ভাবতে পারিস? এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটির কাছে দাঁড়ালে বোঝা যায় মনুষ্য সমাজে আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

মাসীমাকে বলিস, আমার সমস্ত কাজের উৎস তাঁর অফুরন্ত প্রেরণা। সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অপরিচিত অবস্থায় কেউ যে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কঠিন একটা লড়াইএর মধ্যে, তা ভাবাই যায় না।

তুই লিখেছিস, যদি অপারেশান সাকশেসফুল হয় তাহলে আরও এক দেড় বছর ওখানে থাকতে হবে। তা হোক, অপারেশানের পর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে বৈকি। আমি মাঝে মাঝে কিছু টাকা তোর কাছে পাঠিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

তুই লিখেছিস, আমি যেন শরীরটাকে ঠিক রাখি। অত সহজে আমার শরীর টসকায় না রে। ফিরে এসে দেখবি, আমি একটা জাম্ববান হয়ে গেছি।

শোন, তুই আমাকে চিঠি লিখে যাবি, আর আমি তোকে টাকার পর টাকা (তা যত সামান্যই হোক) পাঠিয়ে যাব। অন্তত সে টাকায় তোর খাম কেনার খরচটা তো উঠবে।

আর শোন, আমি সেদিন ডাক্তার মেণ্ডেসের স্বপ্ন দেখেছি। হুবহু তুই যেমন লিখেছিলি। ঠিক তেমনি লম্বা, সৌম্য চেহারার মানুষটি

কোথায় দেখা হলো শুনতে নিশ্চয় তোর কৌতূহল হচ্ছে। একেবারে আমাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের ঘরে। স্যারের চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছেন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমি অন্ততঃ তিনবার চোখ মুছে ওঁর দিকে তাকালাম ডাক্তার মেণ্ডেস তো?

আমার দিকে চোখ পড়তেই উনি গোটা তিনেক আঙুল নেড়ে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, এত উদ্বিগ্ন হলে চলে। সুস্থির হয়ে ভাববে, কাজ করবে, তবেই জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমার মিষ্টি বন্ধুটি ভালই আছে। আমি জানি, ও আমার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখেছে, তাই আমার অপারেশানের কাজটাও সহজ হয়ে যাবে

স্বপ্ন ভেঙে যেতে মনে হল, ইনি এমন এক ডাক্তার, যাঁর ওপর নিশ্চিন্তে সব ভাবনা ছেড়ে দেওয়া যায় হ্যাঁ শোন, তোর গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছি। একটি গরবিনী গোপাল ফুটেছে তোর জন্যে অনেক শুভেচ্ছা আর মাসীমার জন্য প্রণাম রইল।—ঋষি।

সেণ্ট ভিনসেণ্ট মেডিকেল সেণ্টারের কাজ নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। বারবারা অপারেশানের আগের করণীয়গুলো করতে শুরু করে দিয়েছেন। নিয়মমাফিক কাজ। সুদীপার বেডের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কি স্বেচ্ছায় কিডনি দিচ্ছ, না অন্যের প্ররোচনায়?

আমি শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দেই দিচ্ছি

আবার বারবারার প্রশ্ন, তুমি কি হিন্দু?

প্রশ্নের নিহিত অর্থটা বুঝলেন সুদীপা। বললেন, আমি হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, কোন ধর্মাবলম্বীই নয়। আমি মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী। আমার মেয়েও তাই।

একটু থেমে বললেন, আমাদের মৃত্যু হলে তোমাদের সুবিধে মত সৎকার কোর। আমাদের কোন কিছুতে আপত্তি নেই।

অপারেশানের দিন ভোরবেলা বারবারা এসে বললেন, আজ দশটায় শুরু হচ্ছে অপারেশান, তোমার কিছু বলার আছে ?

সুদীপা বললেন, অপারেশান থিয়েটার যাবার আগে আমি কি আমার মেয়ের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারব ?

বারবারা বললেন, নিশ্চয়ই। তোমার পাশেই হটলাইনের ব্যবস্থা আছে, কথা বল।

সুদীপা ফোন করলেন, উলু, কেমন মনে হচ্ছে মা ?

ব্যাপারটা দারুণ থ্রিলিং মনে হচ্ছে মা। জন্মের সময় একবার তুমি আমার ভেতর প্রাণের স্পন্দন এনে দিয়েছ, আবার তুমিই আমাকে পুনর্জন্ম দিতে চলেছ মা।

কোন ভয় নেই সোনা, আমরা ঠিকই এখানে নতুন জন্ম পেয়ে বাড়ি ফিরে যাব।

ফোনটা রেখে দিতেই একটা মুখ মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল সুদীপার চোখের সামনে। সে মুখ তার স্বামীর।

সুদীপা সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত জোড় করে মনে মনে বললেন, আজ জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য তোমার আশীর্বাদ চাইছি। অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একদিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নানেরা, অন্যদিকে নার্স আর ডাক্তারের দল। মাঝখান দিয়ে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রথমে এল উলু। মায়ের স্ট্রেচারের পাশে এসে দাঁড়াল তার স্ট্রেচার। বারবারা বললেন, মেয়েকে আশীর্বাদ কর।

সুদীপা চোখ বন্ধ করে মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এরপর ডাক্তার, নার্স ও নানেরা ক্রস করে উলুর কপালে চুম্বন করলেন।

সাত তলায় অপারেশান থিয়েটার। লিফটে উঠে গেল উলু।

এবার মায়ের পালা। মেণ্ডেসের কাছে স্ট্রেচার আসতেই মেণ্ডেস বললেন, ঈশ্বরের কাছে তোমার এবং তোমার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা কর।

হঠাৎ সুদীপার মনে হলো তাঁর সামনেই মেণ্ডেসের মূর্তিতে স্বয়ং ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখিনি, তুমিই আমাদের ঈশ্বর। তুমিই আমাদের আশীর্বাদ কর।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপার ভুল সংশোধন করে বললেন, ও কথা বোল না। বরং বল, প্রভু, তুমি ডাক্তার মেণ্ডেস এবং তাঁর সমস্ত দলকে আশীর্বাদ কর।

প্রভুর আশীর্বাদ পেলে আমরাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাব।

সাত তলায় পাশাপাশি দু'টি কাচের ঘরে দু'টি অপারেশান টেবল। ডক্টর বোগার্ড করবেন সুদীপার অপারেশান। ডক্টর মেণ্ডেস আর ডক্টর চ্যাটার্জী করবেন উলুর অপারেশান। সাতশো কিঃ মিঃ দূর থেকে ডক্টর মেণ্ডেসের ডাকে উড়ে এসেছেন ডক্টর চ্যাটার্জী।

মা মেয়ে দুজনই দুজনকে দেখছে কাচের ভেতর দিয়ে। দুজনই হাত তুলল, পবিত্র সুন্দর হাসিতে পরস্পর পরস্পরের অন্তর ভরে দিল।

ডাক্তার ইনজেকশান দিলেন। একটা মিষ্টি ঘুম নেমে এল। চেতনা লুপ্ত হলো।

ধীরে ধীরে যখন চৈতন্য ফিরে এল তখন দূরাগত ধ্বনির মত কানে বাজতে লাগল,—তুমি ও তোমার মেয়ে দুজনেই সুস্থ রয়েছ। তোমার কিড্‌নি তোমার মেয়ের শরীরে সুন্দরভাবে কাজ করে চলেছে।

ওদিকে উলুর ঘরেও শোনা যেতে লাগল ঐ একই সম্প্রচার। ডক্টর চ্যাটার্জীকে দিয়ে বাংলায় টেপ করিয়ে ডক্টর মেণ্ডেস প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন।

অপারেশানের পরের সতেরোটি মাস মা ও মেয়ের প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে দিন যাপন। সপ্তাহে এক-দু'বার করে ডাক্তার মেণ্ডেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তিনি পরীক্ষা করে পরবর্তী সপ্তাহে পুনরায় আসার নির্দেশ দেন। এমনি চলতে থাকে পরীক্ষা। সুদীর্ঘকাল পরীক্ষার পরেই পাওয়া যাবে দেশে ফেরার অনুমতি।

এই চিকিৎসার অর্থ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? হসপিট্যালের ঋণ জমে যাচ্ছে পর্বত প্রমাণ। মাঝে মাঝে বারবার হাতে ধরিয়ে দেন বিল। কর্তৃপক্ষ আর ঋণ ফেলে রাখতে চান না। যেমন করেই হোক শোধ দিয়ে দিতে হবে। সুদীপা বিল হাতে নিয়ে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকেন মেণ্ডেসের ঘরের সামনে। চোখ পড়লেই মেণ্ডেস হাতছানি দিয়ে ডাকেন।

সুদীপা কান্না ভেজা চোখে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বলে যান।

ডক্টর মেণ্ডেস বলেন, ওঁরা নিয়ম মেনে কাজ করেন তাই স্বাভাবিকভাবেই বিল আমার হাতে দিয়ে যেও, আমিই পেমেণ্ট করব।

দ্বিতীয়বার ডক্টর মেণ্ডেসের কাছে নত হয়ে চোখের জলে কৃতজ্ঞতা জানালেন সুদীপা।

বাংলাদেশ আকাদেমী, বিভিন্ন বাঙালী প্রতিষ্ঠান মা মেয়েকে সাহায্যের জন্য

সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। প্রাণঢালা গান গাইলেন সুদীপা সে সব অনুষ্ঠানে। বেতারের 'এ' গ্রেড আর্টিস্ট তিনি। মেয়েও বেতার শিল্পী। দুজনের গান শ্রোতাদেব প্রাণ স্পর্শ করল। তাঁরা বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করলেন মা ও মেয়েকে।

বাংলাদেশ আকাদেমীর অনুষ্ঠান শেষে জয়া আর বিজয়তিলকের সঙ্গে ফিরছিল ওর। টাকার চেকখানা জয়ার হাতে তুলে দিয়ে উলু বলল, রেখে দে এটা।

জয় নিজের ব্যাগে সেটা পুরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে বলল, আগের দুটো চেক আমার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিলি, কই হসপিট্যালের বিল মেটালি না তো? ও বিল ফেলে রাখার নয়। সব ফেলে আগে ঐ ঋণশোধ করে যা।

হাসল উলু, হাতটা টিপল জয়ার। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ, 'রেখে দে না।'

বুদ্ধিমতী জয়ার বুঝতে বাকি রইল না যে, উলু একই সঙ্গে হসপিট্যাল ও জয়াদের ঋণশোধের একট তাল করছে।

জয় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, জয়, গাড়া ঘুরিয়ে উলুকে হসপিট্যালে অথবা এয়ার-পোর্টে পৌঁছে দাও। ও যেখানে যেতে চায় যাক্।

উলু হাসছে দেখে জয়া আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, কি কুক্ষণেই না এয়ারপোর্টে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আশ্চয, ভেবেছিস কি তুই!

সুদাপা বললেন, তোমাদের দু'বান্ধবীর ভেতর আমি কি কোন কথাই বলতে পারব না মা?

একদম না, মাসীমা। পরে যা বলবেন, কান পেতে শুনব আর মাথা পেতে মেনে নেব।

অগত্য সহযোগী যোদ্ধা ছাড়াই দু'বন্ধুতে লড়াই চলল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আকাদেমীর চেকখানা জয়া জোর করে গুঁজে দিয়েছে উলুর হাতে।

উলু বলল, বেশ, এ চেকখানা না হয় আমি রেখে দিচ্ছি। কিন্তু যদি কখনও হসপিট্যালের বিল মিটিয়ে তোকে দেবার মত দিন আসে তাহলেও নিবি না?

জয়া বলল, আমি কি কিছু আসা করে তোকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি? না, আমার স্বামী দুজন অতিথিকে খাওরাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বলে তোর এ করুণা?

উলু এবার গলা তুলে বলল, তুই আমাদের আলোচনার ভেতর আবার বিজয়-তিলককে টেনে আনছিস কেন? তোদের ভালবাসার দানকে আমি লঘু করে দেখছি এ ধারণা তোর এল কোথা থেকে! যা করেছিস তোরা, তা যে কোন-ভাবেই পরিশোধের নয়, এটুকু বোঝার ক্ষমতা কি আমার লোপ পেয়েছে জয়া?

জয়া বলল, একজন অসুস্থ বান্ধবীর জন্যে যে কেউই করত এটুকু। একে মস্ত

বড় করে দেখার কিছু নেই।

ও কথাটা আমি মেনে নিতে পারলাম না জয়া। থাক তর্ক। তুই আমাকে আগের দুটো অ্যামাউণ্ট দিয়ে দিস। তিনটে মিলিয়ে হাসপাতালের খানিকটা শোধ হয়ে যাবে।

বিজয়তিলক হেসে বলল, হোলি অ্যালায়েন্স। বলেই চালিয়ে দিল টেপ—

'এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল॥
... ...
শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব প্রণয় দোলায় দোলো॥'

বাসরের সেই গান। সলজ্জ জয়ার চোখের পাপড়ি খুলে যাচ্ছে, ওষ্ঠে ফুটে উঠছে প্রণয়-মধুর হাসিটি। উলুর কণ্ঠ মাতোয়ারা করে তুলেছে বাসর ঘরে বন্দী ক'টি হৃদয়।

গাড়ির ভেতরেই জয়া জড়িয়ে ধরেছে উলুকে। নিঃশব্দে দু'বান্ধবীতে বসে বসে ছবি দেখছে। সেদিনের সে বাসর ঘরের মুগ্ধ ক'টি মুহূর্তের ছবি।

ফিস্ ফিস্ করে জয়া বলল, সেদিনগুলোকে তুই অক্ষয় করে রেখেছিস তোর গানে। তোর ঐ ঋণ আমি শুধব কেমন করে বল ?

এমন ঋণও আছে জয়া যা কখনও শোধ করা যায় না। শোধ দিতে গেলে ঋণদাতাকে আহত করা হয়।

কেমন করে তোকে বোঝাব উলু তুই আমাদের দুজনের জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিস কতখানি।

আমার হৃদয়ের পেয়ালাটা কিন্তু অপূর্ণ নয়। তোরা আমাকে গান দিতে পারিসনি ঠিক কিন্তু প্রাণের উত্তাপে বুকখানা ভরে দিয়েছিস। আমি যে মৃত্যুর অন্ধকার ঠেলে আলোর জগতে আবার ফিরে এলাম তোদের প্রাণের সোনার সুতোর টানে।

জয়া কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে বলল, যদি টেনেই এনে থাকি তাহলে সেটা নিজেদেরই স্বার্থে। তোর মুখে গান শুনব বলে।

আমেরিকার পর্ব শেষ হবার আগে একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে উলু তার সতেজ গলায় একখানি গান উপহার দিল—'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।'

উপস্থিত সকলের বুকেই সেদিন স্মৃতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল।

সতেরোটি মাস শেষ হলো আর শীতের চাদর সরে গিয়ে দ্বিতীয়বার বসন্ত নামল লসএঞ্জেলসের প্রসারিত গাছের শাখায়।

ডটার্স অব চ্যারিটির চ্যাপেলের বাগানে যে গাছগুলি স্বদীপাদের আসার সময় সোনালী আর বাদামী পাতা ত্যাগ করেছিল তাদের ডালে ডালে এখন ফুলের মহোৎসব। আপেলের ডাল সাদা আর পিঙ্ক ফুলে বসন্তকে আহ্বান জানাচ্ছে। পাখিরা স্বরের জলসায় মেতে উঠেছে।

মা ও মেয়ে পরীক্ষার জন্য এসে দাঁড়ালেন মেডিকেল সেণ্টারে।

ডক্টর মেণ্ডেস পরীক্ষার শেষে ওদের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চ্যাপেলের চূড়ার ওপরে নীল আকাশ। ফলের বাগান থেকে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি।

মেণ্ডেস উলুর পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি এখন অনেক সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছ। দেশে যাবার জন্যে মন কেমন করছে, তাই না? তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার। আমি প্রেসক্রিপশান লিখে ছেড়ে দেব।

উলু আবেগে ডাক্তার মেণ্ডেসের হাতখানা মাথায় তুলে নিল।

স্বদীপা বললেন, ডাক্তার মেণ্ডস, আপনি ওর প্রাণ দিয়েছেন। আমরা সব দিক থেকে আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

মেণ্ডেস হেসে বললেন, তোমাদের গানের একখানা ক্যাসেট আমার জন্যে পাঠিয়ে দিও, তাতেই যত ঋণ সব শোধ হয়ে যাবে।

ডাক্তার মেণ্ডেসের প্রেসক্রিপশান নিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে একটা মেডিকেল স্টোরে। স্বদীপা কেমিস্টকে বলল, আপনাদের একটা বিল পেমেণ্ট করা হয়নি, অনুগ্রহ করে সেটা নিয়ে নিন, আর এই নতুন প্রেসক্রিপশানের ট্যাবলেটটা রোগীর জন্য বিশেষ জরুরী, ওর এক শিশির দাম কত যদি জানতে পারি তাহলে ভাল হয়।

কেমিস্ট এক শিশি, মানে একশোটা ট্যাবলেটের দাম যা বলল তা কেনার সামর্থ ছিল না স্বদীপার। কিন্তু এ ট্যাবলেট দীর্ঘকাল মেয়েকে রোজ কয়েকটি করে খেয়ে যেতে হবে। দেশে এ ট্যাবলেট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেমিস্ট স্বদীপাদের পূর্ব পরিচিত। বয়স্ক মানুষটি স্বদীপার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন। স্বদীপা অকপটে সব কথা বললেন। উলুকে নিয়ে খুব মজা করতেন ভদ্রলোক। বললেন, ডক্টর মেণ্ডেস ছেড়ে দিলেন আর তুমি চলে যাচ্ছ? আমাদের ছেড়ে যেতে একটু মায়া হচ্ছে না?

উলু মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল। ভদ্রলোক সুদীপাকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে ভেতরে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন বেরুলেন তখন হাতে একটি প্যাকেট। উলুর হাতে প্যাকেটটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই ওষুধ কোম্পানীর ডাইরেক্টারকে তোমাদের কথা জানিয়ে আমি ফোন করেছিলাম, তিনি দশ শিশি সুন্দর প্যাকেটে মুড়ে তোমাদের উপহার দিতে বলেছেন।

সুদীপা আর উলুর ধন্যবাদ জানাবার ভাষা ছিল না। মা মেয়ে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে করমর্দন করে বেরিয়ে এল।

আবার সেই আকাশ পথে ঘরে ফেরা। দমদমের মাটি স্পর্শ করামাত্র উলুর চোখ ভিজে উঠল। কতকাতা, তার প্রিয় কলকাতা। সমস্ত অপূর্ণতার ভেতরেও কি দুর্বার আকর্ষণ তার। মৃত্যুর প্রাসাদের গোলকধাঁধায় সে হারিয়ে গিয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে ফিরেছে। হাজার দরজা, পায়নি পথ। অবশেষে এক দয়ালু পুরুষ তাঁর হাত ছুঁইয়ে দিতেই আসল দরজা খুলে গেল। মৃত্যুর অতল থেকে সে উঠে এল আনন্দময় জীবনের কূলে।

এনক্লোজারের বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে! উলু বলল, মা, তুমি মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসো, আমি গেটের কাছেই রয়েছি।

দ্রুত পা চালিয়ে উলু গেটের দিকে আসতে লাগল। পলকহীন দুটো চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। লসএঞ্জেলসের পথে চলার সময়, সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছে এই চোখের স্পর্শ।

ঋষির কাছটিতে এসে দাঁড়াল উলু! কারো মুখে কোন ভাষা নেই। দুজনে শুধু দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় ঋষি তার লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ধরল উলুর হাত। সঙ্গে সঙ্গে উলুর চোখ থেকে ঝরে পড়ল একরাশ যুঁই ফুল। ঋষি বন্ধুর মাথাটিকে পরম আদরে বুকের কাছে চেপে ধরে রইল।

সুদীপা এলেন এনক্লোজারের বাইরে। উলু ততক্ষণে তার সিক্ত চোখ দুটো মুছে নিয়েছে।

ঋষি সুদীপাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সুদীপা ঋষিকে জড়িয়ে ধরে বললেন আমার ছোট্ট গোপাল মূর্তিটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাবা। তাকে যখনই পুজো সেরে আদর করতে গিয়েছি তখনই তোমার মুখখানা ভেসে উঠেছে সেখানে।

ঋষি গাড়ি ঠেলে সুটকেশ দুটো এনে তুলল ট্যাক্সিতে। ওদের দুজনকে পেছনে বসিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল সে, উলু তাকে হাত ধরে টেনে পাশে

বসালে। গাড়ি ছুটে চলল ভি. আই. পি. রোড ধরে। উলুর পাঁচটা আঙুলে ঋষির পাঁচটা আঙুল তখন বন্দী হয়ে আছে। তারা কোন কথা বলছে না, কিন্তু আঙুলের স্পর্শে অনেক অন্তরঙ্গ কথা বলে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে কেবল সুদীপার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে ঋষি। উলু এখন তাকিয়ে আছে ইস্টার্ণ বাইপাসের প্রসারিত প্রান্তরের দিকে। সে যখন এ পথ দিয়ে প্লেন ধরতে গিয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল, এ পথ তার জন্য আর কোন দিনও খোলা থাকবে না। কিন্তু আজ তার মনে হলো, পথ বন্ধ হয় না কোনদিন। সে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বিশ্ব পরিক্রমা করে বেড়ায়। মৃত্যুলোকেও হয়ত এমনি একটা কোন পথ আছে। অন্ধকার সে পথে চলতে চলতে হঠাৎ আলোকিত একটা পথে এসে পড়া যায়।

ঘরের দরজায় এসে গাড়ি থামতে ওরা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল। উলু আগে ছুটে গেল তার বাগানের দিকে। সিঙ্গাপুরী রঙন গাছটা থোকা থোকা লাল ফুলে বাগান আলো করে রেখেছে। শুধু কি লাল? লালের মাঝে মাঝে এক একটা হলুদের ফুলকি। ঠিক যেমন দগদগে লাল আগুনের সঙ্গে সোনালী হলুদ আগুন ঝলসে ওঠে।

এ বাড়িতে প্রাণের যে আগুনটুকু নিভু নিভু হয়েছিল অনুকূল বাতাসের ছোঁয়ায় তাই যেন জ্বলে উঠেছে শত শিখায়।

উলুর সফল অপারেশান আর ফিরে আসার খবর বেরুল সংবাদপত্রে। তার সঙ্গে উলুর একছত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—'সবারে আমি নমি'।

এবারও ডাকবাক্স প্রতিদিনের শুভেচ্ছাপূর্ণ চিঠিতে ভরে উঠল।

যে সব আত্মীয়স্বজন সুদীপার আমেরিকাযাত্রাকে অতিরিক্ত দুঃসাহসিকতা ভেবে মনে মনে বিরূপ হয়েছিলেন, তাঁরাই আগে এসে মা আর মেয়েকে প্রশংসার বাণীতে প্লাবিত করে দিয়ে গেলেন।

আজ উলুর চোখে সব রঙই উজ্জ্বল, সব মানুষই আনন্দময়। পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলেই একরাশ হাসি ছড়িয়ে আলাপে মেতে উঠছে।

ঋষি এসে বলে, এই যে ভি, আই, পি, শেষ হলো জন সংবর্ধনা?

উলু হেসে বলে, কেউ ভি, আই, পি, খেতাব পায় প্রতিভায় কেউ বা পায়-জীবন-সংকটে। শেষেরটাই আমার শিরোপা।

গল্প চলে দুজনের। সময় গড়িয়ে যায় কোথা দিয়ে কেউ টের পায় না। ডাক্তার মেণ্ডেস, জয়া, বিজয়তিলক, বার বার ফিরে ফিরে আসে। একই কথা

ফিরে আসে বক্তার উচ্ছ্বাসে, তাতে শ্রোতার ক্লান্তি নেই।

কথা হয়, দীর্ঘ দেড় বছরে দুজনের জমে ওঠা চিঠিগুলোর নানা প্রসঙ্গ ধরে। কখনো অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে, কখনো বর্ষণে প্লাবিত হয় উলুর বুকের আঁচল। সান্ত্বনার দীর্ঘ বলিষ্ঠ একটা হাত এগিয়ে আসে। অমনি মেঘ কেটে যায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে ওঠে দুজনের মুখ। একদিন ঋষি এলো না, অমনি উলুর উজ্জ্বল মনে কোথা থেকে ছায়ারা এসে ভীড় জমাল। ঋষি এল পরদিন। উলু এক বুক অভিমান নিয়ে বলল, দিনান্তে সব কাজের শেষে একটিবারও কি বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ান যায় না ঋষি?

অপরাধীর গলায় ঋষি উত্তর দিল, এ ভুল আর কখনও হবে না উলু।

একদিন সুদীপা বললেন, তুমি যে হৃদয়বান মানুষটির কথা চিঠিতে লিখেছিলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি তো শান্তি পাচ্ছি না বাবা। কাল আমাদের নিয়ে চল তাঁর আশ্রমে। আড়াল থেকে যে বিরাট কাজ আমাদের জন্যে তিনি করেছেন, তাঁকে একটি প্রণাম না জানিয়ে এলে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাবো না।

ঋষি বলল, যদিও তিনি সর্বত্যাগী, আড়ালে থাকতেই ভালোবাসেন, তবু এই আনন্দ তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। মাসীমা, আমি নিশ্চয়ই কাল ওখানে নিয়ে যাব তোমাদের।

পরের দিন সেই নরেন্দ্রপুরের পথে 'ব্রজগোপাল বিহারে' তিনজনে যাত্রা করল।

পথটা চলে গেছে মাঠ ঘাট গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে। সূর্যের সেতারে বাজছে বেলা শেষের রাগিণী। উলু ঋষির হাত ধরে আনন্দে চঞ্চল হরিণীর মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে।

মাস্টারমশায় সবেমাত্র ছেলেদের ছুটি দিয়ে তাঁর বেলা শেষের উপবেশনের জন্য নির্দিষ্ট বাঁধা ঘাটের পাটটিতে পা রেখেছেন, ঋষি পেছন থেকে ডাক দিল, মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়, দেখুন আজ কারা এসেছে।

মাস্টারমশায় ফিরে দাঁড়াতেই সুদীপা আর উলু এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়াল। প্রশান্ত চোখ মেলে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মানুষটি।

হঠাৎ রাজর্ষির সামনে পট পরিবর্তন হয়ে গেল। সে মূঢ়ের মত চেয়ে রইল আশ্চর্য, অভাবিত এক নাটকের দিকে। যে নাটকে কোন সংলাপ ছিল না, কেবল মূক অভিব্যক্তি। উলু জড়িয়ে ধরেছে মাস্টারমশায়কে আর মাস্টারমশায়ও বুকে চেপে ধরেছেন উলুকে। সুদীপার দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর প্লাবন।

রাজর্ষি বহুদিনই মাসীমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে, বৈধব্যের কোন চিহ্ন যাঁর মধ্যে নেই তাঁর স্বামী কোথায় ? কিন্তু তার কিংবা তার পরিবারের রুচিশীল মন কখনো সুদীপা অথবা উলুর কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। আজ সব জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল।

কতক্ষণ সুদীপাদেবী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করলেন একান্তে। তারপর আলাপে যোগ দিল উলু। ঋষিরও ডাক পড়ল সেই মিলন মহোৎসবে।

ফিরতে খানিক রাত্রি হল। ইন্দ্রনাথ টর্চ নিয়ে বাস রাস্তা অব্দি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন।

উলু বলল, বাবা, আবার কবে আসব ?

ইন্দ্রনাথ বললেন, দুটো আস্তানাই তো রইল মা। তোমাদের খুশীমত চলে এসো।

সুদীপা মেয়েকে চুপি চুপি বললেন, বাবাকেও বাসায় আসতে বল।

উলু বলল, বাবা, তোমাকেও বাসায় আসতে হবে কিন্তু।

হাসতে লাগল ইন্দ্রনাথ, যাব রে পাগলী যাব। আমি আর তোদের না দেখে কি থাকতে পারি।

সুদীপা ও উলু নিজেদের গানের একটি ক্যাসেট তৈরি করে পাঠরে দিল লস-এঞ্জেলসে ডাক্তার মেণ্ডেসের ঠিকানায়। সুদীপা উলুর সব খবর জানিয়ে একটা চিঠিও লিখল।

মাসখানেক পরে উত্তর এল। ডাক্তার মেণ্ডেস লিখেছেন :

প্রিয় ভগ্নী, তোমায় পাঠানো উপহার এখন আমার প্রতিদিনের বিশ্রামের সঙ্গী। আমি সকালবেলার সোনালী আলোর মত সুন্দর উজ্জ্বল একটি মেয়েকে ঐ গানের ভেতর খুঁজে পাই। আর তোমার গান শুনতে শুনতে মনে হয়, জননী বসুন্ধরা নিদ্রাহীন চোখে তাঁর আহত, তাপিত সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে আছেন। ধন্য দেশ ভারতবর্ষ যেখানে এ যুগেও মা এমন করে নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করে সন্তানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত !

তোমাদের জন্য যা করেছি, সে আমার কর্তব্য। তার জন্য ঋণস্বীকারের প্রয়োজন নেই। তোমাদের দুজনকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। স্নেহ

আমার অনেক পাওনা। যদি কোনদিন ক্যালকাটাতে যাই তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

তোমরা দুজনেই আমার
ঐকান্তিক শুভেচ্ছা নিও।
রবার্ট মেণ্ডেস।

প্রতিনিদের মত সেদিনও ঋষি এসে ঢুকল উলুর ঘরে। আজ একটু আগেই সে বেরিয়ে এসেছে কলেজ থেকে। উলু ঋষিকে বেলা শেষের আগে প্রায় কোনদিন কাছে পায় না, আজ আগেভাগে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠল।

ঋষি ঘরে ঢুকেই বলল, আজ কি একটু বেরুনো যাবে?

কেন নয়, নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায় জানতে পারি কি?

ঋষি কম কথা বলে চিরদিন। হয়ত উত্তরটা দিতে গিয়ে সে সংকোচ বোধ করত, আর দাঁড়িয়ে থাকত চুপচাপ কিন্তু আজ সে স্পষ্ট করেই বলল, 'বাল ব্রজ বিহারে' শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কাছে।

উলুর গলায় বিস্ময়, বাবার কাছে! এ সময়? কিন্তু কেন?

মাসীমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওঁরা দুজনে দাঁড়াবেন একসঙ্গে আর আমরা দুজনে ওঁদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নেব।

ঋষির হাতখানা মুঠো করে ধরে উলু মাথা নিচু করে বসে রইল কতক্ষণ। পরে সে উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে তার ডায়েরিটা বের করে আনল।

ঋষির হাতে ডায়েরিটা তুলে দিয়ে বলল, তুমি আজ যে প্রস্তাব আমার কাছে বয়ে এনেছ তা যে কোন তরুণীর কাছে শুধু কাম্য নয়, গৌরবের। কিন্তু ঋষি, এই আশার ছলনায় আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারছি না, এ যে আমার কত বড় যন্ত্রণা তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবনা। সুখের নীড় বল কোন্ মেয়ে না গড়ে তুলতে চায়? দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির স্বপ্ন বল কে না দেখে? তবু আমি সব জেনে সে স্বপ্নে তোমাকে জড়াতে পারব না ঋষি। তোমাকে ভালবাসি বলেই এই কঠিন যন্ত্রণার ভারটুকু আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

কিছু সময় নীরব থেকে উলু আবার বলল, এই ডায়েরিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। এ আমার পরম ধন, ঋষি। এ শুধু তোমাকেই দেওয়া যায়। আর এমন কিছু আমার সঞ্চয়ে নেই যা তোমাকে দিয়ে আমি গভীর তৃপ্তি পেতে পারি।

ঋষি উলুর এতগুলো কথার উত্তরে একটি শব্দও উচ্চাচণ করল না। সে নীরবে উলুর ডায়েরিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত উলুর দৃষ্টি সজল মেঘের ছায়ার মত ঋষিকে অনুসরণ করে চলেছিল, কিন্তু চোখের আড়াল হতেই বিছানার ওপর ভেঙে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে অঝোর বর্ষণ নেমে এল সেই মেঘ থেকে।

গঙ্গার তীরে বসে ডায়েরির শেষ পাতাটি শেষ সূর্যের আলোয় মেলে ধরল রাজর্ষি। আমেরিকা যাবার অব্যবহিত আগে উলুর এটি ডায়েরির পাতায় শেষ আঁচড়।

আর কিছু সময় পরেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে আমার এ পরিচিত পরিবেশকে পেছনে ফেলে। ওদেশে গিয়ে আমি যদি কিছু হারাই, যা আমার জীবনের চেয়ে দামী বলে মনে করি, তা ঋষির প্রতিদিনের নিবিড় সান্নিধ্য।

এখানে ঋষি দিনান্তে একবার করে আমার পাশে এসে বসে। ও কোন কথা বলে না। শুধু আমার ডায়ালিসিসের ক্ষত বিক্ষত হাতখানা ধরে বসে থাকে। নীরবতাই ওর ভাষা। ওর একটি মাত্র উচ্চারণ, গানের মত আমার কানে, আমার প্রাণে এসে বাজতে থাকে,—উলু।

ডায়েরির শেষ পাতাটি বন্ধ করল রাজর্ষি। অন্ধকারের তরল প্রবাহ মিশে যাচ্ছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে। এই মুহূর্তে একটা কথার স্রোত উঠে আসছে রাজর্ষির বুকের ভেতর থেকে।

—আমি তোমাকে তেমনি করে পেতে চেয়েছি উলু, যেমন করে একটি প্রিয় ফুলকে মানুষ আঘ্রাণে, স্পর্শে একান্ত নিবিড় করে পেতে চায়। নাইবা এল আমাদের জীবনে একটি আলোকিত সন্ধ্যা, হাসি গান আর সানাই-এর সুর— আমরা দুজনে হাতে হাত বেঁধে চলব সুখ দুঃখের পথ পেরিয়ে। থাক না এ জন্মে আর সব মানুষের মত সুখ-নীড় রচনার সাধ। আমরা শুধু দুজনকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে বলব, আমরা বন্ধু—বন্ধুত্বের চেয়ে বড় বন্ধন আমাদের আর কিছু জানা নেই।

—